এই ভারতের পুণ্যতীর্থে

শ্রীদেবল

এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

EI BHARATER PUNYATIRTHE
Travelogue
By Sri Deval
Price : Rs. 6·00

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৬৬

মূল্য : ৬·০০ (ছয় টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
শ্রীসুভাষ সিংহরায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস,
২৫বি হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

অঙ্গিরা বশিষ্ঠাদি পথিকৃৎ ঋষিদের
বাদরায়ণ বুদ্ধ শঙ্করাদি মহাতপা ঋত্বিকদের
এবং
ভারত-তীর্থের অগণিত মহাপ্রস্থানকামী
যাত্রীদের
শ্রীচরণারবিন্দে

ভূমিকা

এই পুস্তকের ঘটনা ও চরিত্র মনোরাজ্যের বিজৃম্ভণ মাত্র। তবে বস্তু-ভিত্তি নেই একথা বলতে পারি না। পাঁচ দুয়ারে যে মাগন পেয়েছি তাকে পুটপাকে প্রস্তুত করেছি নিজের মহানসে—নাম, রূপ, গন্ধ, আস্বাদ বাস্তব থেকে এসেছে ঠিকই···কিন্তু বাস্তবে তারা নেই।···পাতা উলটতে উলটতে হয় তো মনে হবে "আমাদের ইয়ে যে!"···আরও একটু এগলে মনে হবে "না, ইয়ে নয় ; হয়তো—আচ্ছা, দেখাই যাক"···

আর একটি কথা। এই পুস্তকে কোন মতবাদ নেই। চিত্তনদী নিজের মনে পথ কেটে এগিয়েছে···রাস্তায় পেয়েছে ঝোপঝাড়, পাথর, বালি, ফুল, পাতা, সবুজ তৃণ, শুকনো ঘাস···আবর্ত···তরঙ্গ···তরতর গতি···ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলা··· প্রপাতের ক্রুদ্ধ শার্দূলবিক্রীড়িত গমন···সমতলে শালিনী ছন্দ···সাগরে অস্তংগমিতা···

—গ্রন্থকার—

নিবেদন

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 'এম. কে. বি'-কে নতশিরে প্রণাম জানাচ্ছি। বইখানা হয় তো অসম্পূর্ণই থেকে যেত যদি না ওঁর উৎসাহ ও আশ্বাস পেতুম—"বই তুমি শেষ কর, প্রকাশনের জন্য ভাবতে হবে না।"

ভাবতে হয়ও নি। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানীর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় যে এক কথায় বইখানা ছাপাতে রাজী হবেন তা ভাবিনি। কাগজের বাজারে তখন "গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি"। এখনও। মিল থেকে যা কাগজ বেরোয় তার মোটা অংশ নিয়ে নেন সরকার বাহাদুর। তাঁদের

অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন।
ঘরেও তাঁদের রাখতে হয় বহু লোকের মন॥

সুতরাং নিরুপায়। আর এক অসুবিধা এই যে সাধারণের জন্য যে কাগজ বরাদ্দ আছে গতি তার দুর্লক্ষ্য। ফলে, স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকই সব ছাপান সম্ভব হয় না। আমরা অনেক ভাবে মার খেয়েছি; কাগজের মার হবে মোক্ষম। তা, দুবছর হবে—এতদিন বসে ছিলুম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, আর শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে যে সাদা কাগজ যেন সাদা থাকে। কিন্তু—যাকগে। শেষ পর্যন্ত যে বইখানা ছাপান সম্ভব হল তার একমাত্র কারণ অমিয়বাবুর হিতৈষণা এবং স্বকর্মে পরম নিষ্ঠা। সর্বান্তঃকরণে ওঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শোভাকর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনিল বসু খুবই যত্নসহকারে বইয়ের প্রুফ দেখে দিয়েছেন। একাজে ওঁদের দক্ষতা অসাধারণ এবং সত্যিই প্রশংসনীয়। ওঁদের আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইয়ের মুদ্রণাদি ব্যাপারে যা-কিছু ত্রুটি থেকে গেল তার জন্য দোষী আমি। আশা করি, সহৃদয় পাঠক নিজগুণে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। ইতি—

কলিকাতা — **গ্রন্থকার** —

দোল পূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রথম অধ্যায়

নব নব রূপে এস প্রাণে

(ক)

হরিদ্বার

সূচীপত্র

হরিদ্বার

অথ কথারম্ভঃ

কো অদ্ধা বেদ ?

কবে শুরু হয়েছিল এই যাত্রা কে জানে ! হয় তো কেউ জানেনা ! বৈদিক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন,

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনা-
থা কো বেদ যত আবভূব ॥[১]

কে জানে, বলতেই বা কে পারে, কখন কোথা হতে আরম্ভ হলো এই বিসৃষ্টি ? জ্যোতির্ময় দেবগণ এক সঙ্গেই কি আবির্ভূত হলেন ? তবে তো তার আগেকার বার্তা তাঁরাও জানেন না ! কে জানে ? যুগ যুগান্ত ধরে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে চলেছে মানব, সীমাহীন পথ ধরে চলেছে পথিক, পায়ের ছাপ খুঁজে চলি আমি। হয় তো পথের শেষে এই ধাঁধার উত্তর মিলবে, কিন্তু তখন কে-ই বা কার সঙ্গে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন করে ? আকাশের ওপারে কি আম গাছের অন্ধকার আছে, না আছে আমাদের মাঠের শেষের বটতলার সেই স্নিগ্ধ ছায়া যেখানে ঘনায়মান সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় 'এক যে ছিল রাজা'র দেশের গল্প শুনেছি ? ডে-লা-মেয়র (de la Mare)-এর মার্থা (Martha) কি পথ-ক্লান্ত যাত্রীদের নিয়ে রামধনুর গায়ে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে ব'সে শ্রোতাদের প্রাণে আনন্দ-হিল্লোল জাগায় ? নিরবচ্ছিন্ন এই গতির যে একদিন বিরাম হবে, জোর ক'রে কে তা বলতে পারে ? পথের শেষ প্রান্তে যদি সত্যিই এক দিন এসে দাঁড়াই তখন হয় তো দেখবো সবটাই ছিল দুঃস্বপ্ন। রাধাচক্রে বসে ঘুর-পাক খাচ্ছি, খাবি খাওয়ার অবস্থা এলে হয় তো শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্র থেকে নাবিয়ে রেহাই দেবেন। কিন্তু তা ই বা কে জানে ? রাধাচক্র চলে, শুধু এটুকুই জানি ······ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া[২]···মনে পড়ে বেদেদের কথা ; কোথাও দাঁড়ায় না, কোথাও নীড় রচনা করে না ; আজ আমাদের গাঁয়ের

(১) ঋগ্বেদ ১০—১২৯—৬ (২) গীতা ১৮—৬১

বটতলায়, কাল পদ্মানদীর কাশবনের আড়ালে, তারপর দিন ঘনচ্ছায় মসীমাখা ওপারের ঐ গ্রামের ধারে; কোথা থেকে এলো, কোথায় যাবে, কী এদের পাথেয়, কেন ঘুরে মরছে—নান্তো ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা[১]……যেমন আমরা 'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি' ক'রে কবে যে বেরিয়ে প'ড়েছি, কোথা যে যাচ্ছি, কেনইবা যাচ্ছি—কো অদ্ধা বেদ? স্বপ্নের ভিতর যেমন স্বপ্ন দেখার কথা ভাবি তেমনি জীবনের ছেদহীন গতিপথে নূতন যাত্রার ছক আঁকি, পাথেয় সংগ্রহ করি, এবং যাত্রা করি শ্রীহরি স্মরিয়া……

॥ ১ ॥

১৯২৬ সাল, তখন আমি দিল্লিতে; প্রায় এক বছর ঘরছাড়া। ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর ছিল কোয়ার্টারস্, পাশে 'বি-বি-সি-আই'র রেল লাইন; স্টেশন দশ মিনিটের রাস্তা; সকাল দুপুর সন্ধ্যা সব সময়ই গাড়ীগুলো ডাক দিয়ে যায়; মন উদাস হয়, ভাবি কবে যে দেশের মাটি আবার দেখবো। রেল লাইনের ওপারে বাবলাগাছ, তারপর একটা খাল, তার উত্তর-পূব কোণে একটা বন; গাছের মাথাগুলোর দিকে তাকাই—এক নিবিড় ঘন সবুজ আস্তরণ কতদূর চলে গেছে…সারা রাত এর উপর দিয়ে চলে গেলে কানপুর… তারপর এলাহাবাদ…মোগলসরাই…গয়া…আসানসোল…হাওড়া……একটা ট্রেন যায়; কে জানে কোথাকার গাড়ী! আমার এক দাদা থাকেন বিহারে; স্টেশনের ধারে বাসা; ট্রেনের টাইমগুলো তাঁর মুখস্থ…মেইল আসছে, ছটা পনর, চা দে রে!…প্যাসেঞ্জার এলো, পৌনে নয়; যাই, স্নানটা সেরে ফেলি ……পারসেল গাড়ীটা আজ লেইট্! সেরেছে! আফিসে দেরি না হয়ে যায়! ……পিসীমা, মিকৃষ্ট্ চলে গেল, দেড়টা; এখনও পূজো শেষ হলো না? …৭নং 'ডাউন্' টা যাচ্ছে; চা-এর জলটা চাপিয়ে দে রে! আফিস থেকে সব ফিরবে…'একস্প্রেস্'টা চলে গেল, পৌনে এগার; আজ আর রাত্তিরে ঘুম হবে না দেখছি, বায়ুটা চ'ড়েছে……

রেলগাড়ী সম্বন্ধে আমার এখনও ছোটবেলাকার বিস্ময় ও বেদনা, ভাবি কোথা থেকে আসে কোথা চলে যায়! কতো দিন স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের ওঠা-নাবা দেখেছি…কোন্ দূর দেশ থেকে আসে, কোন্ জনসমুদ্রে মিলিয়ে যায়; চিনি না এদের কাউকে, কিন্তু সকলেই যাত্রী, এক ডোরে বাঁধা, এগোচ্ছে শ্রীভগবানের

(১) গীতা—১৫—৩

সন্ধানে। ট্রেনের বাঁশি শুনলে প্রাণের তাগিদ আসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার জন্য —বিশেষ করে ছুটির দিনে।...রববার দিন গিয়েছিলুম সহরে; অচেনা রাস্তাঘাট, অচেনা বাড়ীঘর, অচেনা মুখ; ট্রামের ঘরঘর, টাঙ্গার খট্খট্, লোকজনের ছুটোছুটি, কেনাবেচার কোলাহল; অদূরে দিল্লি স্টেশন থেকে বাঁশি বাজে...কোথায় এসেছি! মেলা বসেছে যেন; পথ ভুল করে অসহায় ভাবে তাকাই... আলাদীনের সহর—দোকানপাট, গাড়ীঘোড়া, লোকজন সব হয় তো এক নিমেষে উবে যাবে!...এ আমার ঘর নয়...ঐ বাঁশি বাজে; মন, চলো নিজ নিকেতনে...বিদেশ এটা, বিদেশীর বেশে মিছে আমি হয়রান হচ্ছি...একটা ঢিবির উপর বসে গাঁয়ের কথা ভাবি...কবে যে যাবো দেশে...হুগলী নদীতে বোধ হয় জেলেরা এখন মাছ ধরছে; একটু পরই হাওড়া স্টেশন...বাংলা দেশে ঢুকতেই মনটা নরম হয়ে যায়...বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশ-বাতাস, ভাষা-সঙ্গীত-সাহিত্য—বড্ড নরম; লোকে বলে সর্বত্রই কাঁদুনে সুর......মানুষ-গুলো মৃদূনি কুসুমাদপি; কিন্তু বজ্রকঠোর হতে পারি না কেন? আমের বোল আসে রাশি রাশি—ফল হয় ক'টা? ঝরে পড়া মুকুলের মতো নিষ্ফলতাই কি আমাদের জীবন?

...ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ,
অলসদেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান।......

আজ হঠাৎ মেঘ করেছে; অদূরে কোথাও বৃষ্টি হয়ে থাকবে, হাওয়াটা ভিজে, ঝিরঝিরে; নীচে একটা কাঁচা রাস্তা...ঠুন্ঠুন্ আওয়াজ ভেসে আসে...ঘণ্টা বাজিয়ে ধুলো উড়িয়ে একপাল গরু ঘরে ফিরে যায়; আকাশে মেঘ ও রং-এর খেলা—এক ফালি বাংলাদেশ...তুলসীমঞ্চে সাঁঝের প্রদীপ দিচ্ছেন দিদিমা ...ঠাকুর ঘরের আলো জ্বলে; শাঁখ বাজিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হলো— এলাচদানা ও জল; আবার শাঁখ বাজে; মশারি ফেলে ঠাকুরকে শোয়ানো হলো...ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে দিদিমা জপ করছেন...সন্ধ্যাতারা সজল নয়নে চেয়ে আছে...চোখ মুছে ঘরে ফিরলুম।

॥ ২ ॥

এসে দেখি ক্ষেপু মুখ গুঁজে কাঁদছে। ঘাবড়ে গেলুম। কিছুদিন হলো চাকরির খোঁজে এসেছে; ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আশার আলো অনেকেই দেখায়—কিন্তু কার্যতঃ আলেয়া। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, সর্বত্রই

আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, ফন্দি ফিকির কম খাটায় নি···হরি সংকীর্তনে কেঁদেছে, বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর ক'রে হেদিয়ে গেছে, কালীঘাটের রাস্তায় সব বড় বড় জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছে ; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, মা কালীর চরণামৃত পান, মাঙ্গলিক বিল্বপত্রধারণ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, নারায়ণকে তুলসী দান—এসব প্রচলিত রাস্তায় অনেক হেঁটেছে ; ফকির সাহেবের 'আজব' তাবিজ ই'স্তেমাল করেছে ; ৫।/৫ দক্ষিণা দিয়ে উগ্রভৈরব তান্ত্রিকের মন্ত্রসিদ্ধ জবাফুল নিয়ে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির বড়বাবুকে স্পর্শ করে দিয়েছে ; এই প্রক্রিয়াতে নাকি চাকরি হাতের মুঠোয় এসে যায়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবও ঠেকাতে পারেন না। বড়বাবু ফুলের আঘাতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন, কিন্তু চাকরি দেন নি। ক্ষেপু মা কালীকে নালিশ জানিয়েছে, 'মা! তুই যখন মুখ তুলে চাইলি না, তখন উগ্রভৈরবকে দোষ দিয়ে আর কী করবো'। সেদিনই কালীঘাটে এক সাধুবাবার সঙ্গে দেখা ; একটা মন্ত্র দিয়ে তিনি আদেশ করলেন, 'রোজ জপ করবি, দিল্লি চলে যা, চাকরি তোর জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে।' মন্ত্রের জন্য গচ্চা কতো লেগেছিলো জানতে চেয়েছিলুম ; আমতা আমতা ক'রে ক্ষেপু বললে, 'গচ্চা মানে? এক পয়সাও নিতে চান নি।' 'অনিচ্ছা সত্ত্বে কিছু?' 'তা, মানে আমার পীড়াপীড়িতে বাবাজী বলেছিলেন, "আচ্ছা, কিছু না নিলে যখন তুই মনে ব্যথা পাবি তখন পুজোর জন্য দে পাঁচটা টাকা" ' বলে ক্ষেপু। ···পাঁচটাকা মূল্যের অরিনিসূদন, চাকরিপ্রদানকুশল মন্ত্রটি চতুর্দিকে ক্ষেপণ ক'রে প্রতীক্ষমাণ পদটির জন্য আজ চার মাস কী নাজেহাল-ই না হ'চ্ছে ; সব আফিসের কর্তারাই এক বাণী শুনিয়ে আসছেন, 'হেথা নহে, হেথা নহে, অন্য কোথা আর'। ভাবলুম চার মাস ধ'রে সাধা মন্ত্রটি বোধ হয় আজ যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করি, 'কিরে ক্ষেপু? চাকরি হলো না বলে ছোট ছেলের মতো কাঁদছিস?' ক্ষেপু উত্তর করে, 'তা নয় ; চিঠি এসেছে, দুঃসংবাদ আছে।' শঙ্কিত হ'য়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাই। 'দয়ালদার চিঠি এসেছে, কালকে এসে পৌছবেন ; আগে আসতে পারেন নি কারণ—', আবার কাঁদে। ফ্যাসাদে পড়লুম ; এর জন্য কাঁদে কেন? তবে কি—কিন্তু তাই-ই বা কি করে হবে? একটু সামলে নিয়ে ক্ষেপু বলে, 'দয়ালদা পূর্বে আসতে পারেন নি—।'

: খানা লাগাউঁ ?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, খানা লাগাও। চোপর দিন আজ খাওয়া হয় নি ; অনেকগুলো

ভেট-মুলাকাতের ঝামেলা ছিল ; যে হোটেলটায় মাঝে মাঝে খাই সেখানে যেতে যেতে দেড়টা, সব সাফ হ'য়ে গেছে ; এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ খেয়ে আজ দিন কাটিয়েছি।

পাঁড়েজী রুটি তরকারী নিয়ে এলো ; 'গোস্ত' আছে শুনে সকরুণ সুরে ক্ষেপু জানায় মাংস আজ আর খাবে না। আমার কটোরা থেকে মাংসের দিব্যি গন্ধ বেরুচ্ছে। ক্ষেপু মন্তব্য করে, 'পাঁড়েজী বেশ রাঁধতে শিখেছে দেখছি, তোফা গন্ধ—'

ঃ একটু দিক না ?

ঃ আজকে আর খাবো না ভাবছিলুম।

ঃ চেখে দেখ ; তাতে আর দোষ কি ?

পাঁড়েজী এক হাতা দিয়ে গেল। শুরুয়াটুকু বেশ চেটে খাচ্ছে দেখে পাঁড়েজীকে ইশারা করি ; পাঁড়েজী এক কটোরা 'গোস্ত' পাতে ঢেলে দিল। খাপ্পা হ'য়ে ক্ষেপু ধমকায়, 'কেয়া কিয়া জী ? এতনা কাহে দিয়া ? সব বরবাদ না আব হউগা ?'

যতোটা খাবি খা না ?

ঃ জারা সা তো হ্যায়, বাবু।

ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার কুছ নেহি হ্যায় !—এই বলে ক্ষেপু খানিকটা খায় ; তারপর উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়, সামান বরবাদ করা অন্যায় ইত্যাদি মন্তব্য ক'রে বিশখানা রুটী দিয়ে সব চেটেচুটে খেয়ে ফেললো।

শুয়ে শুয়ে একটা বই দেখছিলুম ; ক্ষেপু বিছানায় উসখুস করছে ; জিজ্ঞেস করলুম, 'কাঁদছিলি কেন ?'

ঃ মণিদা আসতে পারবেন না—

ঃ সে তো পুরনো কথা, অসুখ করেছে, শয্যাশায়ী···তবে কি মারা গেছেন নাকি রে ?

ঃ না ; তবে বলা যায় না কি হয়।

ঃ চাকরির কিছু হলো ?

ঃ এক জায়গায় লেগে যেতে পারে। বড্ড হাঁটাহাঁটি করেছি আজ, ঘুম পাচ্ছে, বাতিটা নিবিয়ে দে।

বাতি নিবিয়ে মণিদার কথা ভাবছিলুম···তবে কি মারা গেলেন ? মণিদা সত্যিই মণিদা···সরল, স্নিগ্ধ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন···দয়ালদা যেমন আধ্যাত্মিক জীবনে

একটি সরল রেখা টেনে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করেন, মণিদাও তেমনি গার্হস্থ্য জীবনের ছায়াশীতল কুঞ্জবীথিকায় বিহার করেন; কুম্ভমেলায় আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার যাবেন ঠিক ছিল—মণিদা, দয়ালদা তুজনার-ই প্রতীক্ষায় ছিলুম; কিন্তু মণিদা পড়লেন অসুখে...'ক্ষেপু! দয়ালদা আর কিছু লিখেছেন—মণিদার সম্বন্ধে?'

ঃ মণিদা মারা গেছেন।

॥ ৩ ॥

দয়ালদা আমাদের চাইতে প্রায় বিশ বছরের বড়, কিন্তু আবাল্য বন্ধু—**friend, philosopher, and guide**। পরিব্রাজক হয়ে কিছুদিন ভিক্ষাটনের পর সদ্‌গুরু লাভ হয়—বৈদান্তিক সাধু, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, নাম রামতীর্থ; গুরুর আদেশে দয়ালদা ঘরে ফিরে আসেন এবং সংসারে থেকে সাধন ভজন করেন: রামতীর্থজী বলতেন, 'সংস্কারমুক্ত হতে হবে, খোলস বদলে লাভ কি? গেরুয়া নিয়ে কি শেষে স্বখাত সলিলে ডুবে মরবি? আজকাল আবার ভেকেও ভিক মেলে না; ঘরে যা, সামান্য কিছু কাজ কর, বাকী সময় ধ্যান-ধারণায় কাটা।' দয়ালদা জ্ঞানমার্গের সাধন নিয়েছিলেন; পঞ্চদশী ও সোহংস্বামীর বই ছিল নিত্য সহচর; হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী ক'রে কোনো প্রকারে দিন গুজরান করতেন। আমাদের চা খাওয়া ইত্যাদি তিনি পছন্দ করতেন না; বলতেন, 'জীবনরক্ষার প্রয়োজন মেটাতেই যখন মানুষ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তখন অনর্থকের বোঝা আবার পিঠে চাপানো কেন?' একথা বলবার অধিকার ওঁর ছিল—অনাড়ম্বর, নির্বিবাদ জীবন, কোনো বাজে জিনিসের বালাই নেই; সহজ, পরিচ্ছিন্ন, সন্নদ্ধ; যেন জ্যামিতির নিখুঁত একটি চিত্র। নিজের জীবনের দিকে তাকালে দেখি—রাজপথ; কতো লোক আনাগোনা করে, কতো খড় কুটো, কাগজের টুকরো, শুকনো পাতা ওড়ে, কতো আবর্জনা জমে; কতো ফানুস ওড়ে; অথচ বলি জীবনটা আমার! দয়ালদা বলতে পারেন, 'আপনাতে আপনি থাক মন, যেয়ো নাকো কারু ঘরে।' আমার মনে দেখি রাজ্যের লোক ভিড় করে আছে—দেশের কী হবে; স্বরাজ দেখে যেতে পারবো কি না; হিটলার—মুসলিনি-চার্চীল; বলশেভিজ্‌ম্—স্ট্যালীন; ভারতে গণতন্ত্র হবে না সমাজতন্ত্র হবে, কম্যুনিজ্‌ম্ না অ্যানার্কিজ্‌ম্; এর পর গান্ধিজী কী করবেন; পাকিস্থান আবার কী চীজ; চরখাতে কেউ বিশ্বাস করে কি না; হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা;...

মাসীমাকে আরও কিছু পাঠালে হতো ; বীরুকে মাস মাস কিছু না দিলে পড়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে ; সেদিন অপমানিত হলুম, কিছুই বলতে পারলুম না, একথাটা শুনিয়ে দিলে হতো, তার উত্তরে যদি···তবে পালটা জবাব এই দিতুম, তারপর এই···এই···এই···খড় এবং কুটো, কুটো এবং খড়। হাবুল আমার ভাইপো, কলেজে পড়ে ; একটা চাকাই নিয়ে খেলছিল—একবার সুতো ছাড়ে আবার হ্যাঁচকা টানে চাকাইটা হাতে নেয়, আবার সুতো ছাড়ে আবার টানে···খানিকক্ষণ এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দেখে বললুম, "আমরা যখন জ্যামিতির কোনও প্রতিজ্ঞা এবং প্রমাণ মুখস্থ করি তখন উদ্দেশ্য থাকে এই যে সত্যটি নূতন সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতে পারবো ; কিন্তু যদি কেউ রাত দিন 'সুতরাং ত্রিকোণ দুটি পরস্পর সর্বতোভাবে সমান' এই ছড়া আবৃত্তি ক'রতে থাকে তবে বলি, লোকটা পাগল ; অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি চলে বৃত্তাকারে, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি চলে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে।" হাবুলকে তো এক হাত নিলুম, কিন্তু আমি কী ? একই নিষ্ফল চিন্তার পুনরাবৃত্তি দিনের পর দিন চলেছে ; আমার চিন্তাদ্বারা যদি সমস্যার এতটুকুও সমাধান হতো তবে বুঝতুম অগ্রগতি হচ্ছে, কিন্তু সর্বত্রই যথাপূর্বম্ তথা পরম্—হাত পা যেন কে বেঁধে রেখেছে ; অসহায় ভাবে, বাধ্য হয়ে একই দৃশ্য বার বার দেখে যাচ্ছি···পূজোর ঘরে বসে সেদিন ভাবছিলুম, চিঠিতে এই কথাগুলো লিখে দেবো ; এই কথাগুলো লিখতে হ'বে চিঠিতে, দেবো লিখে এই কথাগুলো চিঠিতে···আয়করের পরোয়ানা এসেছে, টাকাগুলো মাস মাস দিলেই হতো, পরোয়ানা এসেছে যখন দিতেই হবে টাকাগুলো, অনেকটা টাকা জোগাড় করতে হবে, দিতে হবেই, আয়করের পরোয়ানা, অনেকগুলো টাকা···মাথা খারাপ নয় ? শ্রীভগবান বলেন, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মন্যতে[১]—কোথায় কর্তা ? হাজার রকমের ব্যর্থ চিন্তার কর্মকারক হ'য়ে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দয়ালদা প্রায়ই বলেন, নিষ্ফল চিন্তা ছাড়ো। 'ছাড়ো' বললেই ছাড়া যায় নাকি ? একটি প্রাচীন সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, ভারতের স্বাধীনতা কবে হবে ? উত্তর করেন, ভগবানের যখন ইচ্ছা হবে। সুতরাং সাধুজীর এ নিয়ে ভাবনা নেই ; আমারও থাকা উচিত নয়, কারণ এক বিঘৎ সুতো কেটেও স্বরাজের রাস্তা পরিষ্কার করি নি। কিন্তু তবুও দিনের পর দিন কল্পলোকে বিচরণ করে স্বরাজের কতো বিঘ্ন সরিয়েছি, কতো সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছি, কতো লোকের বেকুবি ধরিয়ে দিয়েছি, কতো

(১) গীতা ৩—২৭

লোককে ঠিক পথে চালিত করেছি, কতো নেতাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছি! পাগলামি নয়? এক··দুই···তিন; এক···দুই···তিন; এক···দুই···তিন··· লাটিমের মতো এমনি ঘুরপাক খেতে খেতে একদিন হয়তো অখণ্ড নিষ্ফলতায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়বো; দয়ালদা জপ করতে করতে ততদিনে কোন্ সুদূরে চলে যাবেন কে জানে···মণি-দা তো আগেই সরে পড়লেন···মায়ের একমাত্র ছেলে··· দয়ালদা আসতেই কাকীমার কথা জিজ্ঞেস করলুম; দয়ালদা বললেন,

ঃ মণির মার কান্না শুনলে পাষাণও গলে যায়।

ঃ ভগবান্ কি এই কান্না শুনতে পান না?

ঃ তিনি অন্তর্যামী, তাঁর অগোচর সংসারে কিছুই নেই; গাছের পাতাটিও তাঁর ইচ্ছায় পড়ে।

ঃ এমন সর্বনাশা ইচ্ছা তাঁর হয় কেন? কাকীমা ছিলেন যেন মা যশোদা; নৌকো ক'রে আমরা বিকেলবেলা বেড়াতে যেতুম, সন্ধ্যা হতেই কাকীমা ঘাটে এসে ব'সে থাকতেন, লোক-দেখানো জপ করতেন, আসলে মণি-দা কখন ফেরেন সেই আশায় পথের দিকে চেয়ে থাকতেন। এমনি মা-যশোদার উপর বিধি হলেন বাম?

দয়ালদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসলে তিনি সব ছিনিয়ে নেন; "যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ"।

ঃ কিন্তু লাভ?

ঃ রোয়-রোয় অখিয়াঁ রাতী।

ঃ তার আর পর নেই?

ঃ আছে। 'নিরখ নিরখ সুখ পাতী'।

॥ ৪ ॥

দয়ালদা, ক্ষেপু, আমি; কুম্ভমেলার যাত্রী; হরিদ্বার চলছি···গাড়ীতে বসে মণিদার কথাই ভাবছি···স্নেহের স্নিগ্ধ সুকোমল নীড় ছেড়ে কোন্ হৃদয়হীনের করাল ডাক শুনে পাড়ি দিলেন এক অজানা দেশে···নন্দনগন্ধমোদিত জীবনকুঞ্জে যে সব রাগিণী বেজে উঠেছিল এক মুহূর্তে গেল সব থেমে। রবিবাবুর গান অনেকের মুখে শুনেছি, বেশীর ভাগ নেকা ঢং ও নাকী সুর। মণিদার গলা ছিল যেমনি মিষ্টি তেমনি গম্ভীর, ফৈয়াজ খাঁর ওস্তাদি বাদ দিলে যে সহজ উদাত্ত গাম্ভীর্য বাকী থাকে তা ছিল ওঁর গানে। মাঝে মাঝে রজনী সেনের গান শুনেছি—

তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটেছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে।

আর একটি প্রিয় গান ছিল—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল তোমারি করুণা চন্দনে !
কবে, ভবের সুখদুঃখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া ;
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না.
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

ট্র্যাজিক আয়রণি ?…রবিবাবুর গানই গাইতেন বেশী ; আমাদের নৌকা-বিহারের গান ছিল—অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে ; অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায় ; ঐ রে তরী দিল খুলে ; কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি ধরায় আস ; তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো ; যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে ; যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু ; যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ; রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি ; যদি প্রেম দিলে না প্রাণে, কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে ; সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর……রামকৃষ্ণ মিশনের একটি উৎসবে গেয়েছিলেন—

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে বরণে, এসো গানে ॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে অমৃতময় হরবে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু'নয়ানে।
নব নব রূপে এসো প্রাণে ॥

স্তব্ধ হয়ে সকলে শুনছিল…অমৃতময় হরষে মন চলে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বলোকে আলোকের সন্ধানে—আলো যেথায় শুভ্র, রূপ অরূপবিদ্ধ, প্রাণ আনন্দ সাগরে হিল্লোলিত………আর একদিন। বিকেল বেলা নৌকো করে বেড়াতে

বেরিয়েছি; দয়ালদা, মণিদা, ক্ষেপু, আমি; সঙ্গে মণিদার হারমোনিয়াম। গ্রাম থেকে অনেকটা দূর চলে এসেছি; চার দিকে জল আর জল; পশ্চিমাকাশ অস্তরাগে রঞ্জিত····· পাখীরা আপন আপন কুলায়ে ফিরে যাচ্ছে; জলে আলো-ছায়ার ঢেউ···মণিদা ভীমপলশ্রীতে গান ধরলেন—

আব তো বড়ী বের ভঈ, টেরত হোঁ তুমকো মোরে রব সাইয়াঁ।
ভঁবর জাল মেঁ আন ফঁসে, ভবসাগরতে পার করো মেরে সাইয়াঁ॥

কথার মানে ঠিক বুঝি নি; সুরের আবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, মনে হচ্ছিল আমারই চোখের জলে রচিত এক অসীম সমুদ্র, দু'হাতে ঢেউ কেটে এগিয়ে চলছি অস্তরবির ওপারে—এই আশায় যে হয় তো বা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবে······মিলন আজও হয় নি; দুঃখের আরও কতো ঢেউ আসবে, কতো প্রিয়জন খসে পড়বে, কতো বাধা বিপত্তির আঘাত পেয়ে দু'হাতে চোখ মুছতে হবে······হে ভগবান্! হে মধুসূদন! হে দীনবন্ধু দীনদয়াল! হে জগৎপতি জগন্নাথ!······তোমাকে পেলে তো সব ক্ষতিই পূরণ হয়···সব ক্ষত আরাম হয়ে যায়···আমার সকল অশ্রু কবে মুক্তাফল হবে তোমার পরশে? কোথায় তোমাকে খুঁজি?

সুদূরে কোন্ নদীর পারে;
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

॥ ৫ ॥

সকাল বেলা; জোয়ালাপুর স্টেশন; এর পর হরিদ্বার। শ্রীহরিদর্শনের দুয়ার যেমন হরিদ্বার, হরিদ্বার প্রবেশের দুয়ার তেমনি জোয়ালাপুর। সব স্টেশনেই কুম্ভমেলার যাত্রীদের ভিড়। গাড়ী থামতেই প্ল্যাটফর্ম থেকে তূর্যধ্বনি ওঠে 'জয় শ্রীরামচন্দ্রকী জয়', গাড়ীর কামরা থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে 'জয় সীয়ারামকী জয়'। দয়ালদা, ক্ষেপু, আমাদের কামরার লোক, সকলেই আনন্দে সজীব ও সজাগ। প্ল্যাটফর্ম থেকে এক পণ্ডিতজী গেয়ে উঠলেন,

রঘুপতি-রাঘব রাজা রাম

আমাদের কামরায় এক পণ্ডিতজী ছিলেন, জবাব দেন—

পতিত পাবন সীতারাম

এর পর উত্তর প্রত্যুত্তরের রীতিতে দুজনা গেয়ে চলেন তুলসীদাসজীর ভজন—

ঃ শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন, হরণ-ভব-ভয় দারুণং।
নবকঞ্জ-লোচন, কঞ্জমুখ, করকঞ্জ পদ কঞ্জারুণং॥
ঃ কন্দর্প অগণিত অমিতছবি, নবনীল-নীরদ সুন্দরং।
পটপীত মানহুঁ তড়িত রুচিশুচি নৌমি জনক সুতাবরং॥
ঃ ভজু দীনবন্ধু দিনেশ দানব-দৈত্য-বংশ-নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ-কন্দ কোমলচন্দ দশরথনন্দনং॥
ঃ শির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু, উদার অঙ্গ বিভূষণং।
আজানু-ভুজ শর-চাপ-ধর সংগ্রাম-জিত খরদূষণং॥
ঃ ইতি বদতি তুলসীদাস, শঙ্কর-শেষ-মুনি-মনোরঞ্জনং।
ঃ মম হৃদয়-কঞ্জ নিবাস কুরু, কামাদি-খল-দল-গঞ্জনং॥

হিমালয়ের পূত আকাশ ভগবানের কল্যাণবর্ষী নামে মুখরিত হয়ে উঠলো; গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় নিনাদিত হয় 'জয় শ্রীরামচন্দ্রজীকী জয়'··· পণ্ডিতজী ভজন ধরেন—

ভজ মন রাম চরণ সুখদাঈ॥
জিহি চরণসে নিকসী সুরসরি সংকর জটা সমাঈ।
জটা সংকরী নাম পর্‌য়ো হৈ, ত্রিভুবন তারণ আঈ॥
সোই চরণ সন্তনজন সেবত সদা রহত সুখদাঈ।
সোই চরণ গৌতমঋষিনারী পরসি পরমপদ পাঈ॥
সিবসনকাদিক অরু ব্রহ্মাদিক সেষ সহস মুখ গাঈ।
তুলসিদাস মারুত সুতকী প্রভু নিজ মুখ করত বড়াঈ॥

জয় শ্রীরামচন্দ্রজী কী জয়।

রাম জপু, রাম জপু, রাম জপু, বাবরে।
ঘোর-ভব-নীর-নিধি নাম নিজ নাব রে॥

সমবেত কণ্ঠে 'নাম নিজ নাব রে, নাম নিজ নাব রে'।

ভলো জো হৈ, পোচ জো হৈ, দাহিনো জো বামরে।
রাম-নাম হী সোঁ অন্ত সবহীকো কাম রে॥

পুনরায় 'নাম নিজ নাব রে, নাম নিজ নাব রে'······

একজন সহযাত্রী টোড়ীরাগে ধরেন—

তূ দয়ালু, দীন হৌঁ, তূ দানি, হৌঁ ভিখারী।
হৌঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তূ পাপ পুঞ্জ হারী॥
নাথ তূ অনাথকো, অনাথ কৌন মোসো?
মো সমান আরত নহিঁ, আরতিহর তো সো॥

সমবেতকণ্ঠে 'মো সমান আরত নহিঁ, আরতিহর তো সো'……

ব্রহ্ম তূ, হৌঁ জীব হৌঁ, তূ ঠাকুর, হৌঁ চেরো।
তাত, মাত, গুরু, সখা তূ সব বিধি হি তূ মেরো॥

পুনরায় 'মো সমান আরত নহিঁ, আরতিহর তো সো'……

পণ্ডিতজী জবাব দেন স্থরদাসজীর ভজনামৃতে—

স্থনেরী মৈঁনে নিরবলকে বল রাম।

সমবেত কণ্ঠে 'বল রাম, বল রাম, বল রাম বল রাম……

দ্রুপদ স্থতা নিরবল ভই তা দিন, তজি আয়ে নিজধাম।
দুস্‌সাসনকী ভুজা থকিত ভঈ, বসনরূপ ভয়ে শ্যাম॥

পুনরায়, 'বল রাম, 'বল রাম, বল রাম, বল রাম'……

অপ-বল, তপ-বল, ঔর বাহুবল, চৌথো হৈ বল দাম।
স্থর কিসোর কৃপাতেঁ সব বল, হারেকো হরিনাম॥

পুনরায়, 'বল রাম, বল রাম, বল রাম, বল রাম'……

জয় শ্রীরামচন্দ্রজীকী জয়… ……

অপূর্ব পরিবেশ…নির্বল কে বল রাম…রাম চরণ স্থখদাঈ…হিমালয় দেবভূমি, হরিদ্বার পুণ্যতীর্থ; বাইরের দৃশ্য অভিনব, নয়নাভিরাম· ·অমৃতবর্ষী ভজন… ·· রাম নাম স্থখদাঈ…দিব্যধামের সংবেদনে যাত্রীরা অশ্রুকাতর…মন আকুতি-পূর্ণ…দেবতাদের বিহারভূমি হিমালয়; আকাশ বাতাস পবিত্র; বনভূমি তপঃ-শুদ্ধ; সংসারের কেনা-বেচা, রাগ-দ্বেষ, মৃত্যু-শোক সব কোথায় তলিয়ে যায়; ধুলোর জগৎ ছেড়ে মেঘলোকের স্বপন নিয়ে চলি ঊর্ধ্বে নগাধিরাজের পরম ধামে, শুদ্ধ ভূমানন্দ যেথা 'রোমাঞ্চিত নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে'…দেবাদিদেবের অঙ্গজ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেবভূমিকে প্রণাম! ক্লিষ্ট মনে হরির দুয়ারে এসে যদি দাঁড়াতুম, হয় তো বন্ধই থেকে যেতো দুয়ার, ফিরে আসতুম পথের ক্লেদ ও মনের গ্লানি নিয়ে…হে ভকতবৃন্দ! তোমরা নামামৃত বর্ষণ ক'রে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত করেছ, তোমাদের চরণে প্রণাম!…হে কুম্ভ-

স্নানার্থী হরিদর্শনকামী যাত্রীসমাগম! তোমাদের চরণধুলোয় ধূসর হ'য়ে হরিদ্বারের সুমুখে আমরা দণ্ডায়মান, তোমাদিগকে অসংখ্য প্রণাম জানাচ্ছি! হে মৌন শান্ত গিরিরাজ! আশৈশব তোমার স্বপ্ন দেখেছি, হৃদয়ের নিভৃত কোণে তোমার ডাক শুনেছি, অন্তরের গূঢ় বেদন দিয়ে তোমার শৃঙ্গ ও বনানী মণ্ডিত করেছি; মৃত্তিকা, পর্বত, গিরিমালা, আর বৃক্ষলতা দেখে যদি তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'তো তবে নিরাশ হয়ে খিন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরতুম···তোমার দেবতাত্মার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয় করিয়ে যাত্রা মোদের সার্থক করেছ; তোমাকে নত মস্তকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি! পথ চলতে চলতে আমাদের মিলন যেন আরও গভীর, আরও নিবিড় হ'য়ে ওঠে! হে দেবতাত্মা হিমালয়! অশ্রুবিধৌত চিত্তে তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাচ্ছি!······

॥ ৬ ॥

হরিদ্বারের কুম্ভ—ন স্থানং তিলধারণম্। নাথ সম্প্রদায়ের মোহন্তজীর নামে একখানা সুপারিশ চিঠি এনেছিলুম; মোহন্তজী বাগানের খালি জায়গা দেখিয়ে দিলেন, অন্যত্র স্থান নেই। গাছতলায় জিনিসপত্র রেখে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্ষেপু বেরিয়ে গেল কোনো সুরাহা হয় কিনা দেখতে; ওর এক বন্ধুর আসবার কথা আছে, ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের ধারে তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় ঠিক হয়ে যাবে যদি ভদ্রলোক এসে থাকেন। দয়ালদাকে জিজ্ঞেস করি, কি হবে? উত্তর করেন, তাঁর যা ইচ্ছা।······আমার কিন্তু ক্ষেপুর উপরই ভরসা বেশী; ও কারতকর্মা লোক, অসাধ্য সাধন করতে পারে, দূরকে নিকট বন্ধু এবং পরকে ভাই করে নেওয়া পাঁচ-দশ মিনিটের কাজ—সম্বন্ধম্ আভাষণপূর্বম্। এক বছর আলাপের পরও আমি যেখানে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বা 'বাবু' থেকে 'দাদা'তে উঠতে (নাবতে?) পারি না, ক্ষেপু সেখানে সাতদিন যেতে না যেতেই বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে 'বউদি' সম্পর্ক পাতিয়ে চা-এর আসরে জমিয়ে বসে। ঠোক্কর যে কোথাও খায় না তা নয়, তবে সাধুদের মতো মান-অপমানকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে চলবার সামর্থ্য রাখে। আমি ঠিক উল্টো—লাজুক, ক্লিষ্টসংবেদী, hypersensitive; আলাপ করবার আগেই মনে হয়—যদি ভদ্র লোক বিরক্ত হন; আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি সন্দিহান হন, বা কটাক্ষ করেন, বিদ্রূপের হাসি হাসেন······তবে যে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে!······এই ভয়েই নিজেকে নিজের ভিতর গুটিয়ে চুপ

ক'রে থাকি ; আর যদি আবেদন নিয়ে যেতে হয় কারু কাছে তবে 'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি' ; বেপথু্ হয় নি চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে ; ব্যাপারটা নৈর্ব্যক্তিক বলে হয়তো। জানি, চাকরিদান এবং প্রাপ্তির রহস্যটা শোণিত সম্পর্ক বা ফেলো-কড়ি-মাখো-তেল জাতীয় সম্বন্ধ বিশেষের সঙ্গে জড়িত ; তা না হলে ক্ষেপুর ব্যর্থ হয়রানির কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না……গাড়ীতে আজ বেশ ভাবাবিষ্ট ছিল ক্ষেপু, দয়ালদার সঙ্গে কেঁদেছে, শ্রীরামচন্দ্রজীর জয় গেয়েছে ; এঁদের পুণ্যবলে হয়তো বা মাথা গোঁজবার একটু জায়গা হয়ে-ও যেতে পারে……কিন্তু যদি না হয়? দিনের বেলা গাছতলা মন্দ লাগে না, কিন্তু রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা……যদি অসুখ করে? বিদেশ বিভূঁই ; যদি নিমুনিয়া হয়?……নাঃ, আমার দেখছি ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই! ভগবানের নাম নিই বরং……আমার পাপে আবার পাওয়া জায়গা ফসকে না যায়!…ক্ষুধাও পেয়েছে ; স্টেশনে এক পেয়ালা চা খেয়েছিলুম, সংকল্প ছিল গঙ্গাস্নান না ক'রে খাবো না কিছু·· তবে গতিক যা দেখছি··· বিস্কুট আছে সঙ্গে, খেলে হ'তো…কিন্তু দয়ালদা…ধেৎ, সব বাজে চিন্তা……জপ করি বরং…রামচরণ সুখদাঈ, রামচরণ সুখদাঈ…স্নান যে আজ কখন করবো··দুর্বলকে বল রাম…দয়ালদা চোখ বুজে বোধ হয় জপ করছেন… মণিদা এলে খুব কষ্ট হতো……মণিদা নেই!··বিশ্বাস হয় না যেন…… মণিদার সঙ্গে **Prometheus Unbound** পড়েছিলুম…স্পিরিটদের গানগুলো কী অপূর্ব……হিমালয়ের নিভৃততম দেশে গন্ধর্বনগরীর পুষ্পোদ্যানে মণিদা বোধ হয় সুরের মোহে আবিষ্ট হয়ে আছেন·· **dreaming like a love-adept...feeds on...aerial kisses...of shapes that haunt thought's wildernesses**...রামচরণ সুখদাঈ…রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম ; রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম…আঁৎকে উঠলুম ; আড়ামোড়া ভেঙে, চোখ রগড়ে দেখি ক্ষেপু পান চিবুচ্ছে, চেহারায় জৌলুস ফিরেছে, নিশ্চিন্ত মনে বলছে,'ওঠ্, ওঠ্ ; শিগ্‌গির করে চল্ ; জায়গা ঠিক ; আগে এলে ভাল একটা ঘর পেতুম ; একটা চোরাকুঠরী ছাড়া সব ফিল্‌ড্ আপ্ (**filled up**) ; সেটাই ঠিক করে এসেছি…হ্যাঁ খাওয়াদাওয়া সেরেই এলুম ; কিছুতেই ছাড়বে না বন্ধু ; চটানো ঠিক নয় তো'…

তিনজনের পক্ষে ঘরটি ভালই বলতে হবে—আলো বাতাস থাক আর না থাক। কুম্ভমেলার সময় এরূপ আশ্রয় ভাগ্যে মেলে।…ক্ষেপুর ঘাড়ে গোছগাছের ভার

চাপিয়ে আমরা দুজনে চললুম গঙ্গাস্নানে; নিকটেই গঙ্গা; ব্রহ্মকুণ্ডের আশা আজকের মতো ছেড়ে দিলুম। স্নান করতে নেমে দয়ালদা অন্য মানুষ; ছোট ছেলের মতো নিজের গায়ে জল ছিটিয়ে বার বার ডুব দিচ্ছেন, আর মা গঙ্গাকে ডাকছেন—মাতর্গঙ্গে; মাতর্গঙ্গে; ত্রিভুবনতারিণী, কলুষহারিণী, পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গে···কী ঠাণ্ডা জল; ডুব দিলে দেহমন শীতল হয়, অন্তঃকরণ পবিত্র হয়···দয়ালদার ছোঁয়াচ লাগে···হঠাৎ কান্না পায়···দয়ালদা আশীর্বাদ করেন, শুভলগ্নে স্নান হলো তোমার, প্রেমগঙ্গায় অবগাহন করে ধন্য হলে, এমনি কুলুকুলুনাদিনী প্রেমধারা তোমার হৃদয়ে প্রবাহিত হক··· দয়ালদার কথায় কান্না আরও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে···তখন স্কুলে পড়ি, বয়স ১৪।১৫; গরমের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছি···প্রায় আট মাইল রাস্তা···কাঠফাটা রোদ···শরীর গলদ্ঘর্ম, জিভ শুকিয়ে গেছে, পা আর চলে না···বিকেল নাগাদ ক্লান্তদেহে বাড়ী পেঁছুই···শীতলপাটী বিছিয়ে দিয়ে মা বলেন, 'শো, আমি পাখা করি'; মার পায়ের ধুলো নিয়ে এলিয়ে পড়লুম···পরম বিশ্রান্তি, কান্নায় বুক ভরে যায়, মায়ের চরণতলে সব গ্লানি মুছে যায়, শান্তিতে জগৎসংসার ভুলে যাই, ঘুম পায়···চোখ খুলে দেখি রান্নাঘরের পেছনে কুলগাছটার মাথায় অস্তাচলের আলো—এমন আলো তো কোনো দিন দেখি নি···গঙ্গাস্নান করে ছোটবেলাকার সেই দৃশ্যটি মনে পড়ে···মায়ের স্নেহাশিসের মতো শান্তি ও স্নিগ্ধতায় চিত্ত ভরে যায়···ঘুম পায়, যেমন ছোট ছেলে মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয়···দয়ালদার আলিঙ্গনে গায়ে কাঁটা দেয়···ফিরে চলি কুঠরীর দিকে ···দোকানপাট, বাড়ীঘর, লোকজন—সবাই যেন গঙ্গাস্নান করে এক অপার্থিব আলোতে ঝলমলিয়ে ওঠে···মাতর্গঙ্গে! মাতর্গঙ্গে!···অলকানন্দে! পরমানন্দে! হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে! জয়, জয়, জাহ্নবি! পুণ্যতরঙ্গে!···মাতর্গঙ্গে! মাতর্গঙ্গে!

॥ ৭ ॥

বিকেলবেলা সাধুদর্শনে বেরিয়েছিলুম। কুম্ভমেলার সাধু—দেখে শেষ করা যায় না; দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখলেও চেনা মুস্কিল। দয়ালদা বলেন, 'শুধু প্রণাম করে মনে মনে আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রবে, তাতেই কল্যাণ হয়'। দয়ালদার মতো ভক্তিমান্ পুরুষের সঙ্গ লাভ না হলে হরিদ্বার-হৃষীকেশ-লছমনঝোলা টানা-প'ড়েন করা হতো, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে 'অপূর্ব' বলে আসর জমানো

যেতো, কুম্ভস্নানের গল্প ফেঁদে কূপমণ্ডূকদের তাক লাগানো যেতো—কিন্তু তীর্থদর্শন হতো না। অথচ বিপশ্চিতো যান্তি মুহূর্তসেবয়া, ক্ষণিক সাধু সঙ্গে অশেষ পাপ নষ্ট হয়; ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা, সজ্জন সঙ্গই ভবসিন্ধুপারের একমাত্র নৌকা…সাধুদের পদধূলি নিতে নিতে ভাবি, আমার পরম সৌভাগ্য যে আকৈশোর দয়ালদার সাহচর্য পেয়েছি, ওঁর ভজন ও নামকীর্তন শুনেছি, প্রার্থনাকালে ওঁর অশ্রু-পুলক-কম্প দেখেছি, আর সব চাইতে বড় জিনিস ওঁর ভালবাসা পেয়েছি…ছুটির দিনে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা একসঙ্গে কেটেছে…গল্পচ্ছলে একদিন বলছিলেন জ্ঞানমার্গ ছেড়ে কি করে ভক্তিমার্গে এলেন—"বেদান্তের সাধনা অনেকদিন ক'রে মনে হ'লো ভিতরটা যেন শুকিয়ে গেছে; সাধনার পথে শুষ্কতা আছে, অভিজ্ঞতাও আছে; কিন্তু এটা ছিল একটু অন্য ধরণের; তবুও বিচার-ধ্যান ক'রে যাই; গুরুদেব বেঁচে থাকলে তাঁর শরণাপন্ন হতুম, কিন্তু তিনি দেহরক্ষা করেছেন; কাজেই তাঁর দেখানো রাস্তা ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলি, কিন্তু শুষ্কতা যায় না—মনের উচাটন অবস্থা যাকে বলে…আধ্যাত্মিক জীবনটা সুখের নয়; অনেককাল ধ'রে অনেক কষ্ট ক'রতে হয়, জন্মজন্মান্তরের বিরোধী সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যেতে হয়…এমনি যখন অন্ধকারে হোঁচট খাচ্ছি তখন যা ঘটলো তাকে অলৌকিকই বলতে হয়। নিমুকে তো তোমার মনে আছে? পূবের দালানে তাদের ঘর ছিল; পাঁচ মাস যাবৎ পেটের অসুখ, বাঁচবার আশা নেই, শয্যাশায়ী; একবার করে রোজ দেখে আসি। খুব ভালবাসতো আমাকে, না গেলে কান্নাকাটি করতো…একদিন ভোর বেলা, ধ্যানে বসেছি; কে কড়া নাড়ে। বিরক্ত হই। আবার কড়া নেড়ে বলে, 'দাদা, দরজা খোলো'। ভাবলুম কেউ ওষুধ নিতে এসে থাকবে। দরজা খুলে দেখি—নিমাই; অপরূপ চেহারা, রোগে ভুগে যে মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিল তাতে যেন দুধে-আলতা রঙ, দেহ ও মুখকান্তিতে দিব্য আভা, আনন্দ উপছে পড়ছে …নিমু বললে, 'শ্রীরাধার আবেশ হয়েছে আমাতে, এক্ষুনি চান করে এসো, তোমাকে দীক্ষা দেবো প্রেমমন্ত্রের'। দীক্ষার পর আমাকে সাবধান করে দিলো, 'এই বাইরের ঘরেই থাকবো আমি তোমার সঙ্গে, ভিতরে নিয়ে গেলে কিন্তু আমি আর বাঁচবো না'। যে ছেলে সর্বক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতো, কিছুই হজম করতে পারতো না, সে রোজ প্রাতঃস্নান করে, নিরামিষ খায়; আর সব সময় চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু…কদিন কী যে দেখলুম, কোন্ দিব্যধামে থাকতুম

···কিন্তু ওর মা শুনলেন না ; যে দিন ভিতরে নিয়ে গেলেন সেদিনই চেহারা বদলে গেলো ; পাণ্ডুর, বিবর্ণ ; পরের দিন মারা গেলো ···

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যারতির পর ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমে একজন বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে আলাপ হয় ; প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ; গোঁফ-দাড়ি, চেহারা-পত্র অনেকটা গোসাঁইজীর মতো ; বেশ ভক্তিমান্ পুরুষ ; সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছিলেন একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসংগমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥১

সংসারপথে বিচরণশীল মানবের যখন সংসার শেষপ্রায়, তখনই সাধুসঙ্গ লাভ হয়, এবং সাধুদের পরমগতি ও কার্যকারণের নিয়ন্তা শ্রীভগবানে অনুরাগ জন্মে। দু-চার কথার পর জানা গেলো ক্ষেপুর এক কাকীমা বাবাজীর শিষ্যা ; অতঃপর ভাব জমতে আর দেরি হলো না। ক্ষেপু জিজ্ঞেস করে : কুম্ভমেলায় ভারতের সব সাধু মহাত্মা-ই কি স্নান করতে আসেন? বাবাজী উত্তর করেন—

: সব আর কি ক'রে আসবেন? তবে অনেকেই আসেন ; আর খুব বড় মহাত্মা যাঁরা তাঁরা আকাশমার্গে এসে শেষরাত্রিতে স্নান করেন, আবার আকাশমার্গেই চলে যান।

: তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না?

: অনেক পুণ্যের ফলে ; কিন্তু তার আগে প্রয়োজন তাঁদের কৃপাদৃষ্টি।

: কি করে তা সম্ভব হয়?

: রাত্রি তিনটার সময় রোজ গঙ্গাস্নান করে আবক্ষ নিমজ্জমান হয়ে ভগবানের নাম জপ করতে হয়।

: যদি নিমুনিয়ায় ধরে?

: ধরবেই তো। শনৈঃ পন্থাঃ। প্রথমে তিতিক্ষা অভ্যাস করতে হয়।

: আচ্ছা, আকাশগামী এই মহাত্মাদের তো বস্তুলাভ হয়েই গেছে, তাঁরা স্নান করতে আসেন কেন?

: তাঁরা আসেন ভারতের কল্যাণের জন্য, স্নানার্থী যাত্রীদের অমৃতলাভের রাস্তা

(১) ভাগবত ১০—৫১—৫৫

সুগম করবার জন্য ; স্নান করে যখন তাঁরা ফেরেন তখন তাঁদের দিব্যভাবে দশদিক বিদ্যুৎ-ছটায় জ্বলে ওঠে।

: তা হলে তো কুম্ভস্নানে যে সব যাত্রী এসেছেন সকলেরই অমৃতলাভ হবে ?

: নিশ্চয় হবে।

: অপরাধ নেবেন না, গঙ্গাতে যে সব মাছ আছে তাদেরও কি—?

: আরে তা কি আর হয় ? ভক্তিবিশ্বাস থাকা চাই, ভগবৎ-কৃপার জন্য ব্যাকুলতা চাই, শ্রীহরির পায়ে নিজেকে সমর্পণ করা চাই ; আর চাই গুরুকৃপা। কি জানেন ? অমৃতলাভ দেবতাদের হয়, দৈত্য-দানবের হয় না।

: কিন্তু যাদের এখনও গুরুলাভ হয় নি ?

: তাদেরও হবে। প্রথমে সদ্গুরু লাভ, তারপর গুরুদত্ত মন্ত্রের সাধন, শেষে গুরুকৃপায় অমৃতলাভ। কুম্ভস্নানের ফল অব্যর্থ। ভারতের অশেষ সৌভাগ্য যে পতিতপাবনী গঙ্গা আমাদের সকল পাপ বিধৌত করে মোক্ষের পথে নিয়ে যাচ্ছে ; জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে আপনারা কুম্ভযোগে মুক্তিদায়িনী গঙ্গায় স্নান করতে এসেছেন, ভক্তিভরে স্নান করুন, নিশ্চয় অমৃতলাভ হবে।

বাবাজী বিদায় নেন ; ধ্বনি ওঠে, গঙ্গা মাঈ কী জয়......আশ্রমের আর এক প্রান্ত ; কিসের জটলা চলছে। গোঁফ-দাড়ি-সুশোভিত এক ভদ্রলোকের চারদিকে গৃহী এবং সন্ন্যাসী ; কিসের আলোচনায় সকলে মশগুল। সন্ধান নিয়ে জানলুম ইনিই শ্যামসুন্দর বাবু,—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অক্লান্ত একনিষ্ঠ সাধক । জনৈক গৃহী প্রশ্ন করেন—

: ভারতের স্বাধীনতা কবে হবে ?

শ্যামসুন্দরবাবু উত্তর করেন—

: কতো সাধু সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করেছি, কোনো উত্তরেই আশ্বস্ত হতে পারি না।

: কেন ?

: অনেকেই বলেন, জানিনা ; ভাল সাধুর কথাই বলছি ; ভগবচ্চিন্তায় তাঁরা মগ্ন, দেশের কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে উদাসীন। কেউ কেউ বলেন, রামজীর যখন কৃপা হবে।

: কখন হবে কৃপা ?

: ফ্যাসাদ তো ওখানেই। এই মৌলিক প্রশ্নটার জবাব কেউ দেন না ; বলেন, ভগবানকে ডাকুন, ডাকার মতো ডাকতে পারলে তিনি নিশ্চয় শুনবেন, জবাবও

দেবেন। আমি চাই সাধুজীর কাছ থেকে জবাব, সাধুজী বলেন ভগবানের কাছে যেতে। কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করে সাধুরা উত্তর দেন না কেন বুঝি না।

ঃ সাধুদের হয় তো ওটা প্রশ্ন নয়, বলেন একজন সন্ন্যাসী।

ঃ হয়তো, উত্তর করেন শ্যামসুন্দরবাবু। একটু ভেবে আবার বলেন,

ঃ বুঝি না ; প্রাচীনপন্থী মহাত্মারা সকলেই এক কথা বলেন, মানে কিছুই বলেন না। শুধু সন্তদাস বাবাজীর উত্তরে একটু আশার আলো দেখতে পাই।

উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলে প্রশ্ন করেন, ‘কী বললেন তিনি ?’

শ্যামসুন্দরবাবু সাগ্রহে সন্তদাস বাবাজীর আশ্বাসবাণী শোনান—

ঃ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে যখন পৃথিবী দগ্ধ হয়ে যায় তখন হঠাৎ একদিন আকাশে একটু মেঘ দেখা দেয় ঃ পরদিনই আগুনের লেলিহান জিহ্বা তাকে গ্রাস করে ফেলে ; কিন্তু আবার আসে ; ঐ ছিন্নাভ্রটুকুই একদিন ঘনঘটা করে আকাশ ছেয়ে ফেলে, এবং দগ্ধ, তপ্ত ভারতভূমিকে জলসিক্ত করে...অথবা বসন্তসমাগমের কথা ভাবুন ; সূচনা আগে থেকেই পাওয়া যায় একটি কি দুটি পাখীর গানে, দু-চারটি ফুলের গন্ধে, তৃণ ও পত্রের শ্যামলতায়...ভগবানের নাম নিয়ে এগিয়ে যান···ঐ দেখুন বসন্ত আসছে···ঐ শুনুন তার চরণধ্বনি···এগিয়ে যান···এগিয়ে যান...

এই বলে শ্যামসুন্দরবাবু কাঁদতে লাগলেন ; উপস্থিত সকলেই বোধ হয় সেই কান্নায় যোগ দিয়েছিলেন।

॥ ৯ ॥

রাত্রি প্রায় এগারোটা ; ঘুম আসছে না। অন্ধ কুঠরীতে দম আটকে আসে··· মুক্তিপথের যাত্রী ভারত, বন্ধন হয় কেন তার ? আবহমানকাল থেকে আমরা মোক্ষকামী ; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহারের ঘটনাচক্রে মুক্তি আমরা খুঁজি না কেন ? পরগাছা, মশামাছি, ছারপোকা, আরসোলা মাকড়সা, বিছে-শুঁয়োপোকা, সাপ-বাঘ ঘরে ও বাইরে সর্বত্র কায়েমী স্বত্বে বাসা ফেঁদে বসেছে ; ব্যবহারিক জীবনে আমরা মুমুক্ষু হই না কেন ? কোনো কালেই হই নি ; ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আমাদের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। অথচ মুমুক্ষুত্ব আমাদের মজ্জাগত ধর্ম ; স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসার সব ছেড়ে

দিয়ে 'ইহাসনে শুষ্যতু'র[১] প্রতিজ্ঞা নিয়ে হিমালয়ের নিভৃত গুহাতে পরব্রহ্মের ধ্যানে বসি, বল্মীকে সর্বশরীর আবৃত হলেও রাম নাম জপ করে চলি। অদ্ভুত তপস্যা, অপূর্ব নিষ্ঠা ও ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—সাধবঃ অসাধ্যসাধনশীলাঃ। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট হয়েও আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকের গোচর-ভূমিতে ভেড়ার পাল, শুধু ঘাস খাচ্ছি! 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলেই কি কপালে ছিল যুগের পর যুগ যবনের দাসত্ব করা? এই ভারতের মহামানবের (?) অন্ধগারদের আর্তনাদ কি ভগবান্ শোনেন না?···নির্বলকে বল রাম···হয়তো একদিন বুঝিয়ে তিনি দেবেন, আর মুক্তি দেবেন বৃশ্চিকদংশন থেকে···

নাথ তূ অনাথকো, অনাথ কৌন মোসো?
মো সমান আরত নহিঁ, আরতিহর তোসো॥

নির্বলকে বল রাম—বল রাম, বল রাম, বল রাম, বল রাম—নির্বলকে বল রাম···

॥ ১০ ॥

অরুণালোকে হরিদ্বার আজ অপরূপ! গঙ্গার নীল খরস্রোত, তার গায়ে ছোট্ট সহরটি, পিছনে পাহাড়, পাহাড়ের শীর্ষদেশে মন্দির; দূরের আকাশে হিমালয়ের মসীরেখা, আরও দূরে হিমকান্তির ছটা; নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত চিত্র! তাই কি নাম মায়াপুরী? মহাপ্রস্থানের স্মৃতিজড়িত হরিদ্বার 'মায়াপুরী' নয়; মায়া এখানে কাটে, বাঁধে না; আমাদের নিত্যিকার মায়াপুরী এখানে অদৃশ্য, ঝলকে ওঠে তার জায়গায় অবোধপূর্ব দিব্যধাম···পাহাড়ের উপর উঠছি; তাল রেখে চলা সম্ভব নয়···ক্ষেপু এগিয়ে গেছে, দয়ালদা পিছনে; মাঝে মাঝে দাঁড়াই···অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি···নয়নাভিরাম রূপ ··অমৃত আজি পড়িছে ঝরিয়া,

নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্ত;
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

······দার্জিলিং-ও হিমালয়, কিন্তু হরিদ্বারের সঙ্গে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দার্জিলিং-এর সহর যেন রূপসী, নৃত্যশীলা নটী, গিরিমালার যে পরিবেশে এই নৃত্যচাতুর্যের প্রদর্শনী হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের আদিম যুগের সম্বন্ধ···উত্তুঙ্গ-

(১) তপশ্চর্যায় এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বোধিতরুমূলে সমাসীন হয়েছিলেন বুদ্ধদেব—
ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়ম্ অতশ্চলিষ্যতি॥

শীর্ষ পর্বতমালা···একটার কাঁধে আর পাঁচটা দাঁড়িয়ে আছে অসহ্য চাপ দিয়ে ···দম বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি···পাহাড়ের গুরুভারে জীবন যেন ক্ষুব্ধ, দলিত, পিষ্ট···মেঘের কোলে মেঘ অবিরাম আসে, যায়···মেঘসমুদ্র কখনও উপরে, কখনও নীচে···যাদুকরের অঙ্গুলিহেলনে রোদ ও বৃষ্টির আবির্ভাব, তিরোভাব···ধরিত্রীর জন্মদিনের উৎসব ; মাটি, জল, গিরি, বন, নদী, সাগর—কখন কোন্‌টা উৎক্ষিপ্ত হবে বলা যায় না······চঞ্চলা পটভূমি ; পরিপ্রেক্ষিত সদা পরিবর্তনশীল। আদিম দিনের এই জগতের জীবন অস্থির, প্রাণ অশান্ত, মন প্রমত্ত, মানুষ যুযুধান সৈনিকের মতো মোহান্ধ, মদমত্ত···মুনিকুলসেবিত হরিদ্বার সম্পূর্ণ আলাদা···পরিবেশ শান্ত, স্নিগ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল, হরিধামের দ্বারপাল, যাত্রীর তীর্থাবাস, যোগীদের তপোভূমি ; শুভ্র, শুদ্ধ, দীপ্ত···হরিধামের প্রবেশদ্বার এমনি মহিমান্বিত না হলে মায়াপুরীর মায়া হয় তো কাটানো সম্ভব হতো না···ধুলোমাটির জগৎ বহুদূরে ফেলে এসেছি···রবিকরে উদ্ভাসিত হয় অর্চিমার্গের সেতু···আকাশ বাতাস শুচিতায় ভাস্বর···মন্দিরের চূড়া!······ স্তব্ধ হয়ে বসি···ঢং, ঢং, ঢং বাজে মন্দিরের ঘণ্টা···ধ্বনির পর ধ্বনি··· অবিরাম ঢং ঢং ঢং···ওঁকারের মহামন্ত্রে অর্চিলোক ঝংকৃত···বিশ্বলোকের আজ প্রণবমন্ত্রে দীক্ষা···হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ···মর্মর ধ্বনি জাগে, 'পল্লবে পল্লবে, হিল্লোলে হিল্লোলে'···বাজে হিয়া নামমহামন্ত্রে হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ··· হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ······

॥ ১১ ॥

এক ঘুমের পর জেগে দেখি, ক্ষেপু বিছানায় নেই ; রাত্রি চারটা ; দয়ালদা বসে জপ করছেন বোধ হয়···হরিদ্বার নিস্তব্ধ ; কানে আসে শুধু গঙ্গার কুলু কুলু নাদ···যাত্রী আমি, কিন্তু আছি ঘুমিয়ে। চলে গঙ্গা ; বিষ্ণুর পাদ প্রক্ষালন করে অহরহঃ চলে প্রেমধারার চিরন্তন ছন্দে···দিন নেই, রাত্রি নেই, অবিরাম ডাক দিয়ে যায়—হে যাত্রী, চলো ; আমি যে নিশিদিন চলছি বৈকুণ্ঠের বার্তা নিয়ে···চন্দ্র চলে, তারা চলে, চলে ভূর্ভুবঃ স্বঃ···হে যাত্রী জাগো, প্রেম সমুদ্রে অবগাহন করবে, চলো···কান পেতে শোনো আমার গতিচ্ছন্দে অহর্নিশ ধ্বনিত হচ্ছে হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, আমার কুলুকুলুনাদে মন্দ্রিত হচ্ছে বিশ্বহিয়ার প্রেমস্পন্দন! আমি যে অবিরাম তোমায় ডাকছি, হে যাত্রী, চলো!···ব্যোমসমুদ্রে দেবযানে চলে ইন্দ্র, অর্যমা, মরীচি, অষ্টাবসু, মিত্রাবরুণৌ

—ঋতস্য রশ্মিম্ অনুযচ্ছমানাঃ ; আকাশে চলে পিতৃগণ ; বসুধার বুকে চলে প্রেমার্থী বিশ্বজন ; যুগের পিছনে চলে যুগ, আর চলে বক্ষে মোর প্রেম-মহামন্ত্র হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ ··হে যাত্রী, চলো ! দেবা ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি ; ঐ দেখো কালপুরুষ চলছে তন্দ্রাহীন জ্যোতিষ্মত্তায়...বর্তিকা হস্তে চলেছে বুদ্ধ—শঙ্কর—নানক—চৈতন্য···চলে দিন, চলে রাত্রি···চলে মাস, চলে ঋতু-সংবৎসর...চলে নদী, চলে পর্বত, চলে তৃণ, কীট, পতঙ্গ, বিহঙ্গ···ঐ দেখো দিগন্তপ্রসারিত মহাজনসেবিত তমসস্ পরি জ্যোতিরুত্তমম্ ; হে যাত্রী, জাগো, বলো 'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্', প্রার্থনা করো, 'হে অগ্নি ! নিয়ে চলো জ্যোতিরুত্তমের পথে কল্যাণের নিত্যবরষণে···হে যাত্রী ! প্রেমমন্ত্রের অজপা গেয়ে তোমায় ডেকে চলেছি আমি ; বলো, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ···হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ······

দয়ালদা গান ধরেন,

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে ॥
কঠিনে মিশে না সে, মেশে রে সে তরল হলে ॥
অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মত,
কলনাদে অবিরত, জয় জগদীশ বলে ॥
প্রেমের ঠাকুর ডাকে তোরে, পেছন পানে তাকাস না রে,
ভেসে যা, ভাসিয়ে নে যা (সেই) পারাবার সিন্ধু জলে ॥

রাস্তা দিয়ে কে গেয়ে যায়—

সোই রসনা জো হরিগুণ গাবৈ।
নৈননকী ছবি যহৈ চতুরতা, জ্যোঁ মকরন্দ মুকুন্দহি ধ্যাবৈ ॥
নির্মল চিত তৌ সোঈ সাঁচো, কৃষ্ণ ৰিনা জিয় ঔর ন ভাবৈ ॥
শ্রবননকী জু যহৈ অধিকাঈ, সুনি হরিকথা সুধারস প্যাবৈ ॥
সূরদাস জৈয়ে ৰলি তাকে, জো হরিজূ সোঁ প্রীতি ৰঢ়াবৈ ॥

······কাঁপতে কাঁপতে ক্ষেপু মহারাজ ঘরে ঢুকলো ; গঙ্গাস্নান সেরে এসেছে। শেষরাত্রে ব্রহ্মকুণ্ডে আবক্ষ নিমজ্জমান হয়ে আকাশচর মহাত্মাদের দর্শনে গিয়েছিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে বলে, 'পারলুম না আর থাকতে, একটা ডুব দিয়েই—' তখনও দাঁতে দাঁত ঠক্ঠক্ করছে ; তাড়াতাড়ি স্টোভ্-এ চা করে দিলুম ; দু পেয়ালা খেয়ে বলে, 'পরে খাবো আর এক পেয়ালা। অনেকেই গঙ্গামাঈর নাম নিয়ে ডুব দিচ্ছে দেখে ভাবলুম, আমিই বা পারবো না

কেন! কিন্তু নেবেছি কি—ওরে বাবা! কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! প্রথমটায় দেখি কোমর পর্যন্ত কেটে গেছে; ডুব দিয়ে মনে হলো আমি আর নেই; দৌড়ে না এলে মরেই যেতুম।' দয়ালদা ধমক দেন, 'হিতাহিত জ্ঞান তোমার কোনো কালেই হবে না, ক্ষ্যাপা-ই থেকে গেলে চিরটা কাল।' আমি শুধাই—

ঃ খেচর কোনও মহাত্মার দর্শন হলো?

ঃ একটা উল্কার মতো কী যেন—

ঃ সে তো রেলগাড়ীর টর্চ লাইট।

ঃ তুক্‌তাকে তোমার এতো শ্রদ্ধা কেন?—জিজ্ঞেস করেন দয়ালদা।

ঃ তুক্‌তাক্ কোথায় দেখলে?

ঃ আকাশগামী মহাত্মা তোমার কী করবেন? ঈশ্বর পাইয়ে দেবেন? লাগ্—লাগ্ বলে—

ঃ না, তা নয়; তবে তাঁদের কৃপাদৃষ্টিতে—

ঃ কৃপা ভিক্ষা করতে হয় ঈশ্বরের নিকট; তিনি অন্তর্যামী,—

পূজা তো পুরুত দিয়েই করতে হয়?

ঃ ভক্তি যেখানে কাম্য, পুরুত সেখানে অন্তরায়; তুক্-তাক্ মুখ্য হয়ে পড়ে, আর ঈশ্বর হন গৌণ। আসল কথা কি জান? ও আমার ভাল লাগে না। ভগবান্ আমাদের পরমাত্মীয়, চাপরাশী দিয়ে তাঁর কাছে দরখাস্ত পাঠাবো কেন? পরমাত্মাকে দেখতে চাই মুখোমুখি; আমাদের দুজনার মাঝখানে আবার বাজে লোক কেন? বাজে লোক আড়াল করে থাকলে ভাব-ই বা জমবে কেন?

ঃ মহাত্মারা কি বাজে লোক?

ঃ প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকের মাঝে এতোটুকুও ব্যবধান যে সৃষ্টি করে সে অবাঞ্ছিত; সুতরাং বাজে। একটি গান আছে—

মা-ছেলেতে কথা হয়,
পড়শী কেন তাতে রয়?

আমার গুরুদেব বলতেন, ভক্তের তিন অবস্থা। প্রথমে তিনি আমার; তারপর আমি তাঁর; শেষে আমিই তিনি। বুঝলে ক্ষেপু? তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই। ভগবানে আমরা যখন বিশ্বাস হারাই তখনই মাদুলীজাতীয় অবস্তুতে শ্রদ্ধা বাড়ে। দুর্বলতা আছে মানুষের, কিন্তু তার ওষুধ মাদুলী নয়।

ঃ কী তার ওষুধ?—জিজ্ঞেস করি আমি।

দয়ালদা উত্তর দেন—

মত কর মোহ তু, হরিভজনকো মান রে।
নয়ন দিয়ে দরশন করনে কো, শ্রবন দিয়ে সুন জ্ঞান রে ॥

ঃ রবিবাবুর একটা গান হক না, বাংলা গান,—বলে ক্ষেপু। দয়ালদা উত্তর দেন, জমবে না এখন। আমি প্রশ্ন করি, কেন? দয়ালদা জবাব দেন, কথা বেশী; বিষয়বস্তু ভগবানের ঐশ্বর্য, ভগবান্ নন; আর আসল জিনিসেরই অভাব—না আছে ভক্তের দীনতা, না আছে ভগবানের নাম। নামই অমৃত। বরং এসো, তিনজনে কীর্তন করি—

কেশব! কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনমোহন, মোহন মুরলীধারী ॥
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,
গোবর্ধনধারণ বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাস রসবিহারী
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, মন আমার।

বাড়ীর মালিক, ক্ষেপুর বন্ধু, ঘরে এসে বসলেন; আমাদের কুশল প্রশ্ন করেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই···তিনি বিনয় প্রকাশ করেন; অতঃপর দয়ালদাকে অনুরোধ করেন, নাম হক একটু···

হরি বল, হরি বল, হরি বল, ভাইরে।
হরিনাম তরী বিনে অন্যগতি নাইরে ॥
অপবিত্র, পবিত্র বা, যে ভাবে যে থাক,
হৃদয় খুলে বাহু মেলে হরি বলে ডাক।
আছে যতো পাপরাশি নামতরঙ্গে যাবে ভাসি।
(ও তোর) মায়া ফাঁসি যাবে রে খসি ॥
উদয় হবে জ্ঞানরাশি, অন্ধকার যাবে দূরে।
হরেকৃষ্ণ নারায়ণ মধুকৈটভারে,
মাধবমধুসূদন মুকুন্দ মুরারে।
গোপাল গোবিন্দ নাম, কেশবকরুণাধাম,
ঐ নাম জপ, জপ, জপ অবিরাম রে ॥

॥ ১২ ॥

আজকে ঘুরেছি অনেক—সপ্তধারা, ভী: ,বাড়া, কালভৈরব, বিল্বকেশ্বর, দক্ষঘাট, সতীঘাট, কনখল, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, এবং পথে আরও যতো পুণ্যস্থান। সপ্তধারায় রাজা পরীক্ষিৎকে শুকদেব ভাগবত শুনিয়েছিলেন, এবং পরীক্ষিৎ এখানেই নাকি দেহরক্ষা করেছিলেন। ভীমঘোড়া মহাপ্রস্থানের পথে—ভীমের স্মৃতিজড়িত; বিল্বকেশ্বরের একটি গুহায় তপস্যারত ভোলাগিরি মহারাজ সিদ্ধিলাভ করেন। দক্ষঘাট, সতীঘাট, দক্ষযজ্ঞের লীলাভূমি। গঙ্গার ত্রিধারার সঙ্গমস্থল কনখল, এখানে স্নান করলে অশেষ পাতক নাশ হয়···চরকির মতো ঘুরি, একটা নেশা যেন···অসংখ্য যাত্রী·· সকলেই চলছে···wanderlust ? এককালে মানুষ ভবঘুরে ছিল, সেই পুরনো সংস্কারের বশে নাকি আমরা ঘুরে বেড়াই। ন্যায়ের ফাঁকি আছে। ভবঘুরে নোমাড (nomad) যখন আমরা ছিলুম তখন দৈনন্দিন খোরাকের জন্য বাধ্য হয়ে ঘুরতে হতো; কাজেই সংস্কারটা ক্লেশাত্মক হওয়া উচিত; সুখধর্মী হয় কেন? আর যদি আনন্দের জন্যই পর্যটন করতুম তবে বৃত্তিটা মানব চিত্তের সহজ সংস্কারে এসে দাঁড়ায়—যে সংস্কারের বশে 'নোমাড' তার আদিম মন নিয়ে যাযাবরত্ব উপভোগ করতো, যেমন আমরা করে থাকি আমাদের আধুনিক মন নিয়ে। দার্শনিকরা যাকে জগৎ-নিত্যত্ব বলেন তাতে আছে গতির অবিরাম ছন্দ, জানাকে ছেড়ে অজানাকে খোঁজার নন্দনযাত্রা। সহস্র বন্ধনমাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ? সে আমার নয়। জানি, ছোটখাট হাসিকান্নার রঙিন ডোরগুলো আমরা ভালবাসি, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখনীড় রচনা করি; দুঃখ আসে, দৈন্য আসে, রোগ-শোক-তাপ আসে; তখন বন্ধনসুখের প্রলেপ লাগিয়ে ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু মুক্তির আস্বাদ কোথায় এখানে? বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে নয় আমার! বুঝি না। কবিতার দিক থেকেও নয়, দর্শনের দিক থেকেও নয়। কবিতার দিক থেকে নয়, কারণ মানুষের সহজ সংস্কারের নির্দেশ কবি নিজেই দিয়েছেন—

আগে চল্, আগে চল্, ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে, কিবা ফল, ভাই॥

দর্শনের দিক থেকেও নয়, কারণ জীবের স্বভাবে মুক্তির ইচ্ছা না থাকলে সে আসে কোথা থেকে? জগৎ যদি নিত্য চলে, আমার সাধ্য কি চুপ করে বসে থাকি? ···চল মুসাফির বাঁধকে গঠরী, বহুত দূর জানা হোগা···চলাই ভাল; আবর্জনা

বাড়িয়ে লাভ কি? যতো বোঝা, চলার পথে ততো কষ্ট···কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। ইচ্ছা হয়, দিই সব বোঝা ফেলে···সামনে যখন যাবি ওরে যাক না পিছন পিছে পড়ে···অনর্থক হয়রানি···ক্ষুন্নিবৃত্তি তো দু-মুঠো ভিক্ষেতেই হয়···লেঠা সব চুকে যায় পথকে যদি ঘর করা যায়···তরোর্মূলং কেবলমাশ্রয়ন্তঃ। গাছ-তলার এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে···আমাদের গাঁয়ে শ্মশানের ধারে একটি বটগাছ আছে, কতো দুপুর কাটিয়েছি ওর ঘন শীতল ছায়ায়, চুপ করে ঘুঘুর ডাক শুনেছি···ঘুঘুর ডাকে বেশ নিঃসঙ্গ উদাস ভাব; সুরটি বৈরাগ্য-গম্ভীর, যেন ভৈরোঁ রাগিণীর মর্মকথাটি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়···নির্জন মাঠ, চার দিক রোদে খাঁ খাঁ করে, এক পাশে একটি খাল, মাঝখানে বটগাছের ঝাঁকড়া মাথা, তার ওপর ভৈরবঠাকুর সুর ভাঁজেন ঘর-ছাড়ানো উদাস তানে···

কনখলের চকবাজারে তিনজনে তিন গ্লাস ফেনায়িত দুধ খেতে বসেছি; দোকানী দুটো গেলাস নিয়ে দুধটা ঢালা-উপুড় করছে···কৌপীনধারী একজন সাধু এসে ভজন ধরলেন—

> ৰীত গয়ে দিন ভজন ৰিনা রে!
> ৰাল অবস্থা খেল গঁবায়ো, জৰ জবানি তব মান ঘনা রে॥
> লাহে কারণ মুল গঁবায়ো অজহুঁন গই মনকী তৃসনা রে।
> কহত কৰীর সুনো ভাঈ সাধো, পার উতর গয়ে সন্ত জনা রে॥
> পার উতর গয়ে সন্ত জনা রে, পার উতর গয়ে সন্ত জনা রে॥

উৎসাহ পেয়ে মীরা বাঈর পদ ধরেন—

> চালো মন গঙ্গা-জমুনা-তীর॥
> গঙ্গা-জমুনা নিরমল পাণী সীতল হোত সরীর।
> ৰংসী ৰজাবত গাবত কান্হো সঙ্গ লিয়োঁ ৰল ৰীর॥
> মোর মুগট পীতাম্ৰর সোহৈ কুণ্ডল ঝলকত হীর।
> মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর চরণকঁবলপর সীর॥

সাধুজীর উপার্জন মন্দ হলো না; সাধু হয় তো নন; ভিখিরী; কিন্তু বেশ জীবন···শঙ্করাচার্যের কৌপীনপঞ্চকের কথা মনকে উদাস করে···বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ, অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, মূলং তরোঃ কেবল-মাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ, অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ···কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ···বেদান্তবাক্যে রতি, ভিক্ষান্নে তুষ্টি, শোকহীন চিত্তে ভ্রমণ, পাণিদ্বয়

আহারপাত্র, তরুমূল সুখশয্যা, দিবানিশি ব্রহ্মানন্দে মগন…কৌপীনসম্বল এঁরাই ধন্য…বৈরাগ্যরসের অমৃতনির্ঝরিণী, যা পান করে

পার উতর গয়ে সন্ত জনা রে।

॥ ১৩ ॥

: ওহে দেবলচন্দ্র! দেবু! দেবু! কত ঘুমুচ্ছিস্? চারটে বাজে; চল্, সাধুদর্শন করে আসি; বলে ক্ষেপু।

: দয়ালদা কোথায়?—জিজ্ঞেস করি আমি।

: ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমে গিয়েছেন, ভাগবত হবে।

: তুই যা; ঘুমের ঘোর আমার কাটে নি, আরও একটু চোখ বুজে থাকি।

: ঘুমুবি তো হরিদ্বার এলি কেন?

: শ্রীহরি টেনে এনেছেন।

: যাবি না?

: না। শ্রীহরির ইচ্ছা নয়। তুই যা।

…সন্ধ্যা নাগাদ ব্রহ্মকুণ্ডে এসে পৌঁছই। দিনে একবার অন্ততঃ ব্রহ্মকুণ্ডে না এলে মনটা খুঁত খুঁত করে; সবারই। একবার সকলেই আসেন; অনেকেই দুবার—দুপুরে স্নান করতে, বিকেলে বেড়াতে। চানটা সেরেছি আজ কনখলে, কাজেই এবেলা বেড়াতে আসতেই হয়। এখানকার দৃশ্যে বৈচিত্র্য নেই, আছে চিরনবীনতা …রোজ আটার ঢেলা নিয়ে বসে সব, আবালবৃদ্ধবনিতা; রোজ ঢেলা থেকে বড়ি বানিয়ে জলে ফেলে, মাছগুলো কিল্‌বিল্ করে এসে খায়…সবাই যেন শিশু হয়ে যাই, মাছের হুল্লোড় দেখে উল্লাসে আত্মহারা হই; চোখেমুখে হাসি, চিত্ত উচ্ছল…গঙ্গা মাঈর ছেলেমেয়েদের নিত্যলীলা—চিরপুরাতন, চিরনবীন… গল্‌স্‌ওয়ার্দীর (Galsworthy)একটি গল্প আছে—আল্‌টিমা থুলে (Ultima Thule); দুটি চরিত্র, টম্‌সন্ ও জ্যাক্‌সন্। দুনিয়াদারির লড়াইতে টম্‌সন্ সম্পূর্ণ পরাজিত, জ্যাক্‌সন্ পুরোপুরি সফলকাম; টম্‌সনের কাপড় চোপড় ধূলি-ধূসর ও শতচ্ছিন্ন, জ্যাক্‌সন ফুটফুটে ফুলবাবু; টম্‌সনের দীপ্তি শুধু তার চোখে, জ্যাক্‌সনের দীপ্তি চোখ ছাড়া আর সব জায়গায়; টম্‌সন্ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, পাখীর গান শোনে, ছোটদের নিয়ে ঝোপে ঝোপে ফুল দেখে বেড়ায়, পুকুরধারে উপুড় হয়ে শোয়, মাছের খেলা দেখে চেঁচিয়ে ওঠে; আকাশ, বাতাস, ঘাসফুল, সূর্যের আলো, ছন্নছাড়া বিড়ালছানা, বাত্যাহত রবিন পাখী—সব কিছুই

টম্‌সনের চোখে অপার্থিব আলোতে উজ্জ্বল, বিস্ময়কর, নয়নভোলানো। জ্যাক্‌সনের দৃষ্টিতে এসব বাজে, অর্থহীন, তুচ্ছ ; সার্থক শুধু পাউণ্ড-শিলিং-পেনস্, যা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়,…ব্রহ্মকুণ্ডের চত্তরে চিরন্তন শিশুদের গোষ্ঠলীলা দেখে আমাদের মনের জ্যাক্‌সনগুলো যেন টম্‌সনে রূপান্তরিত হয়, মর্ত্যধাম থেকে হঠাৎ দিব্যধামে এসে পৌছই, বৈকুণ্ঠবাসী টম্‌সনের হাত ধরে নিত্যলীলায় যোগ দিই, অজ্ঞাতসারে সুর মিলিয়ে বলি everything is wonderful…বাসায় এসে দেখি ক্ষেপু ফিরেছে ; দয়ালদা ফেরেন নি ; রাত সাড়ে আটটা ; ভাগবতকথা হয় তো এখনও চলছে, ক্ষেপুর চোখ উজ্জ্বল, ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়েছিল নিশ্চয়। বলি,

ঃ সাধুদর্শন কিরূপ হলো ?

ঃ ঠকে গিয়েছিস।

ঃ কেন ?

ঃ খুব বড় এক মহাত্মা দেখে এলুম, ভাবছি ওঁর কাছে মন্ত্র নিই ; কিন্তু কৃপা করবেন কিনা সন্দেহ।

ঃ সন্দেহের কারণ ?

ঃ অতো বড় মহাত্মা ! আমাদের দিকে কি আর দৃষ্টি দেবেন ?

ঃ খুব বড় মহাত্মা বুঝি ?

ঃ অনেক পুণ্যের ফলে এরূপ মহাত্মার দর্শনলাভ হয়। গায়ের কী রং, যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ; আজানুলম্বিত বাহু ; সুঠাম, সুন্দর দেহ—

ঃ এই জন্য মহাত্মা ?

ঃ অস্থির হচ্ছিস্ কেন ? দেখলুম কাত হয়ে গঙ্গাতটে বালুশয্যায় শুয়ে আছেন ; এক হাতে মালা চলছে ; নির্বাক্, ধ্যানস্থ ; আনন্দে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত।

ঃ বড় মহাত্মা বলেই তো মনে হচ্ছে। কালকে দয়ালদাকে নিয়ে দেখে এলে হয়।

ঃ আমিও তা ভেবেছি ; কিন্তু কালকেই কুম্ভস্নান, দেখা পেলে হয় ! ভোরের দিকে একবার খোঁজ নিয়ে আসবো'খন।

ঃ আর কোনও মহাত্মার দর্শন পেলি ?

ঃ দর্শন না, হদীস পেয়েছি। ইনি আরও উঁচু থাকের ; লোকালয়ে আসেন না, লছমনঝোলা থেকে ১০৷১২ দিন পাহাড় ভেঙ্গে গেলে তাঁর গুম্ফা দেখা যায় ; রাস্তা নেই, যাওয়া খুবই কঠিন। আজ বিশ বছর ঐ গুম্ফার ভেতর আছেন, সদা ধ্যানমগ্ন, চোখ খোলেন না।

ঃ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ?

ঃ তুই একটি আহাম্মক ! এসব মহাপুরুষের কি আর ডাল-রুটির ভাবনা ভাবতে হয় ?

ঃ বুঝেছি ; শিষ্যরা ব্যবস্থা করেন।

ঃ ছাই বুঝেছিস্। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব তোর মাথায় ঢুকবে না। এতো বড় মহাত্মা, চোখ পর্যন্ত খোলেন না, তাঁর আবার শিষ্য কি রে ? তিনি কি আর আমাদের জগতে থাকেন ?

ঃ কোথায় থাকেন তা হলে ?

ঃ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে আকাশ মার্গে বিচরণ করেন, দেহটা শুধু পড়ে থাকে গুম্ফার ভেতর।

ঃ তা হলে তো গিয়ে কোনো লাভই নেই ?

ঃ তুই ঘরে ফিরে যা।

ঃ তা না হয় যাচ্ছি ; কিন্তু দেহাঁপগুটা কি মন্ত্র দেবে তোকে ?

ঃ তুই ভাবছিস্, দেহটাকেই দেখা যায় ? তোর বুদ্ধির বলিহার যাই ! গুম্ফার মুখে বিরাট এক পাথর ; তোর মতো বিশ-পঁচিশটা লোক তাকে এক চুলও হটাতে পারবে না।

তবে তো যাওয়া একেবারেই নিষ্ফল ?

এতো সহজেই দমে যাস্ তুই ?

তুই তো দমিস্ নি ? শুনি, কি করবি তুই ? মন্ত্র দিয়ে—

ঠিক ধরেছিস্। গুম্ফার সুমুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ বার জপ করতে হবে—

Open Sesame ?

বিপদ ডেকে আনবি। যাবনিক ভাষা প্রয়োগ করেছ কি মরেছ।

মন্ত্রটি তা হলে দেবভাষায় ?

নিশ্চয়। ওঁ শম্ভো হুংফট্। মহাত্মাজী তুষ্ট হলে পাথর নিজে থেকেই সরে যায়, আর ভিতর থেকে বজ্রনিনাদে প্রশ্ন হয়—কস্ত্বং কুত আগতঃ ?

ঃ উত্তর তো সংস্কৃততেই দিতে হবে ?

দয়ালদা এসে ঢুকলেন। ক্ষেপু একদম চুপ। বুঝলুম, কস্ত্বং-বাবা সম্বন্ধে আর তথ্য আদায় করা যাবে না।···শয়নে পদ্মনাভকে পেতে ক্ষেপুর কোনো কালেই দেরি হয় না ; যখন খুশি, যেখানে খুশি, যে ভাবে খুশি, ঘুমিয়ে পড়া তিন তুড়ির ব্যাপার মাত্র ; তারপর অঘোরে নিদ্রা। আজকে হয়তো স্বপ্ন দেখছে

গুহাশায়ী মহাত্মাজীর আকাশবিহার···পরমহংসদেব বলেন, শিশুর মতো সরল বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বরলাভ হয়; ক্ষেপুর সেই বিশ্বাস আছে, আমার নেই। অনেকেই বলেন, শুনে এলুম উত্তরকাশীর উত্তরে, মানসগঙ্গার পশ্চিমে, অলকানন্দার উৎসের ঈশানকোণে, হিমালয়ের এক অতি দুর্গম গিরিগুহার অভ্যন্তরে চিরসমাহিত এক মহাপুরুষ অবস্থান করেন; সকলেই বলেন, অমুকের নিকট শুনলুম, স্বচক্ষে দেখেন নি কেউ। সন্দিগ্ধচিত্ত যাঁরা তাঁদেরও যে এ-জাতীয় গল্পে পুরোপুরি অবিশ্বাস তা বলা যায় না। হাজার বছর ধ্যানস্থ হয়ে আছেন এরকম মুনিঋষিদের কথা পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায়; ছোটবেলা থেকে এঁদের সঙ্গ কল্পলোকে পেয়ে এসেছি; কাজেই মনের গহনে একজন আছেন যিনি হাজার বছর ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে চান; তাঁরই সূক্ষ্ম প্রেরণায় কস্ত্বং-বাবার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ, যেহেতু থাকা উচিত অতএব আছেন নিশ্চয়। ভাগ্যবান্ যাঁরা তাঁদেরই দর্শন দেন, এবং চিত্তে মৌলিক প্রশ্নটি জাগিয়ে তোলেন, 'কস্ত্বং কুত আগতঃ ?'···কস্ত্বং কোহহং কুত আয়াতঃ? কা মে জননী কো মে তাতঃ?··· কে আমি? কোথা থেকে আসি? কোথা চলে যাই? কে জানে? গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্? [১]···আদিম রহস্যময় প্রশ্ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
ত্সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।[২]

পরম ব্যোমে যিনি অধিষ্ঠিত হয় তো তিনি জানেন!···অথবা তিনিও হয় তো জানেন না;···কী আছে এই গুহার অভ্যন্তরে? গহনং গভীরম্?[৩]

॥ ১৪ ॥

ক্লান্ত হয়ে যখন বাসায় ফিরি তখন মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। সারাদিনটা গেছে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনায়। সকালে গিয়েছিলুম চণ্ডী পাহাড়ে; পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে তাকাই হরিদ্বারের দিকে···গঙ্গার নীল রেখা···পর্বতের পাদদেশে সহরের দীপ্ত রূপ। মানসনেত্রে যখন ভারতমাতাকে দেখি, ভেসে ওঠে "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"; হরিদ্বার তেমনি আজ গঙ্গাস্নান করে মুক্তামালায় বিভূষিত হয়ে সূর্যকিরণে ঝক্ঝক্ করছে··· যাত্রীরা মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে আছে···ফিরতি পথে পাহাড়ভাঙ্গা ক্লান্তি দূর করি গঙ্গায় ডুব দিয়ে। কুম্ভস্নান শেষ রাত্রি থেকেই আরম্ভ হয়েছে; মোক্ষযোগ

(১) কঠ ২-৪১-১২ (২) ঋগ্বেদ ১০-১২৯-৭ (৩) ঋগ্বেদ ১০-১২৯-১

বিকেল বেলা। আজ উপোস করে আছি সবাই। সাধুদের ভিড় ঠেলে ব্রহ্মকুণ্ডে ডুব দেওয়া দয়ালদার পক্ষে অসম্ভব, তাই অন্যত্র স্নান সেরে নিয়েছেন। ক্ষেপু ও আমি অন্যান্য গৃহীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাবাজীদের দলে ভিড়ে গিয়েছি, তা নইলে মোক্ষস্নান সম্ভব হতো না, তিথি-নক্ষত্রের যোগ পেরিয়ে যেতো। ভয় আছে, সাধুরা তাড়া করতে পারেন। গঙ্গার পূর্বতট হতে শোভা-যাত্রা সুরু হয়েছে কূর্মগতিতে…রোদে ঠেলাঠেলিতে সকলেই শ্রান্ত, গলদ্ঘর্ম, কিন্তু সর্বত্র আনন্দের উদ্বেলতা…হর-হর, ব্যোম-ব্যোম ; জয় শিব শঙ্কর ; হরি ওঁ, হরি ওঁ ; জয় শ্রীরামচন্দ্রজীকী জয় ইত্যাদি পাতকনাশন পূতধ্বনিতে আকাশ কম্পিত, দেহমন পুলকিত…এবারে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে এগোচ্ছি। একজন গৈরিক-ধারী গৃহীদের ভিড় দেখে রুখে দাঁড়ান, একজন বৃদ্ধ সাধু সহাস্য বদনে বলেন, জানে দীজিয়ে, জানে দীজিয়ে…বলো শ্রীরামচন্দ্রজী কী জয় !…রামায়েত বৈষ্ণব এঁরা। নাগা সন্ন্যাসী হলে মেরেই বসতেন; তাঁরা যান সকলের আগে, গৃহীরা তাঁদের পিছু নিতে সাহস করেন না…পা আর চলে না, গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে ; ইচ্ছা হয় বসে পড়ি, কিন্তু অসম্ভব ; পিষে মেরে ফেলবে ; মরেও অনেকে। একটা ডুব দিতে পারলে এখন বাঁচি…যা রোদ ও ভিড়ের চাপ, সর্দি-গর্মি না হয়…এখনও ক্ষেপুর সঙ্গছাড়া হই নি, ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে কথা হয়, আবার পেছনের ধাক্কায় এগিয়ে যাই…এসে গেছি…ডুব দিয়ে বেঁচে গেলুম…ডুবে থাকতে ইচ্ছা হয়…দেহ মন প্রাণে পরম তৃপ্তি…

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তবপদকমলে ॥
রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥

মাতর্গঙ্গে ! মাতর্গঙ্গে ! পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে !…মাতর্গঙ্গে ! মাতর্গঙ্গে !… কুম্ভস্নান তো হলো—ব্রহ্মকুণ্ডে, মোক্ষযোগে, সাধুজন সঙ্গে। কিন্তু মোক্ষ হবে কি ? বাবাজী সেদিন আশ্বাস দিয়েছিলেন, হতেই হবে। কিন্তু সেই বিশ্বাস কোথায় ? দয়ালদার আছে, তিনি তো সাধুই ; ক্ষেপুরও আছে—ছোট ছেলের সরল বিশ্বাস। কিন্তু আমার দেখছি সংশয়ই চিত্ত অধিকার করে আছে। যাক্ গে। আজকের দিনে ও-সব কথা আর ভাববো না। ভারতের কতো জায়গা

থেকে কতো যাত্রী এসেছেন, লক্ষ লক্ষ ভগবদ্‌ভক্তের আকুল প্রার্থনায় যোগ দিয়েছি, তাঁদের সঙ্গে স্নান করে শ্রীহরির কৃপা চেয়েছি, তাঁদের পবিত্র পরশে ধন্য হয়েছি ; তবে সংশয় কেন ? সংশয়াত্মা বিনশ্যতি···আমার কিছু হবে না ; মনটাও দুর্বল ; নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ; ক্ষেপুর শরীর ও মন উভয়ই বলিষ্ঠ ; আমি—নাঃ, আবার ঐ কথাই ভাবছি ! 'দুর্বলকে বল রাম'···তাঁর নামেই দুর্বলতা কেটে যায়···সুরদাসজী তাই বলেন···নির্বলকে বল রাম···বল রাম, বল রাম, বল রাম, বল রাম···ক্ষেপুর ডাকে উঠে বসি ; চা জলখাবার নিয়ে এসেছে। মুমুক্ষুরও নাকি মোক্ষ-বিভীষিকা থাকে। আমি মুমুক্ষু কি না জানা নেই, কিন্তু মুক্ত হলে যে রসিয়ে চা আর খাওয়া যাবে না এই বিভীষিকাটা বেশ আছে···চা খেতে খেতে সে কথাটাই মনে ওঠে···মুক্তি আসে বহুনাং জন্মনামন্তে···ততো দিন তো চা খেয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে··· দয়ালদা এখনও ফেরেন নি। একটা পান মুখে দিয়ে, আরামের নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ি। ক্ষেপু ধমক দেয়, শুলি যে বড় ? ওঠ্, সাধুদর্শন করে আসি। আমি বলি—

ঃ অসম্ভব।

ঃ অসম্ভব কেন ?

ঃ বেজায় থকে গেছি।

ঃ এতটুকুতেই হেদিয়ে গেলি ? বদরিকাশ্রম যাবি কি করে ?

ঃ যাবো না। এখান থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি ; সাধুদেরও, তুই যাঁদের দর্শনে যাচ্ছিস্। আমার জন্য তাঁদের পদধূলি নিয়ে আসিস।

সারাদিনের উত্তেজনার পর ভাবলুম একটু ঘুমুই···নিদ নাহি আঁখিপাতে··· স্নানার্থীদের বিরাট শোভাযাত্রা চোখের সামনে যাতায়াত করে, ভারতের সকল যাত্রী মাথায় ভিড় করে আছে···যাচ্ছে আর আসছে, অফুরন্ত জনস্রোত, অবিরাম জয়ধ্বনি, আসমুদ্র হিমাচল থেকে আর্ত রোল, পরমকারুণিক শ্রীহরির নিকট ভারতের মুক্তি-কামনা···কুম্ভযোগ···গঙ্গাস্নান···অমৃতলাভ···

হরিদ্বারে না এলে, কুম্ভমেলার স্নানযজ্ঞ না দেখলে, ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচয় হয় না। শুনি, প্রত্যেক জীবেরই আত্মা আছে ; আছে কিনা জানিনা, তবে আছে বলে বিশ্বাস করি, এবং ব্যক্তিগত ভাবনা ও দৃষ্টি-কোণের বৈশিষ্ট্যে তার আভাস পাই। প্রত্যেক দেশেরও কি এমনি একটি আত্মা আছে ? **Presiding Deity ?** কি জানি ! **Landor** (ল্যান্ডর) একটি প্রবন্ধে

গর্ব করেছেন, দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে ধ্বনি তুলেছে Be Free, স্বাধীন হও; এজন্যই ইংলণ্ডের অন্তরাত্মাকে পাওয়া যায় ইংরেজদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র Liberty বা স্বাধীনতায়। ধুঁয়ার জন্য আগুনটা অনেক সময়ই চোখে পড়ে না, কিন্তু আগুনের সত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই···আফ্রিকা dark continent, ইতিহাসের হাতুড়ি-পেটা মাত্র সুরু হয়েছে, অন্তরাত্মা এখনও তমসাচ্ছন্ন ···আমেরিকা প্রাণবন্ত, dark continent নয়, কিন্তু ওর আত্মাকে খুঁজে পাই না; বিত্ত আছে, চিত্ত নেই···রাশিয়া জড়বাদী হলেও বিশ্বসাম্যের স্বপ্ন দেখে, এই স্বপ্নই একদিন দেবতাত্মার কল্যাণরূপে দেখা দিতে পারে। আমেরিকায় জড়বাদ যেন নিরেট···জার্মানীতে আবার উঠেছে রক্তের ডাক—পরাজয়ের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। প্রাণ-হীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সার্থকতা আছে, কারণ কাব্যাহত ক্ষীণজীবীর পরমায়ু অল্প। কিন্তু সাংস্কৃতিক রক্তহীনতার ঔষধ দেবতাদের অমৃতকুম্ভে সুরক্ষিত, জার্মান বৈদ্য যদিও বিধান দিচ্ছেন আসুরিকতার উগ্র হলাহল। ফরাসী দেশের সংস্কৃতি-ব্যাধি হয় তো সাময়িক, মারাত্মক না-ও হতে পারে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের যজ্ঞবেদীতে সাম্যবাদের যে দেবতা প্রকট হয়েছিলেন তাঁকে যদি বলি দেওয়া হয় তবে জাতির মরণ অবশ্যম্ভাবী। অন্তরাত্মাকে রূপ দিতে না পারলে জাতি হয়তো ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়···কতো দেশ ইতিহাসের পাতায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে···আমেরিকার ব্যাধি হচ্ছে 'জড়' রোগ; ময়দানবের এই পুরীতে এখনও দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় নি, শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি বাজে নি, ভবানীর আগমনীগান গাওয়া হয় নি···একদিন সকালে উঠে হয় তো দেখবো ময়দানবের পুরী ভস্মীভূত হয়ে গেছে···ঠিক উলটো হচ্ছে ভারতবর্ষ···দেহটা শতচ্ছিন্ন বস্ত্রের মতো হাওয়ায় উড়ছে, মাথাটি চিরস্থির, চির-গম্ভীর, অচল, অটল, অক্ষুব্ধ! ভারতের আত্মা কুম্ভের হরিদ্বার; হরিদ্বারের আত্মা ধ্যানমগ্ন কৈলাস; কৈলাসের আত্মা কৈলাসপতি সদাশিব—নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। সুখদুঃখের ঢেউ এখানে পৌঁছয় না, ইতিহাসের আলো-আঁধারি অবলুপ্ত, কাল ঘুমিয়ে পড়েছে মহাকালের সুপ্তি-সমুদ্রে···ভারতের এই ধ্যানস্তিমিত আত্মাকে প্রণাম! হে পুণ্যতরঙ্গে মাতর্গঙ্গে! আমাদের সকল পাপ বিধৌত করে কল্যাণের পথে নিয়ে চল······অসতো মা সদ্ গময়···তমসো মা জ্যোতির্গময়······ মৃত্যোর্মামৃতং গময়···

॥ ১৫ ॥

লছমনঝোলায় এসেছি কাল, মহাত্মা কালীকম্বলীওয়ালার ঋষিকুল বিদ্যালয়ের একটি ঘরে ইঁট মাথায় দিয়ে রাত কাটিয়েছি। মন্দ লাগে নি। সকালে স্বর্গাশ্রমের দিকে যাই সাধুদর্শনে। তীর্থ সাধুসেবিত বলেই তীর্থ—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

ভগবৎ-ভক্তগণ স্বয়ই তীর্থস্বরূপ, কারণ শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করে তীর্থস্থানকেও তাঁরা পবিত্র করেন। স্বর্গাশ্রম তপোভূমি; অনেক সাধু আছেন। এক নজরে সব কিছু দেখে নেওয়ার তাগিদে কিছুই হয়তো দেখা হচ্ছে না। ভাগ্য ভাল যে এই ছুটোছুটির হিড়িকেও দুজন মহাত্মার পদরেণু লাভ করেছি, যদিও দর্শন হয়েছিল ক্ষণিকের জন্য, এবং আলাপ বলতে কিছুই হয় নি। সপ্তধারা দেখবার সময় একটি খড়ের ছাউনী চোখে পড়ে। কোনও সাধু আছেন হয় তো, কৌতূহল হয়, এগিয়ে যাই। ঢুকতেই মনে হলো নিঝুম পুরী···আমাদের দেশের বাড়ীর দক্ষিণে একটি পুকুর, তার দক্ষিণে খেলার মাঠ। ছুটির দিনে, বা ইস্কুলে যে দিন যেতুম না, স্নানের প্রথম পর্ব ছিল খেলা—হাডুডুডু, কানামাছি, ছোঁয়াছুঁয়ি, এমনি সব দিশি খেলা; চেঁচিয়ে, দৌড়ে, ছুটোছুটি করে, শ্রান্ত হয়ে ঝুপ্ করে পুকুরে ডুব···মনে হতো এক রাজার রাজ্যি ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যিতে হঠাৎ এসে পৌছলুম; সোরগোল, সঙ্গী-সাথী, খেলাধুলোর জগৎ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছি অচেনা এক নিথর প্রদেশে যেখানে স্তব্ধতার হৃৎস্পন্দন শুধু কানে ভেসে আসে···মহাত্মাজীর ছাউনীতে প্রবেশ করে তেমনি মনে হয়, হঠাৎ ডুব দিয়েছি···ভক্তরা সব নীচে বসে; সাধুজী একটু উঁচুতে, যোগাসনে; বলিষ্ঠ শরীর; মুণ্ডিত মস্তক; বয়স ষাটের কাছাকাছি। সকলেই নির্বাক, নিঃশব্দ। প্রণাম করে, আশীর্বাদীয় ছোট এলাচ নিয়ে, চলে আসি। দয়ালদা বলেন, এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ; স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ।···হৃষীকেশ থেকে লছমনঝোলার পথে আর একজন মহাত্মার দর্শন লাভ হয়। ইনি থাকেন রাস্তার পশ্চিমধারে একটি কুটিয়াতে। আমরা যখন ওখান দিয়ে এগচ্ছি তখন কুটিয়া থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স সত্তরের কোঠায়, রং ময়লা; দীর্ঘ, সবল, রিক্ত দেহ; সহাস্য বদন; আনন্দময় পুরুষ···একবার গরমের ছুটিতে রাঁচী গিয়েছিলুম;

(১) ভাগবত ১-১১-৯

বিকেল বেলা বেড়াতে বেড়াতে মুরাবাদির মাঠে গিয়েছি; রোদে সব জ্বলে গিয়েছে, ঘাসের চিহ্ন নেই, শুধু কাঁকর ও বালি। মাঠের শেষ প্রান্তে দেখি একটি গাছ; পাতা একটিও নেই, কিন্তু গাময় ফুল ফুটে আছে···ঠিক এই মহাত্মাজীর মতো, রিক্ত হয়ে পূর্ণ, সর্বাঙ্গে আনন্দ ফুল হয়ে বেরিয়েছে; সৌরভে মন আচ্ছন্ন হয়। সবাই প্রণাম করি। জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছি আমরা। বাঙলা দেশ শুনে প্রসন্ন-গম্ভীর মুখে আশীর্বাদ করেন, "আনন্দ মেঁ রহো"······

রাস্তায় যেতে যেতে দয়ালদা বলেন: ভাগবতে আছে, তীর্থসলিলে স্নান করে যাঁদের শরীর পবিত্র এবং হরিকথা শ্রবণে যাঁদের অন্তর বিশুদ্ধ, যাঁরা শীলভদ্র এবং নিরাসক্ত, যাঁদের সর্বজীবে প্রেমময় দৃষ্টি এমনি মহাত্মাদের সঙ্গলাভ শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলে হয় না। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন··· স্বর্গাশ্রমের দ্রষ্টব্য সব দেখে চলি বদরিকাশ্রমের পথ ধরে। এক নম্বর চটিতে এসে বসি। দয়ালদা আমাদের সঙ্গে আসেন নি। ক্ষেপু একটু জিরিয়ে দুই নম্বর চটির দিকে এগয়। আমি শাসাই, দেরি হলে দয়ালদাকে গিয়ে বলবো, তুই কস্তং-বাবাকে দেখতে গিয়েছিস, আর ফিরবি না। সাবধান করে দেওয়া দরকার, কারণ এগিয়ে যাওয়ার নেশা এখানে পেয়ে বসে। নেহাৎ শ্রান্ত বলেই বসে পড়েছি আমি। চটিটি বেশ; চারিদিকে বুনো গোলাপ; শাক-সবজিও আছে; জলের অভাব নেই; পাহাড়ের গা বয়ে একটি জলরেখা নেবে এসেছে, তরতর গতি; চটিটিকে আবেষ্টন করে নেবেছে গঙ্গায় বেশ খানিকটা নীচে; মন্দাকিনীর গতি স্বচ্ছন্দ, নিরলস। ওপারের পর্বতমালা ও বনানী— কতদূর চলেছে কে জানে! সামনে বদরিনাথের রাস্তা, রহস্যময় এর আকর্ষণ; মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কতো যাত্রী চলে, মৃত্যুকে বরণ করে কতো লোক পায় দেবতার দরশন! দার্জিলিং থেকে শিকিমের দিকে তাকালে মনে বিস্ময় জাগে; বলি কী অদ্ভুত! কী রুদ্র! কী ভয়ঙ্কর! আর আমি কতো তুচ্ছ! অকিঞ্চিৎকর কীটাণুকীট! মন গ্লানিতে ভরে যায়···এখানকার হিমালয় পরমাত্মীয়। 'শকুন্তলা'য় পড়েছি—

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

রমণীয় দৃশ্য দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের চিত্তও যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার কারণ নিশ্চয় এই যে জন্মান্তরে এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। এ জায়গার আকাশ, বাতাস, আশ্রম, কুটীর, তপোবন-সদৃশ চটি, গঙ্গার নীল রেখা ও গতির সংবেদন, চারিদিকের পাহাড় ও অরণ্য—সব কিছুর সঙ্গেই জননান্তরের সৌহার্দ্য আছে, আছে গূঢ় এক আত্মিক সম্বন্ধ। তুলসীমঞ্চের প্রদীপটিকে দেখে কখনও বলি না, 'আহা! কী সুন্দর!' সুন্দর তো বটেই, কিন্তু তার রূপ কল্যাণবর্ষী, সম্পদ্ অর্চিপথভাগিনী ; প্রদীপের সুমুখে মাথা নুইয়ে প্রণাম করি, তার স্নিগ্ধতায় প্রাণমন পবিত্র করি। হিমারণ্যের সঙ্গে অবশ্য পার্থক্য আছে···প্রদীপের পরিবেশ অল্পকে নিয়ে, এখানকার পরিবেশ ভূমাকে নিয়ে। হিমারণ্যের সুর চিরন্তনীর সুর ; ছন্দ প্রশান্তবাহিতার। ওপারের দেব-ভূমির দিকে তাকাই, মনে হয় চিরদিন ওখান দিয়ে চলা যায়। দার্জিলিং থেকে দূরের পাহাড় দেখলে মন অশান্ত হয়, ইচ্ছে হয় উড়ে গিয়ে ঐ পাহাড়টার মাথায় বসি। এই অশান্তপনা, ব্যর্থতার এই গ্লানি, হিমারণ্যের ত্রিসীমানায় নেই ; কারণ, চলার সঙ্গে পাওয়ার যে নিত্যিকার বিরোধ তা মিটিয়ে দিয়ে আসা হয় এখানে···সব খোঁজাই তাঁকে খোঁজা, সব জানাই তাঁকে জানা, সব পাওয়াই তাঁকে পাওয়া। পাই নি তাঁকে কোনো দিনই, তবুও না-পাওয়ার দুঃখ, বেদনা, অশ্রু, তো তাঁকে নিয়েই। হিমাচল শান্তরসের আলয়। সংসারের কলরবে ভুলে থাকি তাঁকে···ক্বচিৎ কখনও নূপুরধ্বনি শুনলেই তুষ্ট হই, আবার ভুলি। এটা যেন দ্বন্দ্বহীন জগৎ···ঐ দূর বনানীর ঘন অন্ধকারে চিরদিনই তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা যায়···গাছতলার ঐ তৃণাসন ছেড়ে দূরের ঐ ছায়াকুহেলিকায় গিয়ে বসি···এক ঝোপ ছেড়ে আর এক ঝোপ...ছোট্ট একটি পাহাড়ের মাথায় এক ফালি আলো, সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় ঘনশ্যাম নিশ্চয় নীচের গাছগুলোর ঘনশ্যামে লুকিয়ে আছেন···দিশাহারা হই না, সব দিকই তো তাঁর দিক···নূপুর-ধ্বনি থেমে যায়, বসি গিয়ে সুরধুনীর কূলে স্নিগ্ধচ্ছায় শিলাসনে···বিষ্ণুপাদ-প্রক্ষালিনী পুণ্যতোয়াকে স্পর্শ করি, শরীর রোমাঞ্চিত হয়···কতো যুগ ধরে শান্তরসপ্রস্রবিণীর এই নীলধারার দিকে চেয়ে আছি কে জানে!···না-পেয়ে-পাওয়ার চিরন্তনী বাজে হৃদয় মাঝে, এগিয়ে চলি অস্তাচলের দিকে তাঁর চিরন্তন সন্ধানে যিনি 'ম্হারে জনম-মরণ সাথী'······

একদল যাত্রী। উল্লাস ও হুল্লোড়। চেঁচিয়ে প্রতিধ্বনি শোনে, ওপারে ঢিল ছোঁড়ে, গোলাপ ফুল কামিজে লাগায়। নানা রকম মন্তব্য করে—Beautiful!

অপূর্ব! **How grand!** বাজে! **Sublime!** চা পাওয়া যায় না, তার আবার এতো! চল্, কুটিয়াতে যোগাসনে বসে যাই! বদরিনাথের রাস্তা, যা চড়াই! অসম্ভব যাওয়া! বাস্-সার্ভিস্ হলে দেখা যাবে!...চলে যায় সব...কলরব থেমে যায়...আবার সুপ্তি...ক্ষেপুর দেখা নেই...বদরিনাথের পথ ধরে এগিয়ে যায় নি তো? বলা যায় না; এ রাস্তায় থামাই মুস্কিল... চলারই বা কী প্রয়োজন!...এই চটি, গঙ্গার কুলুকুলু নাদ, দূরের পাহাড়, তরুরাজির ঘনশ্যাম, যাত্রীদের পদসেবিত এই পথ...নিত্যকালের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে...রাস্তায় শুয়ে থাকি যাত্রীদের পদধূলি হয়ে; পাহাড়ের সঙ্গে এক হয়ে আছি সন্তজনের ধ্যানমগ্নতায়; বনানীর সঙ্গে মিশে আছি আরণ্যকের সবুজতায়... সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি হিমারণ্যের প্রশান্তবাহিতায়...

তন্দ্রা এসেছিল। ক্ষেপুর ডাকে সজাগ হই; শুধাই, কম্বলবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো কিনা। উত্তর দেয়—দেখা যখন হবে, তখন বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে থাকবি, আর আমি চলে যাবো উল্কার মতো তোর চোখ ঝলসে...; বসি। হেঁটেহেঁটে থকে গিয়েছি। তুই তো দিব্যি আরামসে ঘুমুচ্ছিলি! ঐ যে! দয়ালদা আসছেন।

দয়ালদার চুল-দাড়ি বাতাসে হিল্লোলিত, প্রাণটাও বেশ উৎফুল্ল। বসে বললেন, 'ভাল একজন সাধুর সঙ্গে আলাপ হলো।' ক্ষেপু জিজ্ঞেস করে, 'চেহারা কি রকম?' দয়ালদা জবাব দেন, 'চেহারায় কিছু বোঝবার জো নেই; বেঁটে, দোহারা গড়ন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা রং, মোটেই সুপুরুষ নন।' আমি মন্তব্য করি, 'ক্ষেপুর মাপকাঠিতে তেমন ভাল সাধু বলে মনে হচ্ছে না।' ক্ষেপু উত্তর দেয়, 'চেহারাটা ফেলনা নয়, ঈশ্বরের একটা বিভূতি।'

ঃ তা হলে অশ্বত্থ বৃক্ষও তোর মতে বড় সাধু?

ঃ বটেই তো। আমাদের বাজারে যে অশ্বত্থ গাছটি আছে তার পূজো হয় দেখিস নি?

ঃ দেখেছি। কিন্তু তার গায়ে সিঁদুর না চড়িয়ে এতো কষ্ট করে লছমনঝোলায় এসেছিস কেন?

ঃ ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। তর্করোগেই তুই মরবি।

দয়ালদা বলেন, "তর্কাতর্কিতে আসল কথাটাই কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে...যে সাধুজীর কথা বলছিলুম,—দশ বছর আছেন একটি কুটিয়াতে। কালীকম্বলীওয়ালার আশ্রম থেকে খানিকটা এগলে, হাতের ডান দিকে একটা রাস্তা উঠে গেছে

পাহাড়ের উপর ; তার মাথায় ছোট্ট কুটিয়া ; নির্জন স্থান, মনোরম দৃশ্য ; বৈরাগ্যের আবাসভূমি। ভাল প্রেমিক সাধু ; অনেকক্ষণ ভগবৎ কথা হলো···খুব আনন্দ পেলুম···শেষে প্রশ্ন করেছিলুম, তত্ত্ব কী ? উত্তর করলেন, প্রেমই তত্ত্ব।” দয়ালদা চুপ···দু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রুর বিগলিত ধারা···ক্ষেপু মুখ গুঁজে কাঁদছে···রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি ; ভাবি, যাবো কি করে ? গঙ্গাবতরণের শিবলগ্ন থেকে অগণিত যাত্রীর পদধূলিতে পবিত্র এই পথ, এ পথে পা দিতে নেই··· **the ground is holy**···এগবো কি করে ? অপরাধ হবে না ? ···পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় স্নান করি। গৌরীশঙ্করের নিকট অপরাধমার্জনা ভিক্ষা করি—

গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি।
সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্কর ॥

বদরিনারায়ণের পথকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ; প্রার্থনা জানাই—

মধুমন্ মে পরায়ণম্।
মধুমৎ পুনরায়নম্ ॥[১]

(১) ঋগ্বেদ ১০-২৪-৬

প্রথম অধ্যায়

নব নব রূপে এসো প্রাণে

(খ)

গয়াধাম

(খ)

গয়াধাম

॥ ১ ॥

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥

জীবনের সব অলিগলিতেই 'যদি'র দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, অতিক্রম করতে গিয়ে দেখি পথের কাঁটার অন্ত নেই। 'কালী, কালী, কালী' বলে যদি আসন নিয়ে বসতে পারি তখন 'সন্ধ্যা' হয়তো আমার 'সন্ধানে' ফিরবে, কিন্তু পারি কৈ? পারি না বলেই ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে বেড়াই পরশ পাথর। কুম্ভ মেলার পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে; খতিয়ে দেখি, পাঁজির অঙ্কের মতো 'জমা ৫, খরচ ৫, লাভ শূন্য'। জমার খাতে সঞ্চয়ের তাগিদ আসে। তিন বন্ধু ঠিক করি, কাছেপিঠে গয়াধাম, বিষ্ণুপাদ দর্শন করে আসা যাক। কিন্তু পরশপাথর সেখানে পাবো কি?···কী যে খুঁজছি তা-ও ছাই জানি না; বুঝি-ও না··· বাঙলার এক ঝিল্লিমুখর গ্রামে ধান ক্ষেতের নিভৃতকোণে নৌকোতে বসে মানচিত্রের পাতা খুলে কতো দেশ-বিদেশ দেখেছি, কল্পনার আবেশে কতো কল্পলোক সৃষ্টি করেছি, মনোরথে কতো নদ-নদী, বন-উপবন, গিরিগুহা, মরুপ্রান্তর পরিক্রমা করেছি···বাস্তবজগতে কিন্তু তাদের সন্ধান পাই নি। গ্রামের ইস্কুলে তখন পড়ি; মাষ্টার মশায় অনেক তীর্থ করে এসেছেন···লছমনঝোলার গল্প বলে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। কী স্বপ্নাতুর মন নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরি··· মেঠো রাস্তা, দুপাশে সরষে ক্ষেত হলদে ফুলে মোড়ানো; পশ্চিম আকাশে অস্তাচলের আবীর; পাখীরা দলে দলে উড়ে যায়—লছমনঝোলার রঙিন দেশে? অদ্ভুত সেই ঝোলা, গভীর সেই নদী, আঁধারের ওপারের সেই দেশ!···কতো সন্ধ্যায় খেয়া পার হয়ে গিয়েছি সেই দেশে, শুনেছি গঙ্গার কুলুকুলু নাদ, রাত্রির অন্ধকারে খুঁজেছি লছমনজীর শ্রদ্ধানত চোখ···তারপর একদিন সত্যিই গিয়ে হাজির। ক্ষেপু বলে, তাই তো, এতো কষ্টে এলুম, ঝোলাটিই নেই! দয়ালদা উপদেশ দেন, যে ঝোলা পার হতে হবে সেটি হচ্ছে মনে; ব্রহ্মবিদ্যাই অমৃতস্য সেতুঃ। আমি বলি, তা না হয় হলো; কিন্তু সংসার ত্যাগ করে, মরণের সেতু পার হওয়ার সংকল্প নিয়ে যে সাধুজন এখানে বসবাস করছিলেন তাঁদের

সলিল-সমাধি কেন হলো? বন্যাতে অনেক সাধু সেবার মারা যান। ভবিষ্যতের এতটুকু ইঙ্গিতও পান নি? দয়ালদা উত্তর দেন, প্রয়োজন মনে করেন নি; কাম্য তাঁদের ব্রহ্মবিদ্যা, আবহবিদ্যা নয়। ক্ষেপু ইতিমধ্যে খেয়া নৌকোর ব্যবস্থা করে এসেছে···ওপারে যেতে যেতে সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়েন; সন্ধ্যা না হলেও আঁধার নেবে আসে; দুর্ভাবনা হয়, এখন থাকি কোথায়, খাই কি; ফেরাও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ সাধুর দেশ। দয়ালদার সাধু-সুলভ দাড়ি-চুল দেখে কালীকম্বলীওয়ালার গদির লোকদের বোধ হয় শ্রদ্ধা হয়ে থাকবে···আহার ও বাসস্থান জুটে গেল। তখন নিশ্চিন্ত মনে ক্ষেপু ও আমি রামকীর্তন করি।

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম। কালাত্মকপরমেশ্বর রাম॥
শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম। ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম॥
চন্দ্রকিরণকুলমণ্ডন রাম। শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম॥
কৌশল্যাসুখবর্ধন রাম। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন রাম॥

*　　*　　*　　*

সর্বচরাচরপালক রাম। সর্বভবাময়বারক রাম॥
বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত রাম। নিত্যানন্দপদস্থিত রাম॥
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। পতিতপাবন সীতারাম॥
রাম রাম জয় রাজা রাম। রাম জয় রাজা সীতারাম॥

প্রণাম করি—

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

ভক্তশিরোমণি মহাবীরজীকে প্রণতি জানাই—

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥

পোয়াল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি তিন বন্ধু···ছোট বেলার কাল্পনিক লছমন-ঝোলায় দোল খাওয়ার কথা ভাবি...সেতুর এপারে লছমনজী দাঁড়িয়ে; ভক্ত যাত্রীদের নির্বিঘ্নে ওপারে নিয়ে যান হনুমান্‌জী; তারপর লুটিয়ে পড়ি রাজা রামের আসন-তলে!···দুর্ভাগ্য আমাদের! সেতু নিশ্চিহ্ন, লছমনজী ও হনুমান্‌জী ভক্তের ডাক শুনে চলে গেছেন পুণ্যতর স্থানে; সুতরাং রামজীর দর্শন সুদূর-

পরাহত···সাশ্রুনয়নে রাম নাম জপ করি···হে জগৎপতি রাম! হে কল্যাণ-বিধাতা, আশ্রিত-বৎসল রাম। হে সর্বচরাচরপালক সংসৃতিবন্ধবিমোচক রাম! তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও। রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম ; রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম।···মাষ্টার মশায়ের নিকট গল্প শুনে যে অস্তাচলরাগ-রঞ্জিত লছমনঝোলার স্বপ্ন দেখেছিলুম তাঁর খোঁজে নিজেকে হারিয়ে ফেলি সুপ্তির বিস্মরণে···············

গয়াধামের টিকিট কিনতে সেই যে বেরিয়েছে ক্ষেপু, কখন ফিরবে ঠিক নেই। অনেক কাজ নাকি হাতে, সেগুলোর হিল্লে না করে যাওয়া অসম্ভব। চাকরি করে এখন, সদাই ব্যস্তবাগীশ, কাজ না থাকলেও চরকির মতো ঘোরে। কাজের লোকও বটে ; আমি চিরকালের অকেজো। চিন্তার জালে জড়িয়ে থাকা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে···ছাইভস্ম কতো কি ভাবি...আমাদের গাঁয়ের মনা পাগলাকে দেখেছি এখানে-সেখানে এটা-সেটা কতো কি কুড়য়··· 'কি কুড়চ্ছিস্?' 'দলিল-দস্তাবেজ'।···আমারই মতো ; অবচেতনে কতো কিছুই না জমিয়ে চলছি! চোখ বুজলে ভেসে ওঠে পানা, শেওলা, বিবর্ণ পাতা, হিজিবিজি রেখা···পিদিম জ্বালিয়ে ঢুলুঢুলু নয়নে পড়ি—ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াং হো, পেই হো, ক্যান্টন···মণ্ডপ ঘর থেকে পুজারী ঠাকুর মশায় গান ধরেছেন—

হরি, দিন তো গেলো, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা, ডাকি হে তোমারে॥
(শুনি) কড়ি নাইকো যার, (তুমি) তারে করো পার।
(আমি) দীন, ভিখারী, নাইকো কড়ি : দেখো মোর ঝোলনা ঝেড়ে॥
(আমি) আগে এসে, (ঘাটে) রইলেম বসে।
যারা পাছে এলো আগে গেলো, আমি অধম রইলেম পড়ে॥

ইয়াংসিকিয়াং! কালো মিশমিশে জল, অনেকটা নীচু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ; যাত্রীরা এপারে জড় হয়েছে। এই খরস্রোতে যদি পড়ে যায়! কুমীর যদি পা ধরে কালো জলের গভীরে টেনে নেয়! দয়ার ঠাকুর শ্রীহরি যাঁদের হাত ধরে নিয়ে যান তাঁরাই শুধু ওপারে যেতে পারেন···আমি অধম রইলেম পড়ে···'দিনু' আমাদের বেশ পেরিয়ে গেলো। 'বেশ' হয়তো নয় ; সে এক অশ্রুমতী কাহিনী। নাম ছিল দিনেশ রঞ্জন, ডাকতুম 'ডি-আর্', পরিচয় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী থেকে। তখন বি. এ. পড়ি ; সরকারী কলেজ, মস্ত বড় কম্পাউণ্ড, চারদিকে ছড় দেওয়াল, দেওয়ালের ধারে ধারে গাছ, মাঝখানে একটি পুকুর। শীতের দিনের দুপুর বেলা,

কলেজ কিসের জন্য ছুটি হয়ে গেছে ; গাছতলায় দিনু ও আমি। 'ডি. আর' যে ভাল গাইতে পারে তা নয়, তবে গলায় দরদ ছিল। গান ধরলো—রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলা শেষের তান। ছুটির দিনের নিঃসঙ্গ কলেজ ; দুপুরের স্তব্ধ আলো পুকুরের কাল জলে ঘুমিয়ে পড়েছে ; 'কা—কা' রবে একটা কাক নির্জনতার সুর টেনে উড়ে যায়…রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলা শেষের তান… কোথায় সেই রাজপুরী ? কোন্ সে গুণী 'মস্ত' হয়ে যিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন ? বেলা শেষের কোন্ সে মোহন তান বুকের ভিতর যে আজও সাঁঝের বেলায় গুমরে ওঠে ? পাই নি খুঁজে…অনেক কাল পরে আলি আকবর সাহেবের কিরিয়াণী রাগের আলাপ শুনে মনে হয়েছিল, চিনি গো, চিনি উহারে…চিনলেও ধরে রাখা যায় না ; পুকুরের বুকে ঘুমিয়ে-পড়া আলোর মতো কোন্ সুদূরে রাজপুরীর কোন্ অলখ্ পুরে অদৃশ্য হয়ে যায়…যাত্রা করেছিলুম এক সঙ্গে কিন্তু দিনু আজ অনেক দূরে। অসহযোগ আন্দোলনের হিড়িক তখন ; মহাত্মাজীর ডাকে জেলে গেলো। জেল থেকে বেরিয়ে দিল সমুদ্র পাড়ি। অক্স্ফোর্ডের ডিগ্রি নিয়ে যখন ফিরে এলো—একদম অন্য মানুষ ! সিগারেটের কৌটো সারাক্ষণ হাতেই থাকে। একটা সিগারেট মুখে দিয়ে বলে, আরে না, বদলাই নি ; বাইরের খোলসটার একটু ভদ্রোচিত সংস্কার হয়েছে, ভিতরটা ঠিক আছে। অর্থাৎ আগে খদ্দর পরতো, খদ্দরের চাদর ছিল একমাত্র জামা, খড়মপায়ে কলেজ করতো, বিড়ি-সিগারেটের কোনো বালাই ছিল না ; এখন স্যুট ছাড়া চলে না, সিগারেট মুখে লেগেই আছে, আর আমাদের চিরাচরিত সংস্কার সম্বন্ধে উন্নাসিকতা। আত্মবিশ্লেষণের শক্তি যখন হারিয়েছে তখন তর্ক তোলা বৃথা। তবুও বললুম, চিত্রকর প্রাণ দিয়ে যখন ছবি আঁকেন তখন আনুষঙ্গিক রেখাগুলো মূলবস্তুর ব্যঞ্জক করে তোলেন ; আত্মিক এই ব্যঞ্জনার অভাব হলে Dr. Jekyll ও Mr. Hyde-এর পরিস্থিতি দেখা দেয়।…হলোও তাই। বি-এ তে আমাদের ব্রাউনিং (R. Browning) ছিল। 'ডি-আর' প্রায়ই আওড়াতো—The sin I impute to each frustrate ghost is, the unlit lamp and the ungirt loin ; আমি সান্তায়ন (G. Santayana)-এর মত উদ্ধৃত করে জবাব দিতুম—barbarian, বর্বর। শেষ পর্যন্ত ব্রাউনিং-এর barbarian lover (বর্বর প্রেমিক)-এর মতো একটা কেলেঙ্কারি করে বসলো।…ওর ভিতরকার দেবতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ; দানব সকলেরই চিত্তে আছে। বন্ধুবর দানবের উৎপাতে অকালে ভবসাগর পাড়ি দিলো।

তখন আমি দার্জিলিং-এ ; বেলা শেষ হয়ে এসেছে ; দূরের পাহাড়ের ওপারে সূয্যিঠাকুর ডুব দিয়েছেন ; পাহাড়টা রক্তরাগে ঝলমলিয়ে ওঠে ; বেলা শেষের তানের মূর্ছনায় রূপ নেয় স্বপ্নময় রাজপুরী···গ্লানিময় আমাদের জগতে দিনু শুনে গেলো songs that the sirens sing ; পরপারে হয়তো অলখ্‌পুরের সন্ধান পেয়ে অন্তর দিয়ে শুনছে বেলা শেষের তান······

জীবনের মণিকোঠায় এমনি কতো গন্ধর্বনগর, eldoradoর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কতো সুর শুনি বনমাঝে কি মনোগহনে···যাত্রা পথের অলিগলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি আলেয়ার সন্ধানে···ভাবি হারিয়ে যাওয়া কোনো গলিঘুঁজিতে পাঁজা করা ইটের ফাঁকে ফাঁকে যে ঘাস ও ঘাসফুল ফুটে বেরিয়েছে তাদের অন্তর আলো করে আছে হারানো আলেয়া···যদি কোনো দিন দেখা হয় তবে হয়তো প্রাণের পরশ দিয়ে শুধাবে—ভাল তো? ···হয়তো কোনদিনই আর দেখা হবে না···জীবনটা যেন একটা পাহাড়ে নদী···সে বার রামগড় থেকে গিয়েছিলুম ছিন্নমস্তার মন্দির দেখতে ; দামোদর নদ এঁকে বেঁকে চলেছে, যেন শেষ নেই ; কোথাও পাথরের নুড়ি, কোথাও পাথরের চাঙড় ; দুধারে গাছ, ঝোপ, জঙ্গল ; যেতে যেতে বারবার মনে হয়, আর একটা বাঁক পর্যন্ত যাই, তারপর ফিরবো ; কিন্তু পাহাড়ে নদীর অফুরন্ত রহস্য থামতে দেয় না, প্রলুব্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৈচিত্র্য হয়তো আছে, কিন্তু এর মানে কি? আমার এক বন্ধু বেশ রসিক লোক ; গাইয়ে, বাজিয়ে, আমুদে। পুত্রশোক পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ মশায়, এর মানে কি? ছেলে মলো ; আবার ছেলের পৈতে, নাতির মুখে-ভাত, মেয়ের বিয়ে···এর মানেটা বলতে পারেন?···নদীর ধার দিয়ে চলছি, হাতছানি দিয়ে কে যেন কোন্ অজানা দেশে নিয়ে চলে···হয়তো মরণের কাল গভীরে···না থামলে হয়তো মানেটা ধরা যায় না। কিন্তু আমার মামাবাবু যেমন বলেন, "সে বড় শক্ত কথা হলো না?" সবাই অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে—মরবে বলে। এই মরণ-বেগ থামায় কার সাধ্যি?

কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বম্ ইচ্ছন্।

ক্বচিৎ কোনও ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি' অমৃত হন পরমাত্মদর্শনে··· শক্ত কথা···

॥ ২ ॥

সব ঠিক করে এসেছে ক্ষেপু—টিকিট, ভারত সেবাশ্রমে থাকবার জায়গা, যাত্রার জিনিসপত্র, টুকিটাকি, সবকিছু ; একটু 'কিন্তু'-ও আছে ; যখন যেটির দরকার তখন সেটি প্রায়ই নিরুদ্দেশ থাকে। তবুও কাজের লোক ; ওর কাছে অনেক কিছু বেশ সহজ ভাবেই স্বচ্ছ যা আমি মাথা ঘামিয়েও ঘোলাটে দেখি। গাড়ীতে জায়গা ছিল না, কিন্তু জায়গা করে নিতে ওর দেরি হয় নি ; যাত্রীদের বাক্স-ডেক্স এরটা ওর উপর রেখে, মালপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে, বাঙ্কের উপর দিব্যি নিজের বিছানাটি করে নিয়েছে ; অধিকন্তু জানালার ধারে বসে 'সিনারি' দেখার ব্যবস্থাও করেছে। আমাদের বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দয়ালদাকে গা এলিয়ে নাম জপ করবার মতো আরাম কেদারা বানিয়ে দিয়েছে। পদ্মনাভকে স্মরণ করে যখন বাঙ্কের উপর শুয়ে পড়লো তখন জানালার ধারটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আশ্বস্ত করে, এক ঘুমের পর জায়গা বদল করে নেওয়া যাবে। হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে বলে, 'তোমাদের দ্বারা এই কর্ম হতো ? বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে রাস্তায় চলা যায় না।' দয়ালদা জবাব দেন, 'এই জন্যই তো তোমাকে সঙ্গে আনা'। আমি মন্তব্য করি, 'এমনিই তো অহম্-এর লেজটি ফুলে আছে তার উপর উসকানি পেলে—'। ক্ষেপু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দেয়, 'অহম্ আবার তুই কোথায় দেখলি ? খাঁটি সত্য কথা—bare statement of fact ; তুই পারতিস্ এই ব্যবস্থা করতে ?'···সুধীর আমার সতীর্থ, মাষ্টারি করে, থাকে কলকাতার বাইরে, রোজ ট্রেন্-বাস্-এ টানা-প'ড়েন করতে হয়। প্রত্যহ ঘণ্টা দুইর মতো সময় নষ্ট হয় ভেবে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কাছে-পিঠে ঘর নেয় না কেন। সুধীর উত্তর দেয়, 'সময় নষ্ট মোটেই হয় না ; এই দু-ঘণ্টা আমার অমূল্য সময় ; মাষ্টারি ও টুইশনি করে আর সংসারের ফাই-ফরমাশ খেটে বই পড়ার টাইম্ পাই না ; কাজেই যাতায়াতের সময়টা রেখেছি পড়ার জন্য। আগে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজব হতো—মানে অফুরন্ত কেচ্ছা ; ভাল লাগে না। তাই বইর ভিতর ডুবে থাকতে চেষ্টা করি ; নিজের উপকার হয়, ছাত্রদের উপকার হয়, সময়টা কাটেও ভাল।' দেশ স্বাধীন হলে সুধীর 'বীরোত্তম' উপাধি পেতো। ট্রেনে-বাসে পড়া যায় জানা ছিল না। আমি পারি না ; চোখ খারাপ, টাইম্-টেবিলের লাইন্গুলোও গুলিয়ে যায়। জানালার ধারটি পেয়ে বর্তে গিয়েছি। যাত্রীদের ঘুমবার প্রক্রিয়া-বৈচিত্র্য দেখবার মতো—কেউ মাথা গুঁজে ; কেউ মাথা কাত করে ;

কেউ উবু হয়ে; কেউ গা এলিয়ে বা সহযাত্রীর কাঁধে মাথা রেখে। ঘুম আসলে ভব্যতা থাকে না, সকলেই কাবু হয়ে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীতে সুপ্তিই শান্তি, যদি আসে। বিনিদ্র আমি; গাড়ীর কামরায় ছোট্ট একটি দ্বীপ, সেখানে আমি একেলা। গাড়ী চলছে অন্ধকারের বুক চিরে···নব নব রূপে এসো প্রাণে···সব রূপই ডুবে যায় অতীতের অন্ধকারে···স্টীমারে একবার পদ্মানদী পাড়ি দিয়েছিলুম দিনের বেলা; বায়ুকোণে কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু···ঝড় ও বৃষ্টিতে চারদিক ঝাপসা; স্টীমারটি যেন দিগ্‌ভ্রান্ত, ভূতগ্রস্ত। নদীর জল অগভীর; খালাসী জল মেপে মেপে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে—চার (?) বাম মিলে, পাচ (?) বাম মিলে না···মাঝে মাঝে বেজে ওঠে সারেঙ্গ সাহেবের বাঁশি···এক অসীম সমুদ্র, পার নেই, কূল নেই; সুতরাং পাড়ি দেওয়া চলে না, দিগ্‌ভ্রমের প্রশ্ন ওঠে না; গতি আছে, গন্তব্য নেই; চলার নেশা আছে, পৌঁছবার বালাই নেই··· বাঁশির নাদ-মন্ত্রে অকূল পাথার এগিয়ে আসে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, অমূর্ত জাগায় প্রকাশের বেদনা···চার বাম মিলে, পাঁচ বাম মিলে না···অতল সমুদ্রকে মেপে মেপে চলি; ডুব দিতে চাই, ভেসে উঠি···বুক কেঁপে ওঠে অনাহতের আহ্বানে···কার বাজে ঐ মন্দ্রিত ধ্বনি? যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ? মৃত্যু এবং অমৃত যে পরমপুরুষের ছায়া তাঁর?···

রাত্রির অন্ধকারে গতির আনন্দ পাই না, পাই যাত্রার বিষাদ। আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল-দেহ কালপুরুষ, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন নীচেকার কাল সমুদ্রের দিকে; সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে মর জগৎ; তার বুকে হামাগুড়ি দিয়ে চলে আমাদের গাড়ী···আকাশে অগণিত তারা; রাত হলেই আসে, চেয়ে থাকে আমাদের দিকে অতন্দ্রিত চোখে। ছোট মেয়েরা 'তারা ব্রত' পালন করতো আগে···এক তারা পূজি, দুই তারা পূজি···ষোল তারা পূজি···কেন পূজো করতো? ভালবেসে? জানিনা। আমার কিন্তু তারা দেখে ভয় হতো···বিকেল বেলা ঘুড়ি উড়নো দেখছিলুম; অনেক দূর থেকে, বেশ উঁচু দিয়ে একটা ঘুড়ি যাচ্ছে, কেটে গিয়েছে। মাথার উপর যখন এলো তখন ধরবার জন্য সবাই পিছন নিই; অনেকদূর এসে দেখি মাঠের শেষে যে গ্রামখানা তার ভিতর ঘুড়িটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সাঁঝের আঁধার নেবে এসেছে; পশ্চিম আকাশে একটি তারা ধক্ ধক্ করে জ্বলছে, তার পিছনে অন্তহীন একটা দেশ···ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী আসি, হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে পড়ি—নদী, নদ্যৌ, নদ্যঃ; নদীম্ নদ্যৌ, নদীঃ···পিছনে ভেসে ওঠে তারার ওপারের দেশটা। দিদিমা জপ করছিলেন,

তাঁর কোলে মাথা দিয়ে বলি, 'দিদিমা, আজ একতারা দেখে ফেলেছি।' দিদিমা গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ভয়টা তাড়িয়ে দেন। ভয়টা ঠিক কাটে নি—when only one is shining in the sky নিঃসঙ্গতার পীড়া দিয়েছে। মাষ্টার মশায় ব্যাখ্যা করেন—নিষুতি রাত, চারদিক মিশমিশে কালো, নিথর, নিস্তব্ধ; শুধু আকাশের তারা তন্দ্রাহীন চোখে চেয়ে আছে লুসীর পানে, আর লুসী (Lucy) অন্তর দিয়ে শুনছে তাদের ভাষাহীন বাণী। গায়ে কাঁটা দিয়েছিল ভয়ে। স্থূল ভয়টা হয়তো আর নেই, কিন্তু বুকের ভিতরটা এখনও কেমন করে ওঠে, একটা uncanny ভাবের সাড়া পাই···কালপুরুষকে দেখে পুরনো সেই সুরটা বেজে ওঠে। কে এই বিরাট কালপুরুষ ? মহাকাল ? অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া জগতের মহাশ্মশানে শ্মশানবাসী শিবের দীপ্তধ্বজা ? য এষঃ সুপ্তেষু জাগর্তি ? সব ঘুমলেও যিনি জেগে থাকেন—কে তিনি ?·········গাড়ীর ঝাঁকুনিতে জেগে উঠি—দেখি অজানা এক প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে নয়ন-ভুলানো এসেছে; আকাশের ছিন্ন মেঘ, দুপাশের ঝোপ-ঝাড়, গাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা সব জেগে উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রালোকে। শুক্লপক্ষের চাঁদ আমাদের আপনার লোক, পরিচিত, আশৈশব অন্তরঙ্গ, মামা। কৃষ্ণা তিথিতে জগৎ অন্ধকারে ডুবে থাকে, দুপুর রাতে দোর খুলে দেখি সব সোনা হয়ে আছে; এই চাঁদের-ই এক ফালি আছে শিবঠাকুরের মাথায়। চন্দ্রমৌলির আলোতে বিকশিত জগৎ অপরূপ, অপার্থিব।···কতো অচেনা দেশ পেরিয়ে চলছি; নাম-না-জানা কতো নদী, বন, প্রান্তর ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে লুকিয়ে যায়···হঠাৎ গাড়ীটা থামে। ঘরঘর আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়; নেবে আসে বিশ্বের নিঝুমতা, simmering stillness; অদূরে গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে; আরও দূরে একটা শাদা ধবধবে বাড়ী কান পেতে রাত্রির হৃদ্‌স্পন্দন শুনছে; অনাহতের অবিরাম নিঃস্বন···ঘরঘর আবার সুরু হয়; গাড়ী চলে স্তব্ধতার ধ্যানভঙ্গ করি'······

অদ্ভুত এক উপাদানে তৈরী মানুষের মন। পরিচিত জায়গা ভাল লাগে না, চলি তীর্থপর্যটনে, দূর হতে দূরান্তরের আহ্বানে। অপরিচিতের সঙ্গে জাগে অস্বস্তি, মন উচাটন হয় পরিচিত বেষ্টনীর মাঝে ঘুমিয়ে পড়ার তাগিদে। দূরকে করতে চাই নিকট বন্ধু, যদিও দূরত্বের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য; যখন লঙ্ঘিত হয়, দূর যখন নিকটে আসে, তখন দেখি সে একঘেয়ে, চেনা প্রতিবেশী; বন্ধু নয়। তাস খেলি তার সঙ্গে, কথা বলা যায় না; পছন্দ করি তাকে, ভালবাসা যায় না। দূরত্বের ব্যবধান টানে; নিকটের ব্যবধান সরিয়ে দেয়। এমনিই জীবন; ব্যস্ত হয়ে

চলি; শ্রান্ত হয়ে যদি ফিরই, শান্তির বদলে আসে একঘেয়েমি। আবার ছুটি অশান্ত হয়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায়। পরিচয়ের ফলে জীবনের সব কিছুই হয়ে যায় মৃত, তুচ্ছ, বর্জনীয়। মৃত্যুই চির অজ্ঞেয়, অতএব চিরবাঞ্ছিত··· যৎ মরণং স এব বিশ্রামঃ! কিন্তু মরণ যে শ্রাম সমান তা-ই বা কে বলতে পারে? নচিকেতা-সংবাদ থেকে মনে হয়, যমরাজ ভদ্রলোক, আলাপী-সালাপী, অতিথি-পরায়ণ; তিন দিন অনাহারে আছে শুনে নচিকেতাকে তিনটি বর দিয়ে ফেললেন, আর ফাউ দিলেন একটি গুড্ কন্‌ডাক্‌ট্ প্রাইজ (good conduct prize)! সুতরাং যমের বাড়ী যেতে ভয় পাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কঠোপনিষৎকার বলেন, ঈশ্বরের মাধ্যন্দিন আহার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রূপ অন্ন, এবং মৃত্যুরূপ ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জনটা হয়তো হজম করা যায় মরণের সঙ্গে মিতালি করলে। অর্থাৎ মৃত্যুকে জানলে মৃত্যুবেচারা নিজেই মরে যাবে, আর দুয়ার খুলে যাবে অমৃতসাগরের। কিন্তু একি সত্যি? যমরাজ অবশ্য নচিকেতাকে দৃপ্তকণ্ঠে আশ্বাস দিয়েছেন, কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুম্ অর্হতি? হর্ষবিষাদহীন পরমাত্মাকে আমি ভিন্ন আর কে জানতে পারে? সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি দরকার। যদি নচিকেতার মতো ভাগ্যবান্ না হই?

অন্যথা ভাগ্য পরীক্ষা সম্ভব কি?

অসম্ভব কেন?

কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুম্ অর্হতি?

মৃত্যু যে বিভীষিকা?

না মরলে শান্তি কৈ?

শান্তির নিশ্চয়তা কী?

He that loseth his life for my sake shall find it.

Amen.

॥ ৩ ॥

যাত্রীদের নাবা-ওঠার ভিড় লেগে গেছে, মানে যাতায়াতের রাস্তা প্রায় বন্ধ। জাতীয় প্রকৃতি আমাদের মন্থর, শ্লথ; কিন্তু গাড়ীতে ওঠবার বা গাড়ী থেকে নাববার সময় যে ক্ষিপ্র উদ্যস্ততা আমাদের আসে তা সত্যিই বিস্ময়কর, অভাবনীয়। ফলে ছাতাটা, লাঠিটা, এক পাটি জুতো, বা স্যুটকেসটাও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমাকে জুতো খুঁজতে দেখে ক্ষেপু বলে, আছে,

আছে; একবার নেবেছিলুম; ভাবলুম, কি জানির কম্ম, বলা তো যায় না, তাই বাঙ্কের উপর রেখে দিয়েছি।

ঃ আমাকে যে বাঙ্কটা ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল?

ঃ যা ঘুমুচ্ছিলি! ঘুম ভাঙানো কি ঠিক হতো?

দয়ালদার নির্দেশ মতো গয়াজীকে প্রণাম করে নেবে পড়ি। ভারত সেবাশ্রমের দ্বিতলে একখানা ঘর পেয়েছি। বেশ নিরিবিলি। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে চা নিয়ে বসি। দয়ালদা ও-রসে বঞ্চিত। এসেই স্নান করে নিয়েছেন। তারপর তারকব্রহ্ম নামকীর্তন।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

আমরাও যোগ দিই। অতঃপর মহাপ্রভুকে প্রণাম করে গাই—

হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণগোবিন্দায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

প্রণাম মন্ত্র পাঠ করি—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥
শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ।
জ্ঞানং চ মহ্যং দেহি দেবদেব কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ ॥
জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপালগোবিন্দমুকুন্দশৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

দয়ালদা গুরু স্তোত্র পাঠ করে জপে বসলেন। ক্ষেপু এক কেতলি চা ও ঝাল শিঙ্গাড়া দিয়ে বলে, 'তুই খা; আমি ও-পাট দোকানে সেরে এসেছি। যাই, পুরুতের ব্যবস্থা করে আসি।'

…জাপানে চা-এর পর্বটা শুনেছি হোমের ন্যায় পবিত্র; নিঃশব্দে চা-পান সেরে মনকে শূন্যাবগাহী করা হয়, এবং পরিশেষে ধ্যানাভ্যাস; মঠাদিতে হয়তো এ জাতীয় সেবা ও সেবনের রেওয়াজ আছে। আমাদের দেশে এর জুড়িদার

হচ্ছে সাধুদের গঞ্জিকাসেবন ও তান্ত্রিকদের কারণ-পান। দয়ালদা ওঁর এক গুরু-ভাইর কথা বলছিলেন একদিন। আমাদের বাড়ীর সামনে একটি পুকুর; পুকুরের দক্ষিণে খেলার মাঠ, তারপর অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে চাষের জমিতে যবের শীষ; ছেলেদের খেলা সাঙ্গ হয়েছে; সাঁঝের প্রদীপ দু-একটা দেখা যায়; আকাশে দু-চারটি তারা। তারার দিকে চেয়ে দয়ালদা বলেন, 'পাতঞ্জলে আছে, ধ্রুবে তদ্‌গতিজ্ঞানম্, ধ্রুবতারার ধ্যান করলে তারকাদের গতিবিধি জানা যায়। আমার এক গুরুভাইর এ সব দিকে ঝোঁক ছিল, নাম তারানাথ। একজন নাগা সাধুর কাছে প্রক্রিয়া শিখে নেয়। প্রক্রিয়ার ফলে একদিন কেবল তারা দেখতে আরম্ভ করলো। অনেক কষ্টে হুঁশ ফেরে।'

ঃ মানে গাঁজা খেয়েছিলেন?

ঃ হুঁ। এ রাস্তায় চোরাগলির অভাব নেই।

ঃ তারার কিন্তু একটা আকর্ষণ আছে, ভয়ও হয়। এর মানে কি?

ঃ তারার আকর্ষণ জ্ঞানমার্গের সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। সময়ে ওটা পরিস্ফুট হবে। ভয় এলে ভগবানের নাম করবে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করবে; তিনিই রাস্তা দেখিয়ে অভয়পদ পাইয়ে দেবেন।

ঃ প্রথমে ভক্তি, তারপর জ্ঞান,—এটাই কি ভগবৎসংস্কারের সহজ পরিণতি?

ঃ সাধারণতঃ। কিন্তু মানুষের এমনই সংস্কার-বৈচিত্র্য যে রাজপথ ধরে কেউ চলতে পারে না। কানামাছি খেলার মতো; চোখ বেঁধে ভুল করে করে চলছি। অথবা ভুলও নয়, কারণ এটা খেলা। সব ভুলচুকের পিছনে সতত রয়েছে প্রেমময়ের প্রেমদৃষ্টি। গান ধরেন,—

> আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ;
> আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
> চির-আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ;
> (আমি)—দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।

ঃ এই বিশ্বাস আসে না কেন? তাঁর উপর সব কিছু ছেড়ে দিতে পারি না কেন? মনটা কেবলই সন্দেহদোলায় দোল খাচ্ছে।

ঃ ওটাও তাঁরই দান, তা নইলে লীলা জমবে কেন?

> তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ।
> তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব॥

তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া।
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া ॥
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে।
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ ॥

॥ ৪ ॥

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ক্ষেপু ধাক্কা দিয়ে বলে, 'দেবলচন্দ্রের ঘুমের আর শেষ নেই; গাড়ীতে ঘুম কিছু কম হয়েছে? ওঠ্, সব ঠিক হৈ; স্বামীজী সব ব্যবস্থা করে দিলেন। পুরুত দুজনা নিচ্ছি; একজন দয়ালদার জন্য, একজন আমাদের জন্য।' তথাস্তু বলে বেরিয়ে পড়ি···প্রথম ফল্গুতে স্নান। ফল্গুর বৈশিষ্ট্য আছে; বাস্তব পরিবেশের চাপে মনে নির্বেদ আসে, ভাবি তাঁদের কথা চিরদিনের জন্য যাঁরা আমাদের মায়া কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন—যমদুয়ারে দাঁড়িয়ে নচিকেতা। অসীম দেশ ও অনন্ত কালকে ডিঙিয়ে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাই শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান—

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া ॥
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধা কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্ ॥
ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোঁকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্ ॥

মনে পড়ে বুদ্ধদেবের মৈত্রীমন্ত্র—

পুরত্থিমায় দিসায়, দক্খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়,
উত্তরায় দিসায়···সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা
···সব্বে অরিয়া, সব্বে অনরিয়া, সব্বে দেবা, সব্বে মনুস্সা,
সব্বে অমনুস্সা···অবেরা হোন্তু···সুখী অত্তানং
পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু—
পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর যেখানে যে জীব, প্রাণী, ভূত, আর্য, অনার্য, দেবতা,

মনুষ্য, অমনুষ্য আছে, সকলে শত্রুহীন হোক, সুখে বাস
করুক, দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

বিশ্বের বেদনায় যাঁর চিত্ত মথিত হয়, ভুবনত্রা র তৃপ্তির জন্য যিনি তর্পণ করেন, তিনিই প্রবেশাধিকার লাভ করেন মৃত্যুর 'অন্ধং তমঃ' পেরিয়ে বিষ্ণুপাদপরশের অমৃতধামে···যেখানে 'মধু বাতা ঋতায়তে ধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'।

চাঁদের নাকি আমরা একটি মুখই দেখি; ষোলকলায় পূর্ণিমা, ষোলকলায় অমাবস্যা; জীবন ও মরণ; ওপারে কী? অমৃত?···কে জানে? আমাদের খেলা শুধু তিথি নিয়ে···তারপর তিথিশ্রাদ্ধ···কিন্তু কী মহিমময় দৃষ্টি! কল্যাণময় মহান্ আদর্শ! তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্!··প্রাচীনদের সম্বন্ধে আমাদের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই···যবনদের কাছে অপরাবিদ্যার ছিটেফোঁটা শিখে গর্ব অনুভব করি; লাভ কী হচ্ছে? শুধুই বিভেদ সৃষ্টি! কৃষ্টি, অবদান; প্রাদেশিক সীমা, প্রাদেশিক ভাষা, প্রাদেশিক সাহিত্য···বৈশিষ্ট্য? কেবলই ভেদবুদ্ধি, কূপমণ্ডুকত্ব nothing like leather! যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমরা সকলকে এড়িয়ে চলি, ভালবাসতে পারি না, তার দাম কতটুকু? ক'দিন সে টিকে থাকবে? মূঢ়তা। প্রাচীনদের দূরদৃষ্টি ছিল। শাস্ত্র আর কজনা পড়ে? বহুধা বিভক্ত এই ভারতীয়দের কি করে এক করা যায়? তীর্থই একীকরণের পুণ্যবেদী। পতিতপাবনী গঙ্গা, মোক্ষদায়িনী কাশী, ভক্তজনসেবিত বৃন্দাবন,···আর ত্রিভুবনতৃপ্তির তর্পণক্ষেত্র গয়া···সকলেই আসেন। ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে ভাষা-বর্ণ-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আসেন গয়া তীর্থে সর্বজীবের কল্যাণকামনা নিয়ে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বজীবের জন্য প্রার্থনা করেন, 'অবেরা হোন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু'। মৈত্রীভাবনা করেন,

দিট্‌ঠা বা যেব অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা॥

দৃষ্ট, অদৃষ্ট, দূরবাসী, অদূরবাসী, জন্ম যারা নিয়েছে বা নেবে সকল সত্ত্বই সুখী হোক। শান্তিবারি সিঞ্চন করে সর্বজীবের জন্য মন্ত্র পড়েন—

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥

॥ ৫ ॥

বিকেল বেলা বিশ্রাম করাই ঠিক হলো, থকে গিয়েছি সবাই। দয়ালদার আজ বেশ প্রসন্ন ভাব। ক্ষেপু তো সদানন্দ; প্রাণের প্রাচুর্যে সদাই চঞ্চল; পুরাণ-

ইতিহাসে অগাধ বিশ্বাস ; সুখী। সন্দিগ্ধচিত্ত আমি, সোয়াস্তি নেই কিছুতেই, অনর্থক বাজে প্রশ্ন উঠিয়ে অশান্তি ডেকে আনি। ক্ষেপুর ও বালাই নেই ; উপুরির টাকা সম্বন্ধেও নিঃশঙ্ক। রাজা উজির থেকে আরম্ভ করে চাপরাশী আর্দালী পর্যন্ত সর্বস্তরে যে জিনিস চালু তার যে বিষদাঁত থাকতে পারে তা ওর জানা নেই। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস আছে, নামে রুচি আছে, কীর্তনে অশ্রুপুলক হয়। আমি ঠিক উলটো। সেদিনের কথা ; সকাল বেলা চা খেতে খেতে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ধ্যানস্তিমিত শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির দিকে চেয়ে তৃপ্তি বোধ হচ্ছিল। পাঁচুদা সতৃষ্ণনয়নে ঠাকুরকে দেখছেন—ভক্তিভরে নয়, ওরকম একটি ক্যালেণ্ডার কি করে হাত করা যায় এই চিন্তায়। বৃথা চিন্তা, কারণ আমি পেয়েছি পোষ্টমাষ্টার বাবুর অনুগ্রহে…খ্যাঁচ্ করে একটা শঙ্কা ওঠে ; তাই তো, ক্যালেণ্ডারটি সত্যিই লোভনীয়, কিন্তু পোষ্টমাষ্টার বাবু পেলেন কোথায়? নিশ্চয় চোরাই মাল। আমার রাখবার অধিকার আছে কি? আমি তো আর চুরি করি নি, দান হিসাবে গ্রহণ করেছি। চোরাই মাল দান করা যায় কি? গুড্ সিটিজেনের কর্তব্য চোরকে ধরিয়ে দেওয়া। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'—উভয়েই পাপের ভাগী। ক্যালেণ্ডারটির সদ্গতি করতে হয়…ভেবে দেখি, সদ্গতি অসম্ভব। পাঁচুদাকে দিয়ে দেবো? আমার অধিকার নেই। ফেলে দেবো? অন্যকে চোরাই মাল ব্যবহারে সাহায্য করা হবে। ছিঁড়ে ফেলবো? দ্রব্যটি আমার নয়। পোষ্টমাষ্টার বাবুকে ফিরিয়ে দেবো? তিনি রুষ্ট হবেন ; অধিকন্তু সত্য কথাটা বলতে পারবো না। বললেও মূল প্রশ্নের সমাধান হবে না, কারণ যিনি ক্যালেণ্ডারটি পাঠিয়েছেন এবং যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁদের নামঠিকানা জানা নেই ; আর পোষ্টমাষ্টার বাবু যে ফেরত পেয়ে ওটি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন এ-আশা দুরাশা মাত্র। নামঠিকানা তিনিও টুকে রাখেন নি। আমার কর্তব্য অপরাধীকে পুলিশের হাতে দেওয়া। কিন্তু অপরাধ প্রমাণসাপেক্ষ, প্রমাণাভাবে দণ্ডনীয় হবো আমি। অধিকন্তু ধরিয়ে দেওয়ার সৎসাহসও নেই আমার…না, দানগ্রহণের পাপ থেকে আমার নিস্তার নেই ; অশেষ সঞ্চিত পাপের এক কোণে ওটিও চিরদিনের জন্য জমা হয়ে থাকলো। …এই জন্মের ও জন্মান্তরের অঙ্কুশরূপী ক্যালেণ্ডারটি এখনও দেয়ালে ঝুলছে, মাঝে মাঝে 'ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ' বলে পরমহংসদেবকে প্রণাম করি।… কতো ভাবেই যে মনে জট পাকিয়ে থাকে! ক্ষেপু আছে ভাল। নির্দ্বন্দ্ব সবল মন, দৃশ্যমান রাজপথ ছাড়া পথ জানে না ; পিণ্ডদান, উর্ধ্বদেহ, প্রেতদর্শন,

সব কিছুই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে···আমি শঙ্কা তুলেছিলুম, প্রেতলোক আছে কিনা; উত্তর দেয়—

: গোসাঁইজীর (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর) জীবনীতে আছে, বিলেতফেরত সাহেবী মেজাজের এক বাঙ্গালী বাবু পুরুত দিয়ে পিণ্ড দেওয়ার সময় মৃত পিতার প্রেতাত্মা দেখেছিলেন।

: তাঁর মনের কল্পনা।

: তোর রক্ত গরম আছে কিনা, তাই নাস্তিক হয়েছিস; বয়সে যখন ভাটা পড়বে তখন হরিসভার মেম্বর হয়ে তিলক কাটবি।

: আমার পক্ষেরই সমর্থন করছিস। বিলেত যাক আর না যাক, মানুষ সংস্কারের দাস; শেষ পর্যন্ত চিরাগত সংস্কারই প্রবল হয়, যার ফলে প্রেতদর্শন সম্ভব ও সহজ হয় কিন্তু প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

: তোর মাথা খারাপ না কি? চোখ চেয়ে জলজীয়ন্ত মূর্তিটি দেখলো, আর প্রমাণ হলো না?

: দেখেছেন বিলেত-ফেরত ক্লিষ্ট-বিবেক বাঙ্গালী বাবু; সবাই তো আর দেখে নি?

: ইংরেজী বিদ্যার ঐ দোষ—হস্তিমূর্খ করে ছেড়ে দেয়। তোর—

দয়ালদা তর্কের মোড় ফিরিয়ে বলেন—

: জীবের তিনটি দেহ; জাগ্রৎ দেহ—স্থূল; স্বাপ্নিক দেহ—সূক্ষ্ম; সুপ্ত দেহ—কারণ। মৃত্যুতে স্থূলদেহ পরিত্যক্ত হয়, থাকে সূক্ষ্মদেহ বা প্রেতাত্মা। মনকে যেমন চোখ দিয়ে দেখা যায় না, তেমনি মনোময় প্রেতাত্মাকেও স্থূলদেহের ইন্দ্রিয় (চোখ) দেখতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ, 'প্রেত' মানে প্রকৃষ্টরূপে গত; সুতরাং পৌর্বদেহিক স্মৃতি তার থাকে না, যেমন স্বপ্নাবস্থায় আমরা জাগ্রৎ অবস্থার (এই স্থূল জগতের) সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি না। এর নাম স্থানিধর্ম; অর্থাৎ দেহ তিনটি প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ ধর্মদ্বারা আবদ্ধ, নিজের নিজের রাজ্যে বিচরণ করে, এবং তৎতৎ স্থানের ভোগ গ্রহণ করে। জাগ্রৎজীব স্থূলভুক্, স্বাপ্নিক জীব সূক্ষ্মভুক্, সুপ্তজীব কারণ বা আনন্দভুক্। কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল আলাদা, এক রাজা বা রাজার প্রজা অন্য রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না। ঢুকলেই সেই রাজ্যের অধীন হয়ে যায়।

ক্ষেপু: তা হলে শ্রাদ্ধ করে লাভ কী? প্রেতাত্মার সঙ্গে যদি যোগাযোগই না হলো—

দয়ালদা : আছে লাভ। প্রথমতঃ জন্মান্তরবাদের প্রতিষ্ঠা।

আমি : কী প্রয়োজন ? পাশ্চাত্যরা তো জন্মান্তর না মেনেও বেশ সুখেই আছে। জন্মান্তর ধারণ করে আমরা যে খেলা খেলে চলছি, তারা এক জন্মেই তাকে শেষ করে দেয়। তারা বলতে পারে, "মূঢ় তোমরা, বা মুগ্ধ : যে কাজ এক ঘণ্টায় আমরা সারি তার জের টেনে তোমরা শতজন্ম চল। এজন্যই তোমরা চিরকাল অকেজো থেকে যাচ্ছ।"

দয়ালদা : পাশ্চাত্যদের এই যুক্তি সার্থক হতো যদি জন্মান্তরবাদ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেই শেষ হতো। ভারতে ধর্মমত আছে অনেক, কিন্তু সকলেই মোক্ষবাদী। এক জন্মে মোক্ষলাভ হয় না।

আমি : হয় না কেন ?

দয়ালদা : টিকিট করে সার্কাস দেখতে এসেছি, ভেঁপু শুনেই চলে যাবো ? বাঘের খেলা, কতো কি আছে। গীতার ভাষায়—অনেকজন্মসংশুদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্। জন্মান্তরবাদ মোক্ষবাদের ভিত্তিস্বরূপ, আর মোক্ষবাদ ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ।

আমি : প্রশ্ন তবুও থেকে যায়।

দয়ালদা : জানি। যেমন মোক্ষ সত্যিই আছে কি না। বৈদিক ঋষির সাক্ষ্যই এখানে প্রমাণ ; তিনি বলেছেন—

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্।

ক্ষেপু : প্রেত সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররা যা লিখে গিয়েছেন তা কি—

দয়ালদা : শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা কতকগুলো মনগড়া কল্পনা নিয়ে চলি। শাস্ত্র চোখ খুলে দেয়, আবার অন্ধও করে। বিদ্যা চিরদিনই গুরুগম্যা। সৎগুরুর নিকট শাস্ত্র পাঠ না করলে তাৎপর্য ধরা যায় না ; আবার বিচার-ধ্যান না করলে তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

আমি : শাস্ত্রের তাৎপর্য বুঝবার জন্য সদ্গুরু প্রয়োজন, কিন্তু সদ্গুরু চিনবো কি করে ?

দয়ালদা : শাস্ত্রে লক্ষণ দেওয়া আছে, মিলিয়ে নিতে হয়।

আমি : শাস্ত্র বুঝবার জন্য সদ্গুরু, আর সদ্গুরু চিনবার জন্য শাস্ত্র—একে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বলে।

দয়ালদা : তা বটে। তবে অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে যে নিয়ম, পরা বিদ্যা সম্বন্ধে তা খাটে না। ব্যাকরণতীর্থের নিকট যেমন ব্যাকরণ শিক্ষণীয়,

শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষণীয়। মুশকিল হচ্ছে এই যে এমন কোনো সংস্থা নেই, হতেও পারে না, যেখান থেকে শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠের উপাধি লাভ করা যায়।

আমি : তবে আমাদের গতি কী হবে?

দয়ালদা : ভগবানের শরণাপন্ন হও। ব্যাকুলভাবে ডাকলে তিনিই গতি করে দেন। যদি তোমার শুদ্ধ সংস্কার থাকে, যদি সত্যিকার 'জিজ্ঞাসা' জীবনে দেখা দেয়, তবে তিনিই সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেবেন। আধ্যাত্মিক জগতের এটা অমোঘ নিয়ম।

আমি : নিয়ম যে আছে তার প্রমাণ কী?

দয়ালদা : আছে প্রমাণ, বিবেকচূড়ামণিতে ভগবান্ শঙ্কর আশ্বাস দিয়েছেন, যাঁরা মুমুক্ষু দেশ-কাল-পাত্র তাঁদের সহায় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রমুখ মহাপুরুষদের জীবন দেখো; প্রয়োজন ও জিজ্ঞাসার আকর্ষণে গুরু নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিয়ম হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক; সম কারণ বর্তমান থাকলে সম কার্য উৎপন্ন হবেই। আসল কথা কি জান? কামনা দ্বারাই আমরা জগৎ সৃষ্টি করি ও জাগতিক বিষয় ভোগ করি। যদি অকামতা এসে যায়, কে জগৎকে ধরে রাখবে! ভোগাপবর্গের অলঙ্ঘ্য এই নিয়মের শাসনে জগৎ-সংসার চলছে, এর অন্যথাভাব অসম্ভব। সন্ধ্যার মন্ত্রে পড়েছ, মনে আছে তো? ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত, সত্যও যেমন আছে তাকে লাভ করবার ঋত বা নিয়মও তেমনি আছে। অবিনাশী সত্য, অমোঘ নিয়ম।

ক্ষেপু : অনেক কিছুই বললে, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পেলুম না। পিণ্ডদানে পিতৃলোকের উপকার হয় কি না, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁদের নিকট পৌঁছয় কি না—

দয়ালদা : প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু যা দৃষ্টফল তা হচ্ছে তোমার নিজের তুষ্টি ও পারমার্থিক কল্যাণ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের সম্বন্ধে মৈত্রীভাবনা দ্বারা তোমার চিত্তের প্রসার এবং শ্রেয়োলাভ। প্রেতের জন্য যে প্রেততত্ত্ব আলোচনা করে সে বড় জোর ভূতের ওঝা হতে পারে, ঈশ্বরের দিকে এগতে পারে না।

ক্ষেপু : অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও সাধু-মহাত্মা প্রেতলোক সম্বন্ধে বই লিখেছেন; প্রমাণ দ্বারা—

দয়ালদা : ভূত প্রেতের প্রসঙ্গ ছাড়। শাস্ত্রাদিতে প্রেতযোনির যে বিবরণ আছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈরাগ্যভাবনা। জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে যখন এতো কষ্ট তখন সর্বথা মুক্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত—এই হলো তাৎপর্য। ভগবানের নাম নেও, তাঁর শরণাপন্ন হও; পরম শান্তি পাবে। এসো নাম করি—

হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণগোবিন্দায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

॥ ৬ ॥

ভোররাত্রে দয়ালদা প্রভাতী গাইছেন—

যামিনী বিগত, জাগিল জগত, মনোরবি কত ঘুমে
পাখীকুল মিলি গায় হরিবুলি মধুর মধুর তানে॥
প্রভাত সমীর মন্দমন্দ বয়ে, প্রেমে অন্ধ হয়ে ফুল গন্ধ নিয়ে,
দ্বারে দ্বারে যায় হরিগুণ গেয়ে, (কতো) অমিয় ঢালিল প্রাণে॥
নিশির শিশির বিন্দু বিন্দু পড়ে, তরুদল যেন অশ্রুবিন্দু ঝরে।
তরুণ অরুণ হাসে কুতূহলে, চাহিয়া শ্রীমুখ পানে॥

প্রভাতী সুরে উষাকীর্তন ; পাখীদের আলোকলগনে জেগে ওঠার তান, প্রভাতী পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, শ্বেতচন্দনের ন্যায় পবিত্র। ভৈরব রাগে পাই প্রাতঃ-সমীরণের স্নিগ্ধ পরশ আর অরুণালোকে শিশিরের ঝলমলিয়ে ওঠা। প্রভাতী সুরে অধিকন্তু আছে অতীত ও অনাগতের মূর্ছনা, পিছনে-ফেলে-আসা পথের সুখদুঃখময় স্মৃতি আর আনন্দোজ্জ্বল আগমনীর পূত পাদক্ষেপে শ্বেতকমলের বিকাশ। দয়ালদা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে গেয়ে চলছেন পরমপুরুষের সন্ধানে পথ চলার কথা—

সারানিশি জাগি ব্যাকুল অন্তরে গ্রহশশী আসি খুঁজি গেল যাঁরে।
(তুমি) বিষয়রসে ভুলি রহিলে কি বিবে, ভুলেছ পরম ধনে॥
সাগর উছলে যাঁর প্রেম রসে, ত্রিলোক পাগল যাঁহার উদ্দেশে।
গঙ্গাযমুনা আর সরস্বতী ধাইছে তাঁহারি পানে॥

সারারাত চলেছে গ্রহনক্ষত্র, উদ্বেল সমুদ্র, ত্রিবেণীর কলস্বন। যোগিয়াতে গান ধরে বিশ্ব পাড়ি দেয় রাত্রির মহাসিন্ধু; শুকতারা বিদায় নেয় রামকেলির স্তব্ধ ব্যথায়; আনন্দ ভৈরবের আনন্দে পূবের আকাশে রক্তিমাভা; জাগরণের মঙ্গল সুরে বাজে তারক ব্রহ্ম নাম—

ভাঙ্গ মায়া ঘুম, জাগরে জাগরে, তারক ব্রহ্মনাম জপরে জপরে।
লহরে লহরে বল হরে কৃষ্ণ হরে, আরাম পাইবি মনে ॥

...জন্ম মৃত্যুর অগণিত ঢেউ ঠেলে যুগের পর যুগ চলেছে অসীমের সন্ধান ; অসংখ্য রাত্রির ওপারে হয়তো আমাদেরই প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়িয়ে, সকল *গানের পরপারে...ভ্রান্ত হয়ে খুঁজি তাঁকে এপারের গন্ধবিধুর সমীরণে। এরই* বা কতটুকু ধরে রাখতে পারি! জন্মজন্মান্তরের অধুনা-বিস্মৃত পান্থশালায় কতো লোককে ভালবেসেছি বা ভালবাসতে চেয়েছি কিন্তু পারি নি...ক্ষণিকের প্রাণ-দেওয়া-নেওয়া, ব্যর্থ আকূতি, ঘাসফুল, ঘাসের বুকে চোখের জল... খড়কুটো...flotsam and jetsam...কোথায় লুকিয়ে গেল...স্মৃতিটুকুও আজ নেই...ভৈরবীরাগিণীর বেদনাপ্লুত 'ও সে কেন আসে না'। মহাকাল সব কিছুই গ্রাস করেন...সৈকতে বসে যাদের সঙ্গে বালির ঘর বানালুম তারাও সরে পড়েছে ; যারা আছে তারা 'ধুলো খেলা খেলবে না আর বিষয় রসে মন মজেছে'। কেউ গেছে গ্রহান্তরে, কেউ বা এখানে থেকেও গ্রহান্তরে...সে দিন মাণিকের সঙ্গে দেখা দক্ষিণেশ্বরে ; কোথায় মাণিক ? অফুরন্ত হাসি, অজস্র প্রাণ, অনাবিল আনন্দ ; মাণিক সত্যিই মাণিক ছিল। ছিল, আর নেই। আলো নিবে গিয়েছে ; মাণিক আজ পাথর!...কমিশনার সাহেবের মেমকে পাগলা ঘোড়ার কবল থেকে বাঁচিয়েছিল ; চাকরি দেওয়ার জন্য কতো সাধাসাধি, নেয় নি। দেশের কাজ করবে। করতোও প্রাণ দিয়ে। এক সাহেব অধ্যাপক বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে কি-একটা মন্তব্য করেছিল, জবাবে দিল প্রচণ্ড এক ঘুষি...কী সেবাই না করতে পারতো ; ও ঘরে এলেই রোগী ভুলে যেতো সব জ্বালা-যন্ত্রণা...মাণিক এখন পাথর...টাকা-টাকা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকা হি পরমং তপঃ। সব কিছুই এমনি পাথর হয়ে যায়, শুধু চলে গঙ্গার অবিশ্রাম প্রবাহ। ভাল যাদের বাসলুম তাদের আজ চেনাই যায় না, বল্মীকের ভিতর গা ঢাকা দিয়েছে...ভোলাদা এখন অত্যন্ত হুঁশিয়ার। ফুটবল, ক্রিকেট, গুলিখেলা, কাবাডি, বাইচ খেলা—সব কিছুর প্রাণ, আর সব কিছুতেই 'ফার্স্ট'। ছোটবেলার গান অধিকাংশ ভোলাদার কাছে শোনা। পুকুর ধারের গাছটা এখনও আছে, একটা ডাল জলের দিকে নোয়ানো ; সেখানে বসে ভোলাদা গেয়েছিল—পাখি ঐ যে গাহিল গাছে। কাল-বৈশাখীর এক সন্ধ্যায় লাল মেঘের ছটা দেখে গেয়েছিল—সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা। 'ঐ দেখা যায় ঘরখানি' অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত

ঘরখানির দেখা পাই নি। আজি এসেছি, আজি এসেছি, বঁধু হে, নিয়ে এই হাসিরূপ গান; যদি পরানে না জাগে আকুল পিয়াসা চোখের দেখা দিতে এস না; আমি তোমারই আশে বসে আছি বলে তাই কি দেখা দিলে না দিলে না; আমার যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে অবসর কৈ হলো না; গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে (সখিরে); ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল, আর এল না; ধুলো খেলা খেলব না আর, হরিনামে মনে মজেছে; বাঁশরী বাজিল যমুনায়, তোরা কে কে যাবি আয়; ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী; (বলি) ও কুব্জার বন্ধু, হরি! আজ হতে রাধানাথ আর বলবো না হে; আর কবে দেখা দিবি মা, হররমা; দীনতারিণী তারা···পুরনো দিনের এই গানগুলো এখন আর কেউ গায় না···এরা এখন music when soft voices die; রেশগুলো শুনি oft in the stilly night, অশরীরী এই বন্ধুদের দেখা পাই যখন

Sad Memory brings the light
Of other days around me.

ভাবতুম, ভোলাদা বড়ালের মতো গাইয়ে এবং রণজিৎসিংজীর মতো খেলোয়াড় হবে, আর পরীক্ষার কাঁটাবেড়াগুলো তো এক লাফে ডিঙিয়ে যাবে······ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এক ধাক্কা খেয়ে পাঠশালার পণ্ডিতি, পাটের দালালি, জমিদারের সেরেস্তায় তহসিলদারি, জীবনবীমার এজেন্টগিরি, কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি, ইত্যাদি অসংখ্য বেড়া পার হয়ে বর্তমানে মাড়োয়ারীদের ২নং খাতা লেখে; এই কাজে নাকি বেশ হাত পাকিয়েছে···দেখা হলো সেদিন ট্রামে—দুর্ভেদ্য প্রাচীর! এই সেই ভোলাদা ?···খেলার সর্দার জগাদা!······ ন্যাকড়া দিয়ে বল বানানো, ক্রিকেটের ক্রীজ্ তৈয়ার করা, ফুটবলের গায়ে চর্বি মাখানো, কাঁঠালের তক্তা দিয়ে ব্যাট বানানো—এসব কিছুতে ছিল সিদ্ধ-হস্ত। খেলার জিনিসপত্র রাখতো নিজের হেপাজতে; মাঠে হুইস্‌ল্ দেওয়ার অধিকার আর কারু ছিল না, কেউ সাহসও করতো না এই একচেটে অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে। একদিন সকালবেলা আমাদের সবাইকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি একটি শেওড়ার দাঁতন দিয়ে বললেঃ আমাদের পুকুরপাড়ে যে মহাবীর সর্দার ও তার সঙ্গী বেহারা থাকে ওদের বাড়ী কোথায় জানিস? ছাপরা। ওরা রোজ দাঁতন করে; ঐদেশে আশি বছরের বুড়োও দিব্যি কটরমটর ডালমুট-বুটভাজা খায়। আর আমরা? চল্লিশের কোঠায় পা

দিতে না দিতেই চালশে আর ফোকলা দাঁত। নে, দাঁতন কর। ফোকলা দাঁতে স্বরাজ হয় না।···চাকরি পেয়ে মন্ত্রদাতা নিজেই মন্ত্র ত্যাগ করলো বিলিতি দাঁতের বুরুশ ও পেইস্ট্-এর মোহে। রাস্তায় একদিন দেখা; দাঁত-গুলো ঝকঝক করছে; বললে, ডেন্টিস্ট দিয়ে দাঁত চাঁচিয়েছি, রোজ চারবার করে বুরুশ করি। হিংসা হলো; জগাদার পদাঙ্কানুসরণ করবার প্রচণ্ড লোভের কথা আজও মনে পড়ে। আমি তখনও কলেজে পড়ি; পয়সার অত্যন্ত অভাব, বৈকালিক টিফিনের বরাদ্দ দু-পয়সার মুড়ি-মুড়কি থেকে কিছু বাঁচানো অসম্ভব; আর অভিভাবকের নিকট এজাতীয় বিলাসিতার আবদার করলে প্রাপ্তি হতো চপেটাঘাত। ক্বচিৎ কখনও ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ পেলে পরের দিন চার পয়সার পুরি-হালুয়া; কী মিষ্টিই লাগতো হালুয়া! ভাবতুম, চাকরি পেলে কেবল হালুয়াই খাবো!···একদিন শুনি জগাদা দাঁতগুলো সব ফেলে দিয়েছে! আপদের শান্তি এতেও হলো না, ফোকলা হওয়ার পর পেটের অসুখটা বরং বেড়েই গেলো। অদৃষ্টের পরিহাস! ডাক্তার ডেথ্-সার্টিফিকেট দিয়ে বললেন, দাঁতের উপর অযথা অত্যাচারের ফলে গ্রহণী হয়েছিল।···লোকান্তর থেকে জগাদা হয়তো দেখছে, দন্তুরদের জন্যই স্বরাজ!···কেষ্টদা: কী জ্বালাতনই না করতো! 'আউট্' হলে ব্যাট্ নিয়ে পালাবে; গোল্-এ রাখলে ব্লাডার ফুটো; পরীক্ষার হলে খাতা না দেখালে টেনে নেবে; ল্যাং মেরে পটকে দেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিয়ে করে প্রথমে দোকান দিলো; ঘিয়ের বাতি জ্বালিয়ে হলো **K. C. Addy, M. D. (Homoeo), Philadelphia**। কিছুদিন পরে দেখি পেশা ও নাম দুটোই বদলে গেছে! শ্রীকৃষ্ণকবিরাজের বিখ্যাত শূলান্তক বটিকা এবং অগ্নিপ্রজ্বালক চূর্ণের কথা কে শোনে নি? শিবদত্ত বৃহৎ ব্যাঘ্রনাদ গুগ্‌গুলুবটিকা স্ত্রীর উপর পরীক্ষা করে বিপত্নীক হয়, ও অন্য রাস্তা ধরে। এবারে কেষ্টা ফকীর; কৈলাসাশ্রমের সন্ন্যাসী প্রদত্ত নিস্তারিণী মাদুলী, মুস্ত্ আফা জয়ন্-উল্ ফকীরের স্বপ্নলব্ধ ইলেক্‌ট্রিক তাবিজ, শ্মশান-সাধক পৌণ্ড্র কাপালিকের নরকপালভস্ম, কামাখ্যা হতে আহৃত নাগরাজমণি ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্যের বেসাত নিয়ে বেশ দু-পয়সা কামিয়েছিল···বদখেয়ালে উড়িয়ে দিল সব। কেষ্টদার 'মটো' (motto) ছিল "ভেকে ভিক্"। ভেক্ বদলে বৈষ্ণবী নিয়ে আখড়া খুলে নাম নিলো প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী। অনেক নাকি মন্ত্র-শিষ্য; কীর্তন গায় ভাল; করে খাচ্ছে এখন।···ভুখ্, ভেক্, ভিক্; কেন যে ভগবান্ ক্ষুধার জ্বালা দিয়েছিলেন! ক্ষুধাই অশেষ পাপ; ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমরা কী যে না করি···

গোষ্ঠে যাদের সঙ্গ পেয়েছিলুম তারা থেকেও নেই, এই জন্মেই জন্মান্তর নিয়েছে। পুকুর ধার, খেলার মাঠ, আম গাছের ছায়া, বাগানের কালো ঝোপ, ক্ষেতের আল, মাঠের বুকে পায়ে-হাঁটা রাস্তা, রোদ-বৃষ্টি, মেঘের কোলে মেঘ, নৌকাবিহার, আকাশ-প্রদীপ, সাঁঝের তারা—সব কিছুর সঙ্গেই পরানসখাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। জ্যান্ত মানুষগুলো মরে গেছে, মৃত যারা তারাই বেঁচে আছে হৃদয়ের নিভৃত কোণে···কতো জোনাকি জ্বলে সেখানে···আমার ভাইপো হাবুল সেদিন বলছিল তার বন্ধু রতনের কথা, পদ্মা নদীর আবর্তে রতনের এক সতীর্থ ডুবে যাচ্ছিল, তাকে বাঁচাতে গিয়ে রতন-ও ডুবে গেলো, তলিয়ে যাওয়ার আগে হাতজোড় করে বলে, "বিদায় দেহ ভাই"···রতনের সঙ্গে কোনো দিনই দেখা হয় নি, কিন্তু আমি যেদিন এ সংসার থেকে বিদায় নেবো সেদিন রতনকে বলে যাবো—

বিদায় দেহ ভাই,
তোমাকে আমি প্রণাম করে যাই।

রতন, ক্ষুদিরাম···ফাদার ডেমিয়ন্···মণিদা, মাণিক···আর যাদের সঙ্গে পরিচয় হলো না···সকলেই বুক জুড়ে থাকে হৃদয়ের বহুমুখী আকর্ষণে। কিন্তু ক-জনাকেই বা জানলুম, ক-জনারই বা ভালবাসা পেলুম, ক-জনাকেই বা ভালবাসতে পারলুম! শত্রুকেই কি মন থেকে উপড়ে ফেলা যায়? মিলন-বিরহের জট খুলছি দিনের পর দিন—ট্র্যাজিকমেডি (tragi-comedy) ; আর ট্র্যাজিডি (tragedy) হচ্ছে এই যে বুকে শেল হানে তারাই ভাল যাদের বাসা যায়! সোক্রাতেস (Socrates)-কে তারাই বিষ খাওয়ালো যাদের কল্যাণ তিনি চেয়েছিলেন আজীবন ; বিশ্বজনকে ভালবেসে যিশু হলেন ক্রুশ-বিদ্ধ···প্রেমের ক্রূর বঙ্কিম গতি!···কিন্তু মাণিক পাথর হয়ে যায় কেন? চলার পথে আর কি সে ঝলকে উঠবে? পথিকজন পাষাণ ভেবে হয়তো তাকাবেও না! পাষাণী অহল্যা রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে জীবন্ত হয়েছিলেন···'আমার প্রেমের লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ; প্রেমের পরশে মাণিক আবার জ্বলে উঠবে? আলো বিকিরণ করবে শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমস্পর্শে?···পিছনের টানে এগনো যায় না। কতো সঙ্গীকেই তো হারিয়েছি, এজীবনে, জন্মজন্মান্তরে···সঙ্গী হমরে চলে গএ হমহুঁকো চলনা···সাথী শুধু আকাশের তারা···রাত হলেই ভিড় জমে ; যেন একদল শিশু, পাশে দাঁড়িয়ে প্রেমবিদ্ধ যিশু···অমিতাভের সকরুণ আঁখি ফোটে নীলসাগরের বুকে···অন্তহীন প্রশ্ন হয়ে মিটমিট করেন সোক্রাতেস, পদতলে

নতশির প্লাতো···ঐ নক্ষত্রস্তবকে দেখি নানকের শ্মশ্রুপূর্ণ প্রশান্ত আনন আর মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় সাধুজন···সন্ত বার্ণার্ড···সন্ত ফ্রান্সিসি···সন্ত ইগনেসিয়স লায়লা···অগণিত তারা, অনন্তের যাত্রী, অনন্তকালের সঙ্গী···কৃত্তিকা···চিত্রা··· মৃগশীর্ষ···পুনর্বসু···Pleiades···পুষ্যা···Andromeda···অনুরাধা ··· যমজভাই ক্যাষ্টর-পোলক্স্···অরুন্ধতী, বশিষ্ঠ, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি······

করিতে এ ধুলোখেলা অবসান হলো বেলা,
যারা এসেছিল সাথে ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়া লাভে মূলে মরণের সিন্ধু কূলে,
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়,
(এ) অদিনে এ-অধীনে ত্যজিবে কি অসময়।
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ॥

দয়ালদার গানে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করি, 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ' সম্ভব হয় কি করে। উত্তর দেন, "তাঁকে পেলেই সবাইকে পাওয়া হয়, তিনি যে সবাইকার অন্তরতম। তাঁকে ছেড়ে সবাইকে খুঁজলে দাঁড়াবে গিয়ে মরণের সিন্ধুকূলে হারাইয়া লাভে-মূলে। চলো সেখানে—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব হরণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন গোপনে, অতি যতনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসী জনে ॥
যদি দেখ পথে ভয়ের আঁধার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার।
(তিনি) রাজাধিরাজ প্রবল-প্রতাপ, শমন ডরে তার শাসনে।

॥ ৭ ॥

চায়ের আসরে ক্ষেপুর আজ উদাস ভাব, অর্থাৎ পূর্বদিনের পেঁড়া, কচুরি, ডালমুট, কাঠিভাজা ও ঝাল চাটনীর জের এখনও চলছে। পৈটিক অস্বাচ্ছন্দ্য এবং বৈরাগ্য ওর অবিনাভাবী। বলে, গয়াতে কী আর আছে এমন দেখবার—

নর্দমার গন্ধ, ধুলো, বালি, মশা, মাছি; আর দোকানের জিনিস তো মুখে দেওয়া যায় না।

ঃ তুই তো কসুর করিস নি কাল!

ঃ কলকাতার মতো তো আর নয়। আমার পিসে মশায় ঠিক বলেন, কলকাতা মহাতীর্থ, সর্বজীবের কামধেনু; যা চাইবে তা-ই পাবে।

ঃ কলকাতার স্বর্গ ছেড়ে তোর পিসেমশায় তবে রাঁচী গিয়েছিলেন কেন? তুই সঙ্গে ছিলি তো?

ঃ সে এক করুণ ইতিহাস। ডাক্তারের পরামর্শে তিন মাসের ছুটি নিয়ে রাঁচী এলেন, সাতদিন পর রাইট-এবাউট-টার্ন।

ঃ সাত দিন? রাঁচীতে দেখবার তো অনেক কিছু আছে।

ঃ বাজে বকিস না। পাগলা গারদ, নেতেরহাট, হুঁড্রু, জোনাহ্, ছিন্নমস্তা—এর নাম অনেক? পিসে মশায় বলেন, 'কোনও ভদ্রলোকের কাঁকে যাওয়া উচিত নয়, কারণ ওটা চিড়িয়াখানা নয়; মানসিক ব্যাধির প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার ও রোগী ছাড়া অন্য যে কেউ যায় সে হচ্ছে মূঢ়, পাগলের অধম। হুঁড্রুর নীচে গিয়ে পিসে মশায়ের হার্ট ফেইল করে আর কি! কাজেই জোনাহ্ খতম করলুম উপর থেকে উঁকি মেরে; হুঁড্রুর পর নূতনত্ব কিছু ছিলও না। নেতেরহাট? দার্জিলিং যারা গেছে তাদের কাছে নেহাতই তুচ্ছ—a tame affair; বাকী রইলো ছিন্নমস্তা—থার্ডক্লাস একটা মন্দির; দুটো নদী মিশেছে এই যা; একদিন পিক্‌নিক্ করা যায়, কিন্তু ঐ ম্যালেরিয়ার ডিপোতে দু-এক ঘণ্টার বেশী থাকা নিরাপদ নয়।' এই হচ্ছে পিসে মশায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সুচিন্তিত অভিমত; সুতরাং রিটার্ন টিকিট না কাটাই বেকুবী হয়েছিল।

ঃ মুরাবাদির মাঠ?

ঃ গড়ের মাঠ বোধ হয় তুই এখনও দেখিস নি? অর্থাৎ কলকাতা হচ্ছে ভূস্বর্গ। ফুটবল, ক্রিকেট, মোহনবাগান, ডারহামস্, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং—জীবন ঐ এক নেশাতেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। ঘোড় দৌড়ের বাতিক থাকলে তো সোনায় সোহাগা। টাকা চাই? বড়বাজারে ছোটবাজারে উড়ে বেড়ায় রাত দিন, হাত বাড়ালেই উড়ন্ত টাকা ধরতে পার। ট্রাম্-বাস্-ট্যাক্‌সি, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও। থিয়েটার বায়স্কোপ? রোজ তিন-চারটে শো দেখে নেও। লেকচার শুনবে? ময়দানে, পার্কে, হলে, য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে,

হরিসভায়, ব্রাহ্মসমাজে ছেদহীন অক্লান্ত বক্তৃতা চলছে। ধর্ম করবে? নিত্য গঙ্গাস্নান, কালীঘাটে পাঁঠা বলি ও কীর্তনে মালপুয়া দুটোই চালাতে পার; তারপর রামকৃষ্ণ, ভারতধর্ম, আর্য মিশন, ভোলাগিরি, যে কোনো একটায় ভিড়ে যাও; গীতা, উপনিষৎ, ভাগবত, চণ্ডী, ভজন, কীর্তন, জয়ন্তী, মচ্ছব, অর্থাৎ ধর্মের তুফান বয়ে যাচ্ছে। পলিটিক্স্ করবে? এমন শ্রীক্ষেত্র ভূভারতে নেই—এ্যানার্কিস্ট, যুগান্তর, অনুশীলন, প্রো-চেঞ্জার, নো-চেঞ্জার; wheels and wheels; wheels within wheels; মত বদলাতে বদলাতেই জীবন শেষ করে দিতে পার। আর যদি নরকে যেতে চাও জন্ম-জন্মান্তর সাঁতার কেটে চলো—broad is the way of sin here, very broad indeed, গড়ের মাঠের মতো প্রশস্ত।...মোট কথা, কলকাতায় হাঁপ ছাড়বার সময় নেই; জীবনের প্রবল ঝড়, সাইক্লোনের মতো দিশাহীন; মরবার পর্যন্ত ফুরসত নেই। সুতরাং মৃত্যু যখন আসবে টেরও পাবে না—হঠাৎ একদিন চোখ খুলে দেখবে কলকাতা আর নেই, অন্য একটা সহর, দিল্লী...বোম্বাই... নিউইয়র্ক...শিকাগো...প্যারিস্...লণ্ডন...আবার ঝড়ো হাওয়া, উদ্দাম গতি, ঘরঘর...ঘরঘর...ঘরঘর...। তা নয়, রাঁচী! চুপ করে বসে থাক, হাই তোলো, সিগারেট ফোঁকো...stuff and nonsense! কলকাতার বাইরে মানুষ আসে? কী আছে? মাটি, পাথর, গাছ আর মোরোন (moron)।

ঃ তুই যে বিরাট এক বক্তৃতা দিয়ে ফেললি!

ঃ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। তার থেকে—

ঝড়ের বেগে ক্ষেপু বেরিয়ে গেলো। ডালমুট-কাঠিভাজা এবং লঙ্কার জের নিশ্চয়। পালসেটিলা-৩০ শক্তি।

কলকাতা ঝড়ই বটে, সদাপ্রমত্ত; প্রাসাদ, রাজপথ, ট্রাম-বাস, আলো-আঁধার, কলরব। রাঁচীতে পাহাড়, জঙ্গল, নীরবতা, আঁধারের স্নিগ্ধ-পরশ, যেন একটি তপোবন। আকাশে নীল গভীরতা, দিক্‌চক্রবালের চিরন্তন ইশারা, আকাশের গায়ে পাহাড়ের শ্যামল রেখা, মুরাবাদি পাহাড়ের প্রশান্ত শিখর; মাঠের মাঝখানে একটি গাছ...বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ! দৃষ্টি এখানে ব্যাহত হয় না, চিত্তের প্রসার কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না; ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ, ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং, ধ্যায়তীব দ্যৌঃ; পৃথিবী, পর্বত, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, সকলেই

যেন ধ্যানস্থ—ছান্দোগ্য উপনিষদের তাৎপর্যে মণ্ডিত শান্ত এই পরিবেশ। দূর হ'তে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে··· Alice Meynell (এলিস্ মেয়নেল)-এর Flock of Bells :

Sudden the cold airs swing,
Alone, aloud.
A verse of bells takes wing
And flies with the cloud.

চুটিয়ার বাবাজী মশায়ের মহাপ্রয়াণ! ওঁর পদধূলিতে রাঁচী পবিত্র। ওঁর কথা শুনেছিলুম রাঁচীর এক ভদ্রলোকের কাছে, নাম 'মাষ্টারমশায়'। এককালে মাষ্টারি করতেন; দু-দিনের আলাপেই মনে হয়েছিল অতি আপন জন, পরমাত্মীয়, বন্ধু; সজ্জন, বিনয়ী, নম্র, মিষ্টভাষী; পরমভক্ত; সাধনভজন নিয়েই থাকেন। চুটিয়ার বাবাজী মশায়ের কাছে প্রায়ই যেতেন। বাবাজীর বাড়ী ছিল টিহড়ি গাড়োয়াল; কৈশোরাবস্থায় রামায়ত বৈষ্ণব মহাত্মা বিদিত গিরির শিষ্য হয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন। আগেকার শীলচর্যা ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনবার পদব্রজে ভারত প্রদক্ষিণ করেন; শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন যেখানে যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁর নিকট—তন্ত্রশাস্ত্র ঢাকাতে; ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত কাশীতে; Hindu Law (হিন্দু ল') কলকাতায়। নব্যন্যায় পড়েন নবদ্বীপের '—রী' পণ্ডিতের কাছে, আগেকার গুরুকুলের ছাত্রদের মতো; সকালে পাঠ নিয়ে গরু চরাতে যেতেন; দুপুরে 'পাঠ'কে ভিত্তি করে চুল-চেরা বিচার; আহার ও বিশ্রামের পর পুনরায় গোচারণ; রাত্রিতে পূজা, পাঠ, ভজন। '—রী' পণ্ডিতের ছিল পানদোষ; মাত্রাধিক্যবশতঃ একদিন বলে ফেলেন, 'তোমার রামজী-ও কারণ পান করতেন'। উপাস্যের নিন্দা যে মুখ থেকে বেরিয়েছে সে মুখ থেকে আর পাঠ নেওয়া চলে না। পরদিন পণ্ডিতজীকে প্রণাম করে, আশীর্বাদ চেয়ে, বিদায় নেন।···চুটিয়াতে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরসংলগ্ন একটা চালাঘরে (lean-to shed) থাকতেন। নিজের হাতে বাগান করতেন, ফলমূল বিলোতেন। পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস, গায়ে একটি চাদর, শয্যা মেজেতে কম্বল বিছিয়ে; আহার একবেলা, বটুয়াতে ডাল-ভাত একটু করে নিতেন। বাইরেতে কঠোর বৈরাগী; অন্তরে প্রেমফল্গু। বিহারের এক রাজা এসেছিলেন রাঁচীতে, বাবাজীর খ্যাতি

শুনে ম্যানেজারের মারফত গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন; বাবাজী উত্তর পাঠালেন, 'সাধু রাজদর্শনে যায় না, ইচ্ছা হলে রাজা সাধুদর্শনে আসতে পারেন'। হিন্দুধর্মের একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী প্রচারক এসেছিলেন বাবাজীকে দর্শন করতে, অভ্যর্থনা পেলেন দু-টাকা প্রণামী সহ। প্রচারক মহাশয় কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, মাপ করবেন; আমি এসেছি আপনার পদধূলি নিতে—; বাবাজী উত্তর করেন, 'সাধুসন্ত এই আশ্রমে এলে আমার কর্তব্য প্রাচীন রীতির সম্মান করা, প্রণামী দিয়ে অভ্যর্থনা করা।'...আধুনিক গৈরিকধারীদের তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। মাষ্টারমশায় একদিন একটি 'মডার্ন' ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আশ্রমে গিয়েছিলেন; আড়ালে ডেকে মাষ্টারমশায়কে বলেন, 'কাকে সঙ্গে এনেছ, মাষ্টার বাবু? বলে দাও আজকে দেখা হবে না।'...একদিন আক্ষেপ করছিলেন, 'সন্ন্যাসের প্রাচীন আদর্শ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; স্বাধ্যায়, তপস্যা, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য, সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিয়ে আছে শুধু প্রচার ও মিথ্যাচার; সবই রামজীর ইচ্ছা মাস্টার বাবু, সবই রামজীর ইচ্ছা'। দেহ রাখবার তিন-চার দিন আগে মাষ্টারমশায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখে বললেন, 'কে? ঠিক চিনতে পারছি না। ক-দিন যাবৎ চোখ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে...ও, মাষ্টারবাবু!...আশীর্বাদ করছি, পরমার্থ লাভ হ'ক; চললুম এবারে'।

: কী যে বলেন!

: ঠিকই বলছি মাষ্টারবাবু।

: এই অসুখে একা পড়ে আছেন!

: একা তো নয়। এতোদিন রামজীর দুয়ারে...এবারে ডেকে নিচ্ছেন...

মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে এই শেষ দেখা। তিনদিন পরেই বাবাজী দেহত্যাগ করেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম বাবাজীর কোনও অলৌকিক শক্তি দেখেছেন কি না। মাষ্টারমশায় জবাব দেন, কৈ—নাতো। একটু ভেবে আবার বলেন, শক্তি ছিল না ঠিক বলা যায় না। শক্তি ছিল শুনে আমি একটু দমে গেলুম; প্রশ্ন করি, কিরকম শক্তি?

: **An abiding influence,** চিরন্তন প্রভাব।

: কি জাতীয় প্রভাব?

: স্নিগ্ধ, পূত, শান্ত; তাঁর স্মরণে গঙ্গাস্নানের ফল হয়।

॥ ৮ ॥

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের ৩৫০+৩৫০টি ধাপ ওঠা-নাবা করে বেশ পরিশ্রান্ত হয়েছি। পুনরায় চলি বিষ্ণুপাদ-দর্শনে। রামশীলা, সীতাতীর্থ, প্রেতশীলা, বুদ্ধগয়া…অনেক কিছু বাকী; দেখা যাবে ধীরে-আস্তে। অক্ষয়বটকে প্রণাম করি; মহর্ষি গৌতম ষাট হাজার বছর এই বটতলায় বসে শিবের আরাধনা করেছিলেন। গয়াসুরের তপস্যার ফল 'বিষ্ণুপাদ'; দর্শন ক'রে ফল্গুর ধারে বসি। হাঁটা-হাঁটিতে ক্ষেপুর শরীর ঠিক হয়ে গেছে, পেঁড়া-প্রসাদ ও জল খেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা দয়ালদা, তুমি তো বিষ্ণুপাদ দর্শন করে খুব কাঁদলে, কিন্তু গয়াসুরের গল্পটা পাণ্ডাদের বানানো নয় তো? সবটাই কি সত্য?' দয়ালদা রামশীলা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন; দৃষ্টি স্থির, মুখ ভাবগম্ভীর। খানিকক্ষণ পর বলেন, 'সত্য কি মিথ্যা সেটা অবান্তর প্রশ্ন ভক্তের কাছে। ভাবময় জগৎ, ভাব দিয়ে আমরা নিজের নিজের জগৎ রচনা করি। কি জাতীয় মন নিয়ে তীর্থ দর্শন করতে হয় তার চিরন্তন দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন মহাপ্রভু—যেখানে যেখানে গিয়েছেন, যে সব তীর্থ দর্শন করেছেন, সেই সেই স্থানের মাহাত্ম্য ও দিব্যভাব প্রকট হয়েছে তাঁর চিত্তে। গয়া সহরের মশা-মাছি, ধুলো-বালি যদি চিত্ত অধিকার করে থাকে, তবে তার বেশী আর কিছু লাভ হয় না; আর যদি মহাপ্রভুর পথে চল তবে হৃদয় হবে ভাববৃন্দাবন। রাস্তায় ধুলো আছে, কিন্তু কার পায়ের ধুলো? যুগের পর যুগ কোটি কোটি মানব এই রাস্তা দিয়ে চলেছে বিষ্ণুপাদে তাঁদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে; কতো দুঃখ, কতো বেদনার প্রবাহ গেছে এই পথ দিয়ে—মা-হারা ছেলে, পতিহীনা স্ত্রী, সন্তান-হারা জননী, সর্ব-হারা কাঙাল, সকলেই বিষ্ণুপাদে প্রার্থনা জানাচ্ছে, 'হে বিষ্ণু, হে গদাধর হরি! হে জগন্নাথ! হে বিশ্বম্ভর! হে ত্রিতাপহারি! অসংখ্য বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা আর সইতে পারি না: শান্তি দাও, তোমার চরণে স্থান দাও।' মিশে যাও এই জনসমুদ্রে; দেখবে—জগন্নাথের রথযাত্রা, অনাদি, অবিরাম, অনন্ত; দেখবে জনগণের বেদনা-অর্ঘ্যে বিষ্ণুপাদ সঞ্জীবিত, বিষ্ণুর করুণাফল্গু উচ্ছলিত। মহামানবের পদধূলিতে স্নান করে যে পবিত্র হয় তার চিত্তেই বেজে ওঠে প্রেমগঙ্গার কুলুকুলুনাদ। প্রণাম করো এই পথকে; এগিয়ে চলো বিষ্ণুপাদের দিকে…ঐ দেখো নেবে আসছে সন্ধ্যার পূতলগ্ন; মন্দিরে মন্দিরে বাজে মঙ্গল আরতি; আকাশ-বাতাস ধূপধুনোর সৌরভে সুরভিত…জপ করো, ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ,ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্…

জগন্নাথের রথযাত্রা! বিশ্বমানবের, গ্রহনক্ষত্রের, মহাকালে পরিচংক্রমণ!··· রথচক্রের নির্মম ঘর্ঘর ধ্বনি শুনে, মানবহৃদয়ের অগণিত ক্ষতস্রুত শোণিতপ্রবাহ দেখে, আর্তনাদ করেছিলেন শেলী (Shelley)—

'Then what is life ?' I cried.

হয় তো সহস্রশীর্ষ এক বিরাট পুরুষ এই রথে সমাসীন, তাঁরই ক্রুশ-বিদ্ধ আত্মা প্রতিজীবে চিরন্তন তপস্যায় রত। কিন্তু ক্রন্দসীর দুঃখবরষা কি কোনদিনই থামবে না? সব্বং দুক্খং দুক্খম্—কেন? এই প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব মহাতীর্থ গয়াধামে···রাজার ছেলে, সুখে লালিত, সম্ভোগে পালিত; কিন্তু মানবের অন্তহীন কান্নার ঢেউ এসে পৌঁছয় সেখানে, পারঙ্গমতার সন্ধানে বোধিদ্রুমমূলে তলিয়ে যান মহা সম্বোধিসমুদ্রে···ঊর্ধ্বে নক্ষত্রখচিত অপার সমুদ্র, ভূলোকে গয়াসুরের বক্ষে বিষ্ণুপাদ, নিম্নে যুগযুগান্তব্যাপী তপশ্চর্যার পলিমাটি স্তরে স্তরে নেবে যায় স্তব্ধ এক মণিদীপ্ত গভীরে···সন্তজন তপস্যায় ভাস্বর; গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ; মহাপ্রভুর দীপ্ত প্রেমকান্তি; অমিতাভের করুণায় ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত···ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবাতি···প্রণাম করি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে যিনি ভগবান্, অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচার সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, পুরুষদমনকারী, সারথী, দেবমনুষ্য-গণের শাস্তা, বুদ্ধ, এবং ভগবান্···ইহামুত্র শরণ প্রার্থনা করি সেই পরম কারুণিক অমিতবুদ্ধের—

বুদ্ধং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

এই সেই বুদ্ধগয়া! ভারতীয় তপশ্চর্যার পুণ্যময় বেদী! এই সেই বোধিদ্রুম! যার মূলে আসন পেতে বসেছিলেন গৌতম 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে!

সত্থা সুনীলায়ত নেত্তহারী কন্তম্বুধারা নিপাতেন সিঞ্চং।
পূজেমি তং সত্তদিনানি বোধিরাজং বিরাজং সিরসা নমামি॥

শাস্তা বুদ্ধদেব সুনীল-আয়ত-নেত্র-নিঃসৃত কান্তিরূপ জলধারায় যে বোধিরাজকে সাতদিন আরাধনা করেছিলেন আমি তাঁর বন্দনা করি।

মূলে দুমিন্দস্‌স নিসজ্জ যস্‌স ধীরো সুবোধি চতুসচ্চমগ্‌গং।
মারং জিনিত্বা সমারং মুনিন্দো তম্পাদপিন্দং সিরসা নমামি॥

যে তরুরাজের মূলে আসীন হয়ে মুনীন্দ্র বুদ্ধ সানুচর মারকে পরাভূত করে চতুরার্য্যসত্য অবগত হয়েছিলেন অবনতমস্তকে আমি তাঁর বন্দনা করি।

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থা দেবমনুস্‌সানং বুদ্ধো ভগবাতি

বুদ্ধং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

সম্যক্‌-সম্বুদ্ধ অনুত্তরগতিপ্রাপ্ত ভগবান্‌ সুগতের শরণার্থী।
স্বাক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং বেদিতব্‌বো বিঞ্‌ঞূহীতি।

ধম্মং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি॥

ভগবান্‌ বুদ্ধপ্রচারিত সদ্ধর্ম সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত, স্বসংবেদ্য, আশু ফলদানে সমর্থ, বিচারসহ গ্রহণীয়, নির্বাণপ্রাপক, এবং বিজ্ঞপুরুষ কর্তৃক প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাতব্য; সেই ধর্মের আমি শরণার্থী।

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজ্জপটিপন্নো,
ঞায়পটিপন্নো, সমীচিপটিপন্নো
সঙ্ঘং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি॥

সন্মার্গে, ঋজু অষ্টাঙ্গমার্গে, বিচারনিষ্ঠ ও অত্যুত্তম পথে ভগবান্‌ বুদ্ধের শ্রাবক সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত; আমি সেই সঙ্ঘের শরণাপন্ন।

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ১।
অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ২।
কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ৩।
মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ৪।
সুরা মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ৫।

প্রাণিহত্যা (অহিংসা), স্তেয়, মিথ্যাচার, মিথ্যাভাষণ, ও সুরাদিসেবন রূপ প্রমাদকারণ হতে বিরতি প্রার্থনা করে শিক্ষাপদ পঞ্চশীল চর্যা গ্রহণ করি। প্রণাম কার—

বুদ্ধে সকরুণে বন্দে, ধম্মে পচ্চেকসম্বুদ্ধে।
সঙ্ঘে চ সিরসা যেব তিধা নিচ্চং নমাম্যহম্॥

করুণাবতার বুদ্ধ···বুদ্ধে সকরুণে বন্দে···নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স···

'দয়ালদা তো ধ্যানে বসলেন ; চল, ঘুরে আসি,' বলে ক্ষেপু। একটু এগতেই ক্ষেপু পেয়ে গেলো কলকাতার এক বন্ধু, ভিড়ে গেল তার সঙ্গে ; আমি পরিক্রমা করি···দীঘির বাঁধানো ঘাটে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। সৌম্য মূর্তি, মনন-তীক্ষ্ণ চক্ষু ; বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। স্মিতবদনে প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে এসেছি। জবাব দিই, কলকাতা থেকে।

: কদিন থাকবেন ?

: আর দু-এক দিন।

: গয়াধাম কেমন লাগছে ?

: মন্দ নয়।

: বুদ্ধ গয়া ?

: অতি মনোরম স্থান। বুদ্ধকরুণায় ডুবে যেতে ইচ্ছা হয়।

: বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগ আছে ?

: তা ঠিক নেই হয় তো। নৈরাত্ম্যবাদ ভাল লাগে না।

: কেন ? নৈরাত্ম্যবাদে দোষ কী ?

: 'আমি'কে বাদ দিই কি করে ? বিভীষিকা মনে হয়।

: 'আমি'কে পাচ্ছেন কোথায় ?

: আমাদের সবকিছু ভাবনায়।

: যদি ভাবনাটা ছেড়ে দেন ?

: ছাড়বো কি করে ? ভাবনা নিয়েই তো জীবন।

: জীবন মানে তো বন্ধন ? ভাবনা না ছাড়লে মুক্ত হবেন কী ভাবে ?

: কে মুক্ত হবে ? আমি তো ? তা হ'লে 'আমি'কে ছাড়া যাচ্ছে কোথায় ? নৈরাত্ম্যবাদ-ই বা টেকে কী-করে ?

: টেকে ঠিকই। যে আত্মা নেই সেটি হচ্ছে পরমহংসদেবের ভাষায় 'কাঁচা আমি'। যিনি থাকেন তিনি হলেন 'পাকা আমি'।

: তবে নেই বলার সার্থকতা কোথায় ?

: প্রক্রিয়া হিসেবে সার্থক। 'কাঁচা আমি'কে আশ্রয় করেই আমাদের তৃষ্ণাত্মিকা সব ভাবনা, সুতরাং বর্জনীয়। সকল বাদীই বলেন, বিষয় ভাবনা ত্যাগ করো, অহংকার বর্জন করো। বৌদ্ধদের সাধন-প্রক্রিয়াটি হচ্ছে মূলোচ্ছেদী। যে বৃক্ষকে আশ্রয় করে প্রপঞ্চ পত্র-পুষ্প-ফলে শোভিত সেটিকে যদি এক কোপে কেটে দেন ? অর্থাৎ বৃক্ষরূপী এই অহংটি নেই, এই ভাবনা যদি করেন ? গীতার ভাষায়, অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা, ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্।

: বৃক্ষটি গেলে থাকবে কী ? অথবা থাকবে কে ?

: থাকবেন পরমাত্মা বা 'পাকা আমি'। তাঁকে ব্রহ্ম-ও বলতে পারেন, শূন্য-ও বলতে পারেন।

: কিন্তু বুদ্ধদেব 'আত্মা আছে কি না' বৎসগোত্রের এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেন নি, চুপ করে ছিলেন।

: দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রেও তো আছে, মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বম্। অনাত্মবাদ নিয়ে দার্শনিক বিতণ্ডা অনেকে করেন, কিন্তু আসলে ওটি প্রক্রিয়া, সুবিরূঢ়মূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে ছেদন করবার কৌশল। বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের নাম 'এহিপস্‌সিক', 'সন্দিট্‌ঠিক'; এসো, দেখো; অভ্যাস দ্বারা নিজে উপলব্ধি করো। সব জোরটাই তিনি দিয়েছেন সাধনার ওপর।

: তার ফলে কি বিভ্রম সৃষ্টি হয় নি ?

: হয়েছে। সেই বিভ্রম নাশ করেছেন ভগবান্ শঙ্কর। তিনি সব জোর দিয়েছেন সাধ্যবিচারের উপর। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বিচারই সাধন লাভ একই। মূল তত্ত্বও এক।

: শূন্য এবং ব্রহ্ম একই বস্তু ?

: বৌদ্ধ সাধুরা এবিষয়ে একমত নন। কেউ কেউ বলেন, শূন্য মানে প্রপঞ্চের অভাব, পাতঞ্জলের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির তুল্য, কিন্তু উদানপাটলিগামিয় বগ্‌গে বুদ্ধদেব নির্বাণ সম্বন্ধে বলেছেন, 'হে ভিক্ষুগণ! এমন একটি অবস্থা আছে যেখানে পঞ্চভূত নেই; সর্ব শূন্যতা নেই, চন্দ্র-সূর্য, ইহলোক-পরলোক নেই; যেখানে আসা-যাওয়া স্থিতি-চ্যুতি জন্ম মৃত্যু নেই; এ অবস্থা অচল, অতল, অনন্ত'। ঠিক উপনিষদের 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' অথবা 'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্'-এর মতো। 'অবস্থা' এবং 'আছে' এই দু-টি শব্দের ওপর জোর দিয়ে শূন্যকে কেউ কেউ উপনিষদের ব্রহ্ম বলেন।

: দুটো শঙ্কা ওঠে। প্রথমতঃ, বৎসগোত্রের প্রশ্নে এমনি ইতি-সূচক জবাব দিলেন না কেন?

: পুঁথিতে আছে, ভুল বোঝবার সম্ভাবনা ছিল। তা হলে ধরে নিতে হয়, উত্তর না দেওয়াই ছিল সদুত্তর।

: তা কি করে সম্ভব?

: মৌনের ইঙ্গিতে। অর্থাৎ আত্মা 'অস্তি' এবং 'নাস্তি'র ঊর্ধ্বে; অস্তি-পন্থায়-ও নেই, নাস্তি-পন্থায়-ও নেই; আছেন মজ্‌ঝিম-পন্থায়। জাগতিক ঘট-পটাদি বস্তু অস্তিকোটিতে আর আকাশ-কুসুম নাস্তিকোটিতে[১], আত্মা এতদুভয়বিলক্ষণ, বেদান্তের পরিভাষায় যাকে 'পারমার্থিক সৎ' বলা হয়েছে।

: তা হলে চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত তত্ত্বটি কী?

: একই তত্ত্ব। ক্ষেমা-প্রসেনজিৎ-সংবাদে সংযুক্তনিকায় গ্রন্থে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। মৃত্যুর পর তথাগত (১) কি থাকেন, (২) অথবা থাকেন না, (৩) অথবা থাকেন-ও-থাকেন না, (৪) অথবা থাকেন-ও-থাকেন-না না? উত্তর, এর কোনটাই না। পরবর্তী কালে নাগার্জুন হয় তো এই সংবাদের ভিত্তিতে শূন্যকে আখ্যা দিয়েছেন চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত 'অস্তি', 'নাস্তি', 'অস্তি-নাস্তি', এবং 'ন অস্তি-নাস্তি'র বাইরে[২]। ন্যায়ের মারপ্যাঁচ, তাৎপর্য অবাঙ্‌মনসো গোচরম্।

(১) সত্তা সম্বন্ধে চতুষ্কোটির (আগে দ্রষ্টব্য) কোনো কোটিই নির্দেশ করা যায় না এ জাতীয় মত হয় তো সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সঞ্জয় আচার্য (দীঘনিকায় ২-৩২)।

(২) অস্তি, যথা প্রাপঞ্চিক বস্তু, ঘটপটাদি; নাস্তি, যথা আকাশকুসুম; অস্তি-নাস্তি, যথা স্বাপ্নিক বস্তু; ন অস্তি-নাস্তি, যথা সুষুপ্তাবস্থা। এতদতিরিক্ত বস্তুই ব্রহ্ম বা অশ্বঘোষের "তথতা" ("শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র")।

: সদ্ধর্ম যদি উপনিষদের তত্ত্বই হলো তবে ধর্মচক্রের অভিনবত্ব কোথায়? এটাই আমার দ্বিতীয় শঙ্কা।

: অভিনবত্ব তত্ত্বের দিক থেকে নয়, ইতিহাসের দিক থেকে। সমাজের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা, প্রকাশভঙ্গি, অনুশাসন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। পরে প্রচারের সঙ্গে প্রচারকের ব্যক্তিগত ঝোঁক ও দুর্বলতা এসে পড়ে; ক্রমে নানারকম ফ্যাঁকড়া বেরয়, জঙ্গল ও কাঁটাগাছে অমিতাভের আভাও ঢাকা পড়ে যায়। তবে একটা ভাববার বিষয় আছে। বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা উপনিষদাদি শাস্ত্রে এবং জীবন্তরূপে মুনিঋষি ও সাধুসন্তের সাধনায় ছিল বলেই সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বুদ্ধদেব প্রথমে তো আলার কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের[১] কাছেই তত্ত্ব এবং যোগাভ্যাস শেখেন।

: কী শিখেছিলেন তার কোনো সঠিক বিবরণ কোথাও আছে? না শিষ্যরা চেপে গিয়েছেন?

: শিষ্যদের শ্রদ্ধাজড়তায় সত্য অনেক সময় চাপা পড়ে ঠিকই। তবে যেটুকু বিবরণ আছে তা থেকে একটা অনুমান করা যায়। আলার কালাম এবং রামপুত্র উভয়েই সাংখ্যবাদী ছিলেন। আলারের নিকট শিখেছিলেন ধ্যান; হয় তো সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্বে পৌঁছে থাকবেন—পাতঞ্জলের অস্মিতা-সমাপত্তি, infinite consciousness; আর উদ্রকের নিকট হয় তো সাংখ্যবিচার শিখেছিলেন ও বিবেকখ্যাতি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধ্যান-পর্যায়ে এর উল্লেখ নেই, কিন্তু 'অঙ্গুত্তরনিকায়ে' সর্বাবস্থার দ্রষ্টা হয়ে থাকবার নির্দেশ আছে।

: সাংখ্যের বিবেকখ্যাতিই তত্ত্বজ্ঞান নয়?

: বিবেক দ্বারা পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে আলাদা এই জ্ঞান হয়, প্রকৃতির জড়ত্ব সিদ্ধ হয় কিন্তু অস্তিত্ব লোপ হয় না। সুতরাং দ্বৈত থাকে বলে চরম মুক্তি এ-ও নয়। এ জন্যই হয়তো পাতঞ্জলে বিবেকখ্যাতির পর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাসের নির্দেশ আছে।

(১) আলারের নিকট 'অকিঞ্চনায়তন' এবং উদ্রকের নিকট "নৈবসংজ্ঞা নাসজ্ঞায়তন" (মজ্‌ঝিম-২৬)।

ঃ অসম্প্রজ্ঞাতই কি শেষ অবস্থা ?

ঃ বৈদান্তিকরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা অভাব প্রত্যয় হয়, একদেশী বৌদ্ধমতের শূন্যতা। অভাব প্রত্যয়ের পর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই চরম অনুভূতি। বুদ্ধদেব বোধি তরুমূলে হয়তো ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেছিলেন। নিশ্চয় করে অবশ্য বলা যায় না, তবে খুবই সম্ভব; অনেক সাধু এরূপ বলে থাকেন।

গাড়োয়ান তাগিদ দেয় ফেরবার জন্য। উঠে পড়লুম। প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। স্বামীজী বলেন, মহাপরিনির্বাণের সময় বুদ্ধদেব আনন্দকে আশীর্বাদ করেছিলেন—

এই ভবসাগরে নিজেই নিজের দ্বীপ, নিজেই নিজের আশ্রয়, অপর কোনো আশ্রয়ই নেই। যিনি অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ করে স্বীয় আত্মাকে দ্বীপের ন্যায় আশ্রয় করেন তিনিই অনাগামিত্বরূপ নির্বাণ লাভ করেন।
ইহাই শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

সো করোহি দ্বীপমত্তনো, খিপ্পং বায়ম, পণ্ডিতো ভব। স্বাত্মদ্বীপের শরণ নিয়ে তপস্যা করে চলুন, পরমপদ লাভ করবেন।

দিব্বম্ অরিয়ভূমিম্ এহিসি।
দিব্য বুদ্ধভূমিতে জেগে উঠুন।

তীর্থাবাসের দিকে চলছি। গাড়ীর গতি মন্থর; পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলো; শ্রান্তি-বিধুর পূরবীরাগে পরিবেশ আচ্ছন্ন; দয়ালদা ভাবগম্ভীর; ক্ষেপু অশ্রুকাতর; ঘোড়াটিও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে···প্রত্যেক তীর্থেরই একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে··· অযোধ্যায় যেদিন পৌঁছই মাকে নিয়ে, সেদিন সহরে হরতাল ছিল; দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা লোকবিরল, সর্বত্র বিমর্ষ নীরবতা। প্রথমে সরযূর ধারে যাই; মা স্নান করে আহ্নিকে বসেন···সরযূর ক্লান্ত, ব্যথিত গতি···দূরে কে ভজন গায় 'সরযূ কে তীর'···গুমরে-ওঠা কান্না চিত্ত মথিত করে···শ্রীরামচন্দ্রের কান্না, সীতাদেবীর অবিরাম অশ্রুধারা···লক্ষ্মণবর্জনের মর্মন্তুদ আর্তনাদ···'রামায়ণ' চোখের জলের ঘনবরষা···অশ্রুনদীর তীরে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে···বিশ্বমানবের পুঞ্জীভূত বেদনা কতো কাল ধরে বয়ে নিয়ে চলছে অশ্রুনদী সরযূ···কোন করুণাময়ের চরণতলে

এই আর্তপ্রবাহের পরিসমাপ্তি ?···সেদিনই ফিরে চললুম ; গাড়ীর জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছি···একজন যাত্রী গুন্‌গুন্‌ করে গাইছেন—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।
সীতা রাম জয় রাজা রাম, রাজা রাম জয় সীতারাম॥

রাম নাম ভারি মিষ্টি ; দুটি বর্ণই অর্ধস্বর, liquid sound, যেমনি কোমল তেমনি মধুর ; রাম নাম যেন অশরীরী, body নেই ; হৃদয়ে ধারণ করলে রস হয়ে মিলিয়ে যায়···

রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম।
রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম॥

ভক্তটির মুখ আনন্দোজ্জ্বল, অশ্রুসিক্ত···

···বুদ্ধগয়ার পরিবেশে যে বেদনা তাতে রামায়ণের ব্যক্তিনিষ্ঠ কাতরতা নেই, জীবনের সম্পর্কজড়িত অশ্রু নেই। এখানকার বেদনা নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজনীন, অব্যক্ত ; অশ্রু শুকিয়ে রূপায়িত হয়েছে আকাশ জোড়া ব্যথায়···সাঁঝের আঁধার নেবে আসে···কলকাতার কথা মনে হয়···প্রাচীন না হলেও বম্বাই সহরের মতো one-dimensional পটে আঁকা ছবি নয়। ছবি মুগ্ধ করে, কিন্তু তাতে না আছে ইতিহাসের গভীরতা, না আছে আত্মিক ঊর্ধ্ব-আসীনতা ; heights ও depths উভয়েরই অভাব। ওয়ালর (Waller)-এর অন্ধকুঠি (dark-cell)। পাঁচশ' বছর পরে যখন ধ্বংসস্তূপ দেখা দেবে তখন হয়তো অধঃ এবং ঊর্ধ্বে জোনাকি জ্বলবে···কলকাতা three-dimensional···পতিতপাবনী গঙ্গা, কালীঘাটের পীঠস্থান, দক্ষিণেশ্বরে মহাতপা শ্রীরামকৃষ্ণের তপোভূমি, অদূরে মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র···সব কিছুই অনুত্তর লোকের স্বপ্ন জাগায়। আর ইতিহাসের পলিস্তর কী ঐশ্বর্যমণ্ডিত—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল···কিন্তু গয়ার সঙ্গে তুলনা হয় না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ···মাঝে মাঝে ঝিল্লিরব ওঠে, স্তব্ধতা আরও গভীর হয়···চেতনার শিকড়গুলো চলে বুদ্ধের করুণাচিত্তের সন্ধানে কালস্তরের সুপ্ত অতলে···ঊর্ধ্বে তারার দেশকে পেরিয়ে অভীপ্সা চলে মহাব্যোমে প্রজ্ঞাপারমিতের অসীমতায়···

ভগবা ভগবা যুত্তো, ভগ্‌গং কিলেস বা হতো।
ভগ্‌গং সংসারমুত্তারো, ভগবা নাম তে নমো॥

॥ ১০ ॥

অকিঞ্চনায়তন···প্রপঞ্চাভাব···সর্বং শূন্যং শূন্যম্···তারপর নৈব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞায়তন, পরব্রহ্ম···বুঝি না। সুখদুঃখের এই সংসার ; পুকুর পাড়; খেলার মাঠ, ধানক্ষেত ; বাগানের ঝোপ ; গাছ, আঁধার ; পাখীর গান ; নিষুতি রাত—সর্বং শূন্যং শূন্যম্? ভাবতেই যে বুক দুড়দুড় করে! সবটাই ফাঁকি নয় তো? সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, শূন্য, ব্রহ্ম—হিংটিং ছট্ নয় তো? শব্দারণ্যং মহাঘোরম্? সেই অরণ্যে পথ হারিয়ে 'সসেমিরা' বলে চেঁচাচ্ছি না তো? এর চাইতে রবীন্দ্রনাথ ভাল নয়?

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্র খানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।

মন সাড়া দেয় না। কোথায় অমৃতের অবিরাম ধারা? যা আসে তা paganism নয় তো? বর্ণগন্ধে চিত্ত আকৃষ্ট হয়; কিন্তু তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে? পাচ্ছি কি?···ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রকৃতির পূজো করে ভগবান্‌কে খোয়ালো, প্রকৃতিকেও হারালো; আর ক্লিষ্টচিত্তে দিন গুনে জীবন গেল বালুচরে ব'সে···মৃত্তিকার পাত্রে যে অমৃতই পাবো তার নিশ্চয়তা কি? যদি গরল আসে? আসে-ও তো!······এদিকে শূন্যও যে বিভীষিকা! এগই কি করে?···তন্ত্রের রাস্তা মন্দ নয়—বসুধা-ও আছে, সদাশিব-ও আছেন; ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসবার প্রয়োজন নেই, কারণসুধা পান করে চক্রে বসলেই বাজিমাত।······আত্মপ্রবঞ্চনা নয় তো? ভোগ এবং ভোগের উপকরণ—শিব ফুঁড়ে বের হবেন তার মাঝখানে? হলে মন্দ ছিল না, কিন্তু হয় কি? রেশনালাইজেশন্ (rationalisation) নয় তো? দ্বিধা আসে মনে। ভাল-ও লাগে না। আমার এক বন্ধু বলেন, তন্ত্রমার্গে আছে high adventure—অভিযানের দুঃসাহসিকতা—bold experiment with life—বীরাচার। কিন্তু বিশুদ্ধিমার্গ নয়। গয়াশীর্ষ পাহাড়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ! সবই জ্বলছে; চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয়, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, মনোধর্ম, সুখ দুঃখ, সব জ্বলছে; প্রজ্বলিত অগ্নিতে জ্বলছে রাগ, দ্বেষ, মোহ, জরা, মৃত্যু, শোক।'···অহোরাত্র জ্বলছে যে আগুন তাতে আবার ঘৃতাহুতি কেন?···বিশুদ্ধিমার্গ নয়;

ঠাকুরঘরের পবিত্রতা নেই, মন্দিরের মঙ্গলধ্বনি নেই, আচারের শুচিতা নেই, শীলচর্যার সৌরভ নেই; অন্তর্যামীর আশীর্বাদ নেই…নাঃ, 'সে আমার নয়'…

একবার গৌহাটী গিয়েছিলুম দিদির বাসায়। জামাইবাবু একজন পাণ্ডা ডেকে দিলেন, তাঁর সঙ্গে গেলুম কামাখ্যাদেবীর দর্শনে। ব্রহ্মপুত্রের কোলে শ্যামায়মান পাহাড়; উপরে মন্দির; নীচে সহর, বস্তি। পাণ্ডাজী অতীতের কাহিনী বলেন; চিত্ত আকৃষ্ট হয়, প্রসন্ন হয় না…কামান্ধ আবেশ…পৌরাণিক যুগের আবছায়া রাজ্য…মাথার উপর কালো মেঘের আঁধার…পিচ্ছিল রাস্তার সর্পিল গতি…সাপের পিঠ বেয়ে চলা…ফণিমনসার গাছ ছোবল মারতে উদ্যত…ঝোপে ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে কালো কুহকিনী…ব্যাঙের গোঙানি ভেসে আসে, সাপে ধরে থাকবে…একটা লতা নেবে এসেছে, কুষ্ঠ ব্যাধিতে রসপুষ্ট ডগাগুলো হাওয়াতে দোলে…সব কিছু রসে ঠুসঠুসে…মেঘের কালো গা ফুলে ঢোল; জলো হাওয়া; মাটি সেঁতসেঁতে…ব্যাঙের ছাতার ছড়াছড়ি…টি-টি-টি-টি, একটা পাখী উড়ে যায় সন্ত্রাসে…গা ছম্‌ছম্ করে…লাল জবাগুলো আগুনের মতো জ্বলছে…আবার ব্যাঙের গোঙানি…হ্রীঁং ক্লীঁং বুং রং ভং—ভয়ের কঙ্কাল মূর্তি…শ্রীঁং ঘ্রীঁ হ্রূঁং—কুঠার হস্তে ক্রোধরূপী করাল দৈত্য…ব্রীঁং ঘ্রীঁং ক্ষৌং, হিংসাবিষে মসীবর্ণ শাঁকচুন্নী জিভ চাটে…ক্রীঁং ল্রীঁং হৌং, ফোঁস করে ওঠা কামনার উগ্র ফণা…আদিম যুগের দুঃস্বপ্নগুলো মন্ত্রবলে গা ঝাড়া দেয়—ডাইনসর, মেগথেরিয়ম, প্টেরড্যাক্‌টিল্, satyr, gnome, জিন।

ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাঃ॥

কড়কড়, কড়কড়, কড়কড়……

'এই যে মন্দির' বলেন পাণ্ডাজী। প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করি…ছলনাময়ী প্রকৃতি, রাক্ষসী, আসুরী! কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাতে চাই মন্ত্রশক্তির কুহকে, উৎক্ষিপ্ত হয় পচা ডোবার পাঁকে কবর দেওয়া আদিম জানোয়ার, মনোগহনের ডাকিনী-যোগিনী। আত্মবশীকরণের মোহান্ধতা, অটো-সাজেশচন (auto-suggestion)-এর বিড়ম্বনা।……পাণ্ডাজী একদিন থেকে যেতে বলেন, দ্রষ্টব্য অনেক আছে, চাহিদা কিছুই নেই। লোকটি ভদ্র, মিষ্টভাষী। রসের হাঁড়িতে মাছি ঢোকে, বেরয় না, মরে।……জোরে পা চালিয়ে বাড়ী ফিরি;

প্রার্থনা করি, 'হে কামাখ্যা দেবী! কামাখ্য কালিয় সাপের কবল থেকে মুক্তি দাও, কর্দমপ্রোথিত পশুগুলো যেন আর উদ্বুদ্ধ না হয়, তোমার মায়াজাল কেটে বেরিয়ে আসার সামর্থ্য দাও;

মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা বিন্দ্বর্ধচন্দ্রাত্মিকে।
হুঁ-ফট্ কারময়ি ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ॥

······পরমহংসদেব তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, কিন্তু তান্ত্রিক মার্গের প্রচার করেন নি; দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন মারণ উচাটন ইত্যাদির দিন শেষ হয়ে গেছে। এককালে হয়তো বশীকরণাদি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে যে তামস জন্তুগুলো পালিয়েছে তাদের আবার ডেকে আনা মূঢ়তা মাত্র। কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানা প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ—কামনার পূজো, ঈশ্বরের নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই জোর দিয়েছেন ঈশ্বরানুরাগের উপর, মনে-প্রাণে চেয়েছেন শুদ্ধা ভক্তি, জাহ্নবী ধারার মতো চিত্তকে যে পবিত্র করে, এগিয়ে নিয়ে যায় শান্তরসের শাশ্বত অসীমতায়···

পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে,
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে॥
সর্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহ-কলুষহরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ,
এস' এস' শূন্য জীবনে॥

ঃ এখনও ঘুমও নি?—জিজ্ঞেস করেন দয়ালদা।

ঃ না।

ঃ রাত হ'য়েছে। এগারটার ঘণ্টা অনেকক্ষণ প'ড়েছে।

ঃ ঘুমবার চেষ্টা করছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছিলুম, পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।

ঃ সেখানেই তো আছ।

ঃ সেখানেই আছি!

ঃ পানী বিচ মীন পিয়াসী!

ঃ বুঝি না কেন?

ঃ ধীরে ধীরে রে মনা, ধীরে সব কছু হোয়ে।

মালী সীঁচে সৌ ঘড়া, ঋতু আএ ফল হোয় ॥

: কাতরাচ্ছি যে !

: বিরহের জ্বালা তো এখনও বাকী।

: জ্বলে পুড়ে যদি খাক হয়ে যাই ?

: করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকলি গরল ভেল

(ক)

কালীঘাট

(ক)

কালীঘাট

দেশের বাড়ীতে ঠাকুরঘরে মা কালীর একখানা ফ্রেমে-আঁটা ছবি ছিল—শ্মশানবাসী শিব ; শিবের বুকে দিগ্বসনা কালী···গলায় মুণ্ডমালা, কোমরে নরহস্তের কটিবন্ধ ; হাতে বর, অভয়, রক্তস্রাবী নরমুণ্ড এবং অসি। চোখে পড়ে শুধু অসি আর নরমুণ্ড। মায়ের এ-পাশে ও-পাশে তাথৈ নৃত্যে ডাকিনী যোগিনী ; মাটিতে মড়ার ছিন্ন মাথা, হাত, পা, ধড় ; শেয়াল একটা মুখ গলিয়ে দিয়েছে কবন্ধের নাড়ীভুঁড়িতে···শকুনী চোখ খাচ্ছে···গৃধিনী পাঁজর ঠোকরাচ্ছে···গাছের ডালে দু-চারটা কাক ··অদূরে একটি ক্ষীণ জলরেখা, কুকুর জল খাচ্ছে। "মা! তুই কি এই দৃশ্য দেখেই জিভ কেটেছিস্?"—বলতেন আমার মামাবাবু। ঠিক ভোলানাথ ছিলেন মামাবাবু; মড়া পুড়িয়ে সিদ্ধহস্ত, নেমন্তন্নে পঞ্চাশটা রসগোল্লা খেয়েও অটুট স্বাস্থ্য। কালীভক্ত ; শবসাধনা-ও নাকি ছিল ; ক্বচিৎ কখনও আসতেন। এলেই মা কালীর ছবিটির সামনে বসে সন্ধ্যা-পূজা সেরে কাল্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র (শঙ্করের) শেষ করতেন—

> ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বম্।
> ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্॥
> মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা।
> ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥

তারপর শ্যামাসঙ্গীত—

> যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
> দয়াহীনা ন হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
> দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে।
> গলে পরে মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে॥
> মা মা ব'লে যত ডাকি, শুনেও মা তা শোন নাকি।
> প্রসাদ এমনি লাথি-খেকো, তবু কালী ব'লে ডাকে॥

দিদিমা যেদিন মারা গেলেন আকুল হয়ে সেদিন গেয়েছিলেন—

> ও মা! কেমন মাতা কে জানে।
> মা ব'লে মা ডাকছি কত, বাজে না কি মা তোর প্রাণে॥

পাষাণী পাষাণের মেয়ে, বারেক না মা দেখিস চেয়ে।
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়াস মা তুই শ্মশানে ॥
আমি মা ব'লে তো ডাকবো না আর, বাজে কিনা দেখি এবার।
বাজে কিনা মা তোর প্রাণে, তোর প্রাণে, তোর প্রাণে ॥

…সত্যি কথা হচ্ছে 'বাজে না'; আগেও বাজেনি, এখনও বাজে না। অবসর-প্রাপ্ত একজন হেডমাস্টারের সঙ্গে প্রায়ই গল্পগুজব হয়। চীন-জাপানের যুদ্ধ চলছে; একদিন শুধান, 'আচ্ছা, বলুন তো দেবলবাবু! মা করুণাময়ী, জগজ্জননী, সন্তানের মা; তাঁর এই সর্বনাশা ক্ষুধা কেন? রোজ শত শত সন্তানের রক্তপান করেও কি তৃপ্তি নেই? ছেলে-খেকো মা! এর মানেটা কি?' সাশ্রুনয়নে কখনও বা বলতেন, 'মা! তোর করালরূপ সংবরণ কর; অসহ্য এই যন্ত্রণা! রেহাই দে মা!' গদগদকণ্ঠে আবেদন জানাতেন—

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা, কত দিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥

কিন্তু দুঃখ কাটে না; যন্ত্রণা ঘনিয়ে আসে তীব্রতর করালতায়।

এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো ॥

???…খটকা লাগে। তীব্র দহন যদি জ্বলে, চীনশ্মশানের শবাসনে বসতে পারি না। দহনও নেই, তীব্রতাও নেই। আছে তামস দুঃখবিলাস, অলস ভাবালুতা, —যা মা-কালীর ছবিতে খুঁজে পাই না। সাধারণ ছবি; চার পয়সায় কেনা যায়; কিন্তু আর্টের দিক থেকে উঁচুদরের প্রকাশ-ভঙ্গিমা—namby-pambyism-এর পরিবর্তে পাই তীব্র দহনের জ্বালা, রণক্ষেত্রের করালতা, সংহাররূপিণী ক্রূর ভীষণতা। অগ্নির সাতটি জিহ্বা—

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥[১]

যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, ইত্যাদি বিপর্যয়ের মাধ্যমে সংসারকে শ্মশানে পরিণত করে প্রকটিতবদনা কালীর সপ্তজিহ্বা…খটকাটা থেকে যায়…ছবি ছবি-ই; আর্ট এজন্যই উপভোগ্য যে বাস্তবের সঙ্গে সে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। বায়স্কোপে

(১) মুণ্ডক ১-২-৪

জঙ্গলের ছবি সোৎসুক নেত্রে দেখি, উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরি, নিশ্চিন্তে ঘুমই। জঙ্গলে বাস করা যায় কি? ভীতিসঙ্কুল অরণ্য শুধুই বিভীষিকা—আজ ছাগলটা, কাল গরুটা, পশু ছেলেটা, যদি জঙ্গলে অদৃশ্য হয় তবে 'এই করেছ ভালো' তো বলতে পারিই না, 'কালী করালী'ও মুখে আসে না; ভয়ে, শোকে, শুধু অসহায় আর্তনাদ করি ··বাজে না কালীর প্রাণে···

* * * *

সপ্তজিহ্বাই বটে। এবারে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানভূমি ইওরোপের রণাঙ্গন।···যদি আমাদের দেশে হতো? ভয়ে, শোকে, দুঃখে কাঠ হয়ে যেতুম; মা-কালীর ছবি দেখে চিত্ত কি রসে অনুবিদ্ধ হচ্ছে তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হতো না।···বাঁচা গেছে। ইওরোপের নরবলি কতটুকুই বা স্পর্শ করে আমাদের! অমৃতবাজারের পাতা উলটই···আজকে পাঁচশ সাফ···কালকে ছিল হাজার খানেক···লুফ্‌ৎওয়াফে আরও একটা সহর খতম করেছে···ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রায় তিনশ লোক টেনে বার করা গেছে···মৃত, অর্ধমৃত, কবন্ধপ্রায়; কারও বা চোখমুখের একধার উড়ে গেছে···যাবে না কেন?···আর এক পেয়ালা চা দিসরে!···জাহাজ ডুবেছে আজ অনেকগুলো; লোকও মরেছে বিস্তর; বাঁচাবার চেষ্টা যে হয় নি তা নয়, কিন্তু হাওয়াই জাহাজ থেকে চলছিল অবিরাম গুলিবর্ষণ···বেশ জমেছে কিন্তু যুদ্ধটা··· 'হিটলারে-ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে, নিত্য আসিতেছে খবর তার'···চায়ের আসর জমে ভাল। আমাদের আর কি? খবরের কাগজ পড়া, বাক্যবাণে শত্রুধ্বংস করা, সিনেমা দেখা···ভাল একটা ছবি এসেছে 'মায়ামহলে', রববার দিন বড্ড ভিড়, যাবো আর একদিন···আমরা আছি বেশ···মাথাও নেই, মাথাব্যথাও নেই। মাথা যাদের আছে মরুক তারা···মরবে না-ই বা কেন? কতো দিন থেকে মার চালিয়েছে আমাদের ওপর! অতিদর্পে হতা লঙ্কা···ক-বছর আর চলবে যুদ্ধ কে জানে! সোনা থাকলে মোটা লাভ করা যেতো···কতো লোক এই বাজারে লাল হয়ে গেল···বেশ ফাঁদে পড়েছে এবার···পড়বে না? পাপ কি কম জমেছে? প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? **The gods grind slow, but grind exceeding small**···বাজার থেকে গলদা চিংড়ি এসেছে আজ···কি মারটাই না দিচ্ছে জার্মানরা! তুলো ধোনা করে ছেড়ে দিচ্ছে···ছেড়েই বা দিচ্ছে কোথায়? ···**Prisoners of War......Concentration Camp**···স্বদেশের বিরুদ্ধে প্রোপাগেণ্ডা পর্যন্ত করিয়ে নিচ্ছে···খোদার মার যাকে বলে! **The gods grind slow, but grind exceeding small**...ম্লেচ্ছনিবহনিধনে···

কোথায় দুঃখ? সুখ-ই তো হচ্ছে।···কলেজে পড়বার সময় বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখতুম···Parliament of Man...Federation of the World...বুদ্ধদেবের বিশ্বমৈত্রী···বুকনিই সার; স্বপ্নটাকে আজ খুঁজেও পাই না। মানুষের দুঃখ সর্বত্রই সমান; কিন্তু চিত্ত সাড়া দেয় কৈ? আবৃত্তি করি 'এই করেছ ভালো'; লজ্জা হয় না তো! মা-কালীর করালরূপের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ শুনি, আনন্দে তারিফ করে গাই—

এলো রণে ঐ শ্যামা বামা কে!
কুন্তলবিগলিত শোণিত-শোভিত
তড়িত-জড়িত নবঘনঝলকে॥

কৈ, বুকে ঘা হয় না তো!···যাকগে মরুকগে, ছবিটা দেখে আসা যাক···

*   *   *   *

হুঁশ হলো যখন জিনিসপত্র আক্রা হতে লাগলো। দেশে গিয়েছিলুম ছুটি নিয়ে; কিছুদিন থাকতে না থাকতেই চাল-ডালের দাম যেন আগুন···শেষে চালের মণ চল্লিশ টাকা···ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম···তারপর সব গেল গুলিয়ে···যা দেখলুম তা যে কোনো দিন দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি···যে জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল ইন্দ্রজালের মতো সে উবে গেল···দিন নেই রাত নেই, আছে কেবল ক্ষুধা··· মারাত্মক সর্বনাশা ক্ষুধা···কালান্তক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা···অগ্নির সপ্ত জিহ্বা··· ইওরোপে নয়; কলকাতা সহরে, মা কালীর পীঠস্থানে, পীঠস্থানের বুকের ওপরে···

অন্ন দে গো, অন্ন দে গো, অন্ন দে গো, অন্নদে।
জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা, কাতরা হইও না প্রসাদে॥

'ঝিঁঝিট-ঠুংরি'। হাসি পায়! লক্ষ লক্ষ সন্তান 'হা অন্ন', 'হা অন্ন' করে রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, পার্কে, এখানে, ওখানে, সেখানে। অন্নদা অন্ন দেন নি। অনাহারের ব্যাপক মহামারী···দু'শ নয়, চারশ নয়, লক্ষ লক্ষ লোক মরে গেল। অথচ গুদামে শত শত বস্তা চাল, হাজার হাজার মণ চাল···অন্ন দে গো, অন্ন দে গো, অন্ন দে গো, অন্নদে···কোথায় অন্ন?···এতো মড়া ফেলে কে? ···চাল আর এখন কেউ চায় না; কে দেবে?···ফেন দে মা, ফেন দে মা, ফেন দে মা···ফেনও শেষ হয়ে যায়···মড়ার কোলে মড়া জমে···দোতালার পাইপ দিয়ে নালিতে জল পড়ে; পঙ্গপাল ছোটে সেদিকে দু-চারটা ভাতের দানার পিত্যেশে··· ডাস্টবিনে কী পড়লো? তাই নিয়ে মানুষ ও কুকুরে কাড়াকাড়ি···শুঁটকী ধরে

মরে আছে মা, বাচ্চাটা তার মাই চাটছে···এটা তো মরে নি এখনও ; মুমূর্ষু, কাকে ধরেছে···চিলের ঠোঁট থেকে পড়ে একটা জিলিপি, ছেলেটা খপ করে ধরে, ছিনিয়ে নেয় ছেলেটার মা, তারপর খামচা-খামচি···লোকটা বোধ হয় কলেরায় মরেছে, ময়লার ভিতর দাঁত বের করে পড়ে আছে, মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে চারদিকে ; চোখ দুটো নেই, কাকে খেয়ে থাকবে···দেশের নেতারা সব জেলে ; লেঠা চুকেছে।··· মন্তব্য শুনি, কেড়ে খায় না কেন ? ছিনিয়ে, মারধর করে মরে না কেন ?···কিন্তু সে-রাস্তায় তো চলিনি আমরা, গান্ধিজী তো তা শেখান নি···অহিংসা···ত্বয়া হৃষীকেশ···হঠাৎ হিংসায় নাবি কি করে ?···

যতীন মুখুজ্যে প্রমুখ যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছেন ; সান্ত্বনার রাস্তা আছে, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন—বীরের মৃত্যু। হিন্দু-মুশলমান দাঙ্গায় অনেকের জীবনান্ত হয়েছে ; ভাই-ভাই চিরদিনই মারামারি করে ; মূঢ়তা আছে, কিন্তু মনুষ্যত্বও আছে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে জুজুর ভয়েই সকলে মৃতপ্রায়। কিন্তু কালীঘাটের নরবলির কী অর্থ ? লাখো লাখো নর-নারী রাস্তার দুধারে মরে আছে···চতুর্দিকে 'হা অন্ন' রব, আর হোটেলে চলে এন্তার মদ-মাংস, বিস্রস্তবসনা নটীর নৃত্য ; কালোবাজারে অঢেল টাকার ঝনঝনানি·· সবই উলট-পালট হয়ে যায়···বন্ধু আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছেলেটা যে মলো এর মানে কি ?···কালীঘাটে যে নরবলি চলছে এর মানেটা কি ?···কদিন থেকে যৌবনের একটি স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে···বর্ষাকাল ; নৌকো ছাড়া যাতায়াত চলে না ; জেঠাইমাদের বাড়ী কে এলো যেন নৌকো করে···নিত্যকালী। জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাইঝি, ডাকনাম কালী ; সঙ্গে একটি শিশু ; সোয়ামী গাঁজা খায়, ঘরে চাল নেই, দুদিন উপোস করে বাপের বাড়ী চলে এসেছে। বাড়ীতে বাপ-মা নেই ; এক কাকীমা আছেন, তিনিই মাঝির পয়সা চুকিয়ে দিলেন।···কিন্তু কদিন খাওয়াবেন ? তাঁর সংসারও কোনোমতে চলে···ঝগড়া সুরু হয়···কেন এসেছিস এখানে মরতে ? মরবার আর জায়গা পেলি না ? কাল সকালে যদি তুই আমার ঘাড় থেকে না নাবিস, তবে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবো···সকালবেলা বেড়া কেটে দেখা গেল, ছেলেটাকে গলা টিপে মেরে কালী ফাঁসিকাঠে ঝুলছে··· জিভ-বের-করা কালী মূর্তিটি অনেকদিন পর্যন্ত দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিতো—**my favourite nightmare**।···ভুলে গিয়েছিলুম···কদিন যাবৎ আবার আসছে··· দান্তে (Dante) নরক দেখেছিলেন, কিন্তু আমাদের নরক দেখেন নি ; দেখলে স্বর্গের স্বপ্ন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো···মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,

এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে? মানে হয়?…ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত, বিরহ-মিলন কতো হাসি-অশ্রুময়! পরিহাস নয়?…গুলিয়ে যায় সব…মিথ্যার কারচুপি দিয়ে নিজেকে ঠকিয়ে এসেছি এতদিন?…কোথায় 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি'? নর্দমার কালো পচা পূতিগন্ধময় স্রাব, গলিত দেহের বীভৎস স্তূপ, ক্ষুধার্তের আর্ত হাহাকার!…'নবনব রূপে এস প্রাণে'—মণিদার প্রিয় গান, স্বপ্নাতুর চিত্তে কতোবার শুনেছি, কিন্তু এই বিভীষিকার জন্য কোনো দিনই তো প্রস্তুত ছিলুম না।…সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর? লীলা? আমার চোখে যে মহা দুর্দৈব! ভগবান্ লীলারস পান করুন, কিন্তু আমার দুর্ভোগ কেন?…সেই দৃষ্টি নেই? নেই যদি, তবে বীভৎসতা এসে আমাকে উপহাস করে কেন?…মস্ত বড় এক বাবাজীর নাকি 'বাণী' বেরিয়েছে—নারায়ণ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আজ দুয়ারে দুয়ারে মাথা ঠুকছেন! ভারতবর্ষে তো নারায়ণ চিরকালটাই ঐ করে বেড়াচ্ছেন। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কালী ভাইঝি তো ফাঁস দিয়ে মলো!…বাবাজী ক-মুঠো অন্ন দিয়েছেন ভিখিরী নারায়ণদের তা জানি না, কিন্তু আশ্রম ফণ্ডে লক্ষাধিক টাকা আছে!…ছেঁদো কথা, আত্মপ্রবঞ্চনা…

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এজীবন পুণ্য করো দহন দানে॥

মা-টা মরে গেছে, বাচ্চাটা মাই চাটছে…

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো…

হা-অন্নের পৈশাচিক আর্তনাদ, মৃতের গলিত দেহে মাছির ভ্যান্‌ভ্যানানি, তৃপ্ত কাকের ভরাট রব, উৎসবমত্ত কুকুরের কর্কশ কলধ্বনি…

কতো বর্ণে কতো গন্ধে কতো গানে কতো ছন্দে।
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর॥

হোটেলে চোখ ঝলসানো আলো…মদ, মাংস, গান, নৃত্য…টেবিলের উপর জিভ বের করে কালী ছেলেটার গলা টিপছে…

কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!

নর্দমার পচা থকথকে পুঁজরক্তের অবিরাম পানোৎসব—গৃহস্থের ঘরে, কালোবাজারে, হোটেলে, প্রাসাদে, অলিগলিতে…লক্ষ লক্ষ কৃমিকীট আকণ্ঠ করে পান 'এই বসুধার পাত্রখানি ভরি বারম্বার পূতিরক্তগন্ধময়'…

॥ ২ ॥

১৯৪৩ সালের সঙ্গে একটা জগৎ-ই ধ্বংস হ'য়ে গেছে, আছে ভগ্নস্তূপ। তা-ও নেই। আলতামাশের স্বপ্নসৌধ এখনও সুন্দর; নারকীয় ক্রীড়াবিহার শুধুই ন্যক্কারজনক···যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, কিছুই থাকে না, ধরেও রাখা যায় না··· পুরনো সুরগুলো খুঁজলে শুনতে পাই কেঁউ কেঁউ···হুক্কা-হুয়া···কবিতা, সঙ্গীত, আদর্শ, অকুণ্ঠ প্রাণ, সবার উপরে মানুষ সত্য—vanity of vanities··· বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি রসশাস্ত্র, কিন্তু বীর ও বীভৎস রস বাদ দিয়ে। দেবাসুরের সংগ্রামকে বৈষ্ণবরা এড়িয়ে গেছেন, জীবনের বীভৎসতাকে অস্বীকার করেছেন; ফলে প্রাণের নির্ভীকতা এবং সত্যকে হজম করবার দুঃসাহস অর্জন করতে পারেন নি। সমুদ্রমন্থনে যে কালকূট ওঠে তাকে পান করবার শক্তি কোথায়? পথ চলতে রুখে দাঁড়ায় শুম্ভ, নিশুম্ভ, খর, দূষণ, কালীয় নাগ···এদের বধ করবার বীর্য কোথায়?···রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধারায় সঞ্জীবিত; বীররস, বীভৎসরস তাঁর চিত্তে সাড়া জাগায় নি। মহাকাব্যে সব রসের সমাবেশ এই জন্য থাকা দরকার যে অন্যথা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখা সম্ভব হয় না। দেবাসুরের সংগ্রাম পাশ্চাত্য সাহিত্যে রূপ নিয়েছে ট্র্যাজিডি(Tragedy)তে মানুষের সঙ্গে অদৃষ্টের (Destiny) বা শয়তান (Satan, Evil)-এর দ্বন্দ্বাত্মক কথা-উপকথার মাধ্যমে। বৈষ্ণব তথা রবীন্দ্র-সাহিত্য শয়তানকে এড়িয়ে চলেছে; নব নব নয়নাভিরাম রূপ চেয়েছে—কিন্তু নারকীয় দৃশ্য? সুন্দরকে চেয়েছে গানে, গন্ধে—কিন্তু বীভৎসতা?···vanity of vanities, all is vanity··· রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একটা যুগ—ব্যক্তি নন। লূতাতন্তুর সত্তাও আজ সেখানে খুঁজে পাই না···ফুল ও মধুর প্রলোভনে এতদিন এগিয়েছি, হঠাৎ পাই কালকূট; ফুলের ন্যায় সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন ছিল কাম্য, কিন্তু তাগিদ আসছে অসুরের সঙ্গে লড়াই করে অমৃতলাভের, হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হওয়ার। কৈ সেই বীর্যবত্তা? ভুল রাস্তা ধরে এখন আমরা নিঃস্ব, নিঃসহায়, দলিত, পিষ্ট, বিপর্যস্ত···

তান্ত্রিক সাধক প্রেতনৃত্যে ভয় পান না, অহিবিষ পান করবার সামর্থ্য অর্জন করেন। শুনি; জানি না-তন্ত্রের ধারা-ও তো শুকিয়ে গেছে; কালীপুজোতে কুষ্মাণ্ড বলি দিই; উমা ঘরের মেয়ে, পরান পুতলী—

এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥

কাল-ভৈরব পাগলা জামাই—

জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুনতে পাই।
আমি ভেবে সারা বল না তারা, সত্যি নাকি শুধাই তাই॥

মামাবাবুর কাছে অনেক শ্যামাসঙ্গীত শুনেছি—এমন দিন কি হবে মা তারা, যবে তারা, তারা, তারা বলে দুনয়নে পড়বে ধারা; ডুব দেরে মন কালী ব'লে; তাই কালরূপ ভালবাসি, জগমোহিনী মা এলোকেশী; বল মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা। কীর্তন নয়, তবে ঐ ধাঁচেরই—বৈষ্ণবের গা-ঘেঁষা, ভক্তিমূলক। রামপ্রসাদ ক্বচিৎ কখনও অন্য সুর ধরেছেন—

এবার কালী তোমায় খাব।
তারা, গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মা-খেকো ছেলে;
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটার একটা করে যাব॥
ডাকিনী-যোগিনী দু-টা তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব॥

মা-ছেলের অভিমান, আবেদনের প্রচ্ছন্ন কোমলতা, যদিও ভাষায় কিঞ্চিৎ বীভৎসরসের আমেজ আছে। জীবনে যে পৈশাচিকতা চলছে তাকে হজম করবার ইঙ্গিত নেই; রামপ্রসাদ বৈষ্ণব ভাবেরই প্রকারভেদ! জহ্নুমুনি এক গণ্ডূষে গঙ্গা উদরস্থ করেছিলেন; কিন্তু নর্দমার কালকূট?…জীবনে যা কিছু সম্পদ্ আহরণ করেছিলুম সবটাই হিং টিং ছট্ হয়ে অদৃশ্য হয়েছে… পড়ে আছে কালীঘাটের হাড়-কাঠ, স্তূপীকৃত নরমুণ্ড ও কবন্ধ…ডাকিনীরা ধড়গুলো বেদীর আগুনে ঝলসে নিয়ে হাড়গোড় শুদ্ধ চিবিয়ে খায়…পেত্নীরা আগুনের চারদিকে নাচে…পিশাচগুলোর অট্টহাসিতে কালীঘাট শিউরে ওঠে…

॥ ৩ ॥

ছোটখাট একটা সাহিত্যের আসর ছিল; অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলুম, বাধ্য হয়ে কিছু বলতেও হলো। ছেঁদো কথা আর মুখে আসে না, বিরক্তিটাই প্রকট করলুম…মাননীয় সভাপতি মহাশয় ইত্যাদি…কাব্যামৃত অল্পাধিক পান করিনি এ বলা চলে না; বাঙ্গালী মাত্রই করে থাকে। রসটা বরাবরই ফিকে লাগতো; আজকের দিনে মনে হয়, ফিকে নয়—গোটাটাই ফাঁকি। সাহিত্যের

কী প্রয়োজন আমাদের জীবনে? সংসারে সুখ দুঃখ আছে; নেই বলবার জো নেই, কারণ তারা বাস্তব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রমাণনিষ্ঠ। দন্তশূল, পাষণ্ডসম্ভাষণ, কালোবাজারের কৃমিকীট, চালে কাঁকর, আটায় প্রস্তরচূর্ণ, ঘৃতে চর্বি, তেলে শিয়ালকাঁটার নির্যাস ইত্যাদির প্রয়োজন কী তা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অণুর উপাদানসম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তাকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাজ্ঞান বলা যায়, এবং এজাতীয় জ্ঞানের যে সার্থকতা আছে বিজ্ঞানের যুগে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু কাব্যানুভূতির স্বরূপ কী? অনেকগুলো আনুষঙ্গিক প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। প্রথমতঃ, স্রষ্টার মৌলিক অনুভূতিকে ধরবার সামর্থ্য আমাদের নেই, হয় তো স্রষ্টারও নেই। চেতনা-প্রবাহে যে বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েছিল সে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছে; পরক্ষণে স্মৃতির কারচুপিতে যাকে ধরা হয় সেটি কিন্তু পূর্বক্ষণের বিলীন বুদ্বুদ নয়। দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতিনিষ্ঠ অনুভূতিটি স্রষ্টা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু রূপায়িত হয় সে সার্বজনীন কতকগুলো শব্দের ধ্বন্যাত্মক মাধ্যমে। ফলে, রূপসৃষ্টিতে স্বরূপগত কৃত্রিমতা একটু থেকেই যায়। তৃতীয়তঃ, শব্দের মাধ্যমে যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই অনুভূতিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে তখন ব্যক্তিনিষ্ঠ সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষার পার্থক্যবশতঃ প্রতিক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি প্রকট হয়। তারপর আছে মূলগত একটা শঙ্কা—স্রষ্টার প্রাথমিক অনুভূতিটি প্রমাণজন্য জ্ঞান কিনা? ভগবান্ পতঞ্জলি বলবেন, 'না; ওটি বিকল্পজ্ঞান মাত্র'। 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ'; মানে, বস্তু নেই অথচ শব্দের প্রভাবে যে আকাশকুসুমবৎ একপ্রকার মনোবৃত্তি হয়, কবিচিত্তের "অনুভূতি" (?) এই পর্যায়ভুক্ত। ক-সংজ্ঞক কবিগত আকাশকুসুমস্থানীয় এই 'বিকল্প' জ্ঞান যখন কথায় নিবদ্ধ হয় তখন সে খ-সংজ্ঞক আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়। এই 'খ' আবার পাঠকবর্গের বিভিন্ন চিত্তে $খ_১$, $খ_২$, $খ_৩$,...ইত্যাদি পরস্পর ভিন্ন আকাশকুসুমমালা সৃষ্টি করে; অথচ আমরা সকলেই বলে থাকি $খ_১$, $খ_২$, $খ_৩$,...এবং ক ও খ পরস্পর সর্বতোভাবে সমান! Equal in all respects! হাস্য ও করুণ রসের অম্বরী তামাক!

প্রয়োজনের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন, 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে'; কী প্রয়োজন একথা না ভেবে মন্দমতিও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। সাহিত্যসেবা দ্বারা কী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? আরিস্তত্‌ল্ রায় দিয়েছেন, সাহিত্য রেচকের ন্যায় সমাজজীবনে নৈতিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠিত

করে। নিজের দিকে তাকালে বা সাহিত্যিকদের জীবনী আলোচনা করলে এই যুক্তির অসারতা সহজেই ধরা যায়। রাসেল (Bertrand Russell) সাহেব বলেন, আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকচরিত্রের কোনই সম্বন্ধ নেই; ধর্মনিষ্ঠ জীবন গড়ে তোলবার সমস্যা একটা সম্পূর্ণ আলাদা সমস্যা, এবং এর সমাধানও হয় সম্পূর্ণ আলাদা উপায়ে—বর্তমান শিক্ষার মাধ্যমে নয়। ডীন্ ইন্‌জ্ (Dean Inge) আরও জোরালো ভাষায় একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'খোঁয়াড়ে চুনকাম দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শূকরটি তেমনিই আছে'। তবে কি কাব্যামৃত থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়? Spiritual value লাভ হয়? নৈতিক মানকে উন্নত করাই যেখানে অসম্ভব সেখানে আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নই ওঠে না; অধিকন্তু 'বিকল্প' জ্ঞান দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যা অর্জন করা সম্ভব নয়। সৌন্দর্যানুভূতি? Aesthetic value? অসম্ভব নয়। পেইটর (Pater) প্রমুখ সৌন্দর্যবিলাসীরা যে-জাতীয় aesthetic value লাভ করেছিলেন তাকে কণ্ডুয়ন সুখ বা sensationalism-এর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায় না। আর যদি কণ্ডুয়নসুখই কাম্য হয়, তবে জাগ্রৎ রমণ ত্যাগ করে স্বপ্নদোষের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা মূঢ়তা মাত্র। প্লাতো (Plato) বলেন, সাহিত্যরস আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী, এবং নৈতিক অবনতির পরিপোষক। তা সত্ত্বেও সোক্রাতেস্ (Socrates)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, 'সাহিত্যরস হেয় এবং বর্জনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আবাল্য ঐরসে পুষ্ট হয়ে এসেছি বলে তাম্রকূটাদি সেবনের ন্যায় ওটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, ছাড়া যায় না'। আর একটা ভাববার কথা আছে। গ্রীস দেশে সোক্রাতেসের আমল পর্যন্ত শিবায়তনে শ্রদ্ধা ছিল; প্লাতো এই শ্রদ্ধার মর্যাদা রেখেছেন শিব (Good)-কে সুন্দর (Beauty)-এর উপরে স্থান দিয়ে। পরবর্তীকালে অবিদ্যাসুন্দর রাজপাট দখল করে নিয়েছেন শিবকে তাড়িয়ে। ইদানীং আমাদের দেশেও সেই ঝোঁকটা প্রবল হয়ে উঠছে; দৃষ্টান্ত তুলসীদাসজী ছিলেন ভক্ত, হয়েছেন কবি। শিবজী যে চট্ করে পরাজয় স্বীকার করে নেবেন তার লক্ষণ অবশ্য জাতীয় চেতনায় নেই। বুদ্ধ প্রমুখ শিবাবতারদের প্রভাব সর্বস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। অনেক কালের সংস্কার, মনের অন্তস্তল পর্যন্ত চলে গেছে তার শিকড়; ওপড়ানো সহজ নয়। অবিদ্যাসুন্দরের আলো বড়জোর চন্দ্রাতপ; মুগ্ধ হই, কিন্তু ভুলি না যে কারবারটা ধার করা নকল বেসাত নিয়ে। অধিকন্তু অবিদ্যানাশন শ্যামসুন্দরের পূজো এখনও লোপ পায়নি। সখী চিত্রলেখা তাঁর

নাম রেখেছেন রসসিন্ধু—বহুদূরে ; জ্যোতিষ্ক পেয়েছিলেন নীলকান্তমণি—দুর্লভ ; পুলস্ত্যের চোখে তিনি নয়নরঞ্জন—আছে নয়নের প্রদাহ ; চন্দ্রাবলীর মর্ম স্পর্শ করেছিলেন মোহনবংশীধারী—শুনি আর্ত হাহাকার ; রূপকারের দৃষ্টি পেয়েছিলেন বনের হরিণী ; বনমালীর হাতে বনকে সঁপে দিয়ে তিনি হয়েছিলেন বৃন্দাবনবাসী। কোথায় বনমালী? কোথায় বৃন্দাবন ?···চিত্তে দেখি শুধু ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল ; বর্ষার জলে কতো আগাছা আর বিছুটি বনই না জন্মায়! সাপ, বাঘ, কেঁচো, কৃমিতে ভরতি ···সাহিত্য এদের খোশগল্পে মশগুল···বৃন্দাবনের মোড়ক লাগিয়ে ভাবি এই জঙ্গলই উদ্যান···বাস্তবের হাওয়া-বাতাস লাগতেই রংটা যায় চটে, আর বেরিয়ে আসে বাঘের জ্বলন্ত চোখ, ভাল্লুকের মৃত্যু-আলিঙ্গন, সাপের ছোবল, বৃশ্চিকের দংশন···যে জঙ্গল ছিল সে জঙ্গলই আছে। কোথায় বৃন্দাবন ?···কোথায় বনমালী ?···

···তাস-পাশা খেলে আমরা সময় কাটাই, চিত্তবিনোদন করি ; সাথী না জুটলে বই পড়ি, বায়স্কোপ দেখি। এটুকুই প্রয়োজন ; বাকীটা ধাপ্পা-বাজি, যা দিয়ে পয়সা কামাই, বাহবা পাই, পরকে ঠকাই, নিজে ঠকি। ভাল লাগে না আর ···নেশা যাঁদের আছে, অসুখে পড়লে নেশাতে-ও সুখ পান না, অভ্যাস-দোষে সিগারেটটা ধরান, দু-চার টান দিয়ে ফেলে দেন—ধুত্তর ছাই! আমার দেখি অভ্যাস-দোষটাও কেটে গেছে, আছে শুধু 'দূর-ছাই'।···কী আর এমন নেশা কাব্যের অম্বরী তামাক? আরও জোরালো নেশার প্রয়োজন।···মামাবাবুর কাছে এক ভৈরববাবার গল্প শুনেছিলুম—শ্মশানে থাকেন ; চিতায় মড়া চাপালে মাথার খুলিটা ত্রিশূল দিয়ে ফাটিয়ে তার ঘিটা আহারপাত্র নরকপালে ঢেলে নেন ও ভাতের সঙ্গে মেখে খান। মামাবাবু মন্তব্য করেন, 'এমনি করেই নীলকণ্ঠ হতে হয় ; বুঝলি দেবু? কিন্তু সে বড় শক্ত কথা হলো না?'···শক্ত নয় ; ভয়ঙ্কর, বীভৎস, ন্যক্কারজনক···ছিন্নমস্তা !···অদ্ভুত কল্পনা···নিজের মুণ্ড কেটে রক্তপান ···কল্পনাই বা কি করে বলি? ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি ; বাঘা যতীন, সত্যেন বসু, কানাইলাল···শিবনাথ শাস্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি সত্যেনকে আশীর্বাদ করে এলেন, কানাইকে তো করলেন না?" শাস্ত্রীমশায় জবাব দিয়েছিলেন, "কানাইকে আশীর্বাদ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অনেক জন্ম তপস্যা দরকার"···ও-রাস্তায় তো যাই নি। সে সাহস কোথায়?···মানুষ নয় এঁরা—দেবতা।···১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবো ঠিক করেছিলুম। দয়ালদা বললেন—

: খুব ভাল কথা। দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে—শুভ বাসনা, সৎসংকল্প ;

সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ব্রতী হবে। কিন্তু…

ঃ কিন্তু কি?

ঃ ছুটো কথা ভাববার আছে। প্রথমতঃ, সংসারের অবস্থা। অনেকটাই তোমার ওপর নির্ভর। তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দিলে বাপ-মাকে পথে বসাবে।

ঃ ঐ ভাবনা ভাবলে দেশমাতৃকার সেবা করা চলে?

ঃ তা মানি। কিন্তু বাস্তব সম্বন্ধে জাগ্রত না থাকলে পরে হৃদয়দৌর্বল্য আসতে পারে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু জেলে যাওয়া, এবং জেল থেকে বাড়ী ফিরে আসা—এ-করে দেশের সত্যিকার সেবা হয় না; শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে যতোদিন সিদ্ধিলাভ না হয়। রামা-শ্যামা হয়ে লাভ কি? কিন্তু মুখ্য কারণ এটা নয়।

ঃ মুখ্য কারণটা কি?

ঃ সংস্কার। তোমার ঈশ্বরীয় সংস্কারটাই প্রবল, বা স্বধর্ম। পরধর্ম ভয়াবহ হতে পারে।

ঃ ভয়াবহ কেন?

ঃ একটা জীবনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ঃ ছুটো এক সঙ্গে চলে না?

ঃ সংস্কার-বিরোধী হলে চলে না। তোমার চলবে না। নিষেধ করছি না তোমাকে; তবে আমার মত হচ্ছে, স্বধর্মকে আশ্রয় করে চলাই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শিত পথ।

ঃ কিন্তু দেশের সেবা—

ঃ একাধিকভাবে সম্ভব। ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার দিয়েছেন, সেই সংস্কার নিয়ে চলাই ভগবৎ-সেবা। তাঁর সেবায় শুধু দেশ নয়,… বিশ্বের সেবা হয়। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।…

…কোথায় সেই সংস্কার? খুঁজে পাই না। নেতাদের মতো জেলে গেলে হতো, নিশ্চিন্তে থাকতুম। সে-ও ফাঁকি। বিবেক বলবে, 'পালিয়ে আসলে কি হবে? আমার দংশন থেকে নিস্তার নেই'।…রেহাই কি এখানেই পাচ্ছি?…সন্ন্যাস নিলে হয় না? চোখে ধুলো দেওয়া সার। নিজে খেটে এখন সংসার চালাচ্ছে; গেরুয়া নিলে আমি খাবো পরের ওপর আর সংসারের পাঁচজন খাবে ডাস্টবিন থেকে।… সমস্থার সমাধান হয় না। আত্মহত্যা? কালী ভাইঝি যেমন করেছিল? ছেলেটা আর খিদেয় ট্যাঁ ট্যাঁ করে না; কাকীমা দূরদূর করে তাড়ান না;

গেঁজেল সোয়ামী বুঁদ হয়ে আর পড়ে থাকে না···চাল-বাড়ন্তের লেঠা চিরদিনের মতো চুকে গেছে···নাঃ ; জেলে যাওয়ার মতো-ই প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা। শাস্ত্রও বলে, মরা মানে ঘুমিয়ে পড়া, ঘুম ভাঙলে যথা পূর্বম্ তথা পরম্···প্রশ্নটা থেকেই যায়। কেন এই দুঃখ? এই বীভৎসতার মানে কি? এই সুন্দর ভুবনে কেন অসুন্দর? Why at all? বুঝি না।···দংশনটা বিবেকের; ভোগাদিতে মজে আছি বলেই বৃশ্চিকদংশন···ভোগের ইচ্ছাটাকে যদি উপড়ে ফেলা যায়? মুক্তির সন্ধান তো দেহধারণ করেই চালানো সম্ভব। তার রাস্তা বুদ্ধ-দর্শিত বাসনা-ত্যাগ। শান্তি পাবো কিনা জানি না, কিন্তু বিবেকের পীড়ন থেকে হয় তো রেহাই পেতে পারি। প্রজহাতি যদা কামান্—কিন্তু শিখে এসেছি 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। ত্যাগ করা যায় কি ভাবে? বৈরাগ্য এলে? বুদ্ধদেব একটি মড়া, একটি বৃদ্ধ, একটি রোগী দেখে সংসার ত্যাগ করলেন। আমি তো মৃত, মুমূর্ষু, রুগ্ন, আর্ত, ইত্যাদির পর্বতপ্রমাণ স্তূপ দেখেছি, কিন্তু বৈরাগ্য আসে না কেন? বড়জোর শ্মশানবৈরাগ্য দেখা দেয়। তা নইলে দিনের পর দিন উদরপূর্তি করি কোন্ লজ্জায়? রুচি নেই? শুধু দেহধারণের জন্য? বাজে কথা। চা খাই···কাগজ পড়ি···বাজার করি···সাহেবকে সেলাম দিই···বিকেলে চোঁয়াঢেকুর তুলে ময়দানে বেড়াই···লড়াইর খবর শুনি···এমন কি বায়স্কোপের ছবিও দেখি···কোথায় দুঃখবোধ? মনটা খারাপ হয়। ভোগোপকরণ আছে, বৃশ্চিক দংশন-ও আছে···রাস্তায় এতদিন পেয়েছি শুভ্র মেঘের রথ, নির্মল নীল পথ, ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বন-গিরি-পর্বত···হঠাৎ দিশাহারার ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছি···সব রাস্তাই বন্ধ···জীবনের চারদিকে নেবে আসে আঁধারের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর···শ্মশানের মড়া আগলে আগলে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন রাজা হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন—

"আয় ঘুম! আয়!"

বিস্মরণের অমানিশায় যাক এই দুনিয়া ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে!

আয় ঘুম! আয়!

(৪)

ওমর খৈয়ম বিশ্ববিধানকে ঢেলে সাজতে চেয়েছিলেন ; পারেন নি। অগত্যা ডুব দিয়েছিলেন, এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার। রামপ্রসাদ ডুব দিয়েছিলেন 'ডুব দেরে মন কালী বলে হৃদিরত্নাকরের অগাধজলে'। রূপসাগরে ডুব

দিয়ে, দীপ্-দীপ্-দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বেলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তলাতল পাতাল খুঁজে-ছিলেন, পেলেন হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। শেলী-ও রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলেন, মরলেন লবণ সমুদ্রে। রূপসাগরে দু-চার ডুব দিয়ে অরূপ-রতনের জায়গায় পেয়েছি ডাকিনী, প্রেতিনী, কবন্ধ...শেয়াল, কুকুর...বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে থাকাই ভাল। ছিলুমও।...১৯৪৫ সালে গান্ধিজীর একটা প্রার্থনা সভায় এক বন্ধু টেনে নিয়ে গিয়েছিল...সব কো সন্মতি দো ভগবান্...বেশ ঘুমুচ্ছিলুম, জাগিয়ে দিলেন গান্ধিজী...ভারতের অমানিশায় একমাত্র জ্যোতিষ্ক, ভারতীয় তপশ্চর্যার দীপ্ত হোমাগ্নি,...আসমুদ্রহিমাচলের ভাস্বর প্রতীক! হে মহাত্মন্! তোমাকে প্রণাম!...ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর্তভক্তকেও উদার আখ্যা দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত পাই ভাগবতের গজ-গ্রাহ সংবাদে; গজরাজ তদেকশরণ হয়ে মুক্তি পান গ্রাহের কবল থেকে। সমগ্র ভারত আজ গ্রাহের মুখগহ্বরে। কোটি কোটি ভারতীয়ের পুরোহিত মহাত্মাজী; তদেকশরণ হয়ে আমাদের নিয়ে চলেছেন কল্যাণের পথে, মৈত্রীর স্বারাজ্যে। হাতে অসি নেন নি, হিংসার ক্রুদ্ধ পতাকা ওড়ান নি; শুধু গেয়েছেন দুর্গতিহরণ মঙ্গল নাম—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতা রাম।

রাস্তার উচ্চাবচে যখন কলুষ দেখা দিয়েছে, প্রতিভূ হয়ে অনশন করেছেন, আকুল হয়ে ডেকেছেন 'নির্বলকে বল রাম'। গজরাজ তদেকশরণ হয়েছিলেন নিজের মোক্ষার্থে; মহাত্মাজী তদেকশরণ হয়েছেন সমগ্রজাতির মুমুক্ষা নিয়ে। হে মহাতপা! হে ভক্ত-কুলাগ্রগণ্য! হে অহিংসার পূজারী! তোমাকে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।...

কিন্তু আলো অতিক্ষীণ, বারবার নিবে যায়। চেষ্টা করি, ভগবানের শরণাপন্ন হই, জপ করি 'নির্বলকে বল রাম'; গান্ধিজীর দীপশিখায় আবার পথ খুঁজি, নেবে আসে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বিভ্রান্ত হই। মনটাই ভেঙ্গে গেছে। তপস্যা চাই? তদেকশরণতা চাই? অবসাদের মূঢ়তায় কিছুই ভালো লাগে না। উপোস করি, পারের কাণ্ডারীকে ডাকি...কিছুতেই আস্থা নেই...কি যেন একটা হয়ে গেছে...পথও পাইনা, সোয়াস্তিও পাই না...

ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥

আর্নল্ড্-এর একটি কথা প্রায়ই মনে আসে—standing between two worlds—one dead, the other powerless to be born; পুরনোকে

আঁকড়াতে গেলে পাই ছাইভস্ম; পরপারে কি আলোর জগৎ আছে? ··কে জানে?···অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে আর কতদিন চলা যায়?

মা আমায় ঘুরাবি কত,
(কলুর) চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, প·ক দিতেছ অবিরত॥

জীবনের দিনগুলি মোর এমনি ভাবেই কাটবে? মণিদা গাইতেন,

আমায় লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।
আমার খেটে, খেটে, খেটে, জনম গেল কেটে
তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায়॥

দয়ালদা বলছিলেন, বিরহের কান্না তো এখনো বাকী! এর কি শেষ নেই? আরও দুর্ভোগ আছে?···পাশের বাড়ীতে সেদিন কে ভজন গাইছিল। সাধারণ সুর; সুরও নয়; শুধু বেদনাপ্লুত স্বরে রামজীকে ডাকা—বিশ্বের অবসাদ যেন রূপ নেয় সেই করুণ আহ্বানে···কিন্তু এ তো কেবলই কান্না! অসহায় আর্তি! নির্জীব গোঙানি!···জীবনের বীর্যবত্তা, এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা, সত্যসন্ধানের অকুতোভয়তা—সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে লাভে মূলে মরণেরি সিন্ধুকূলে। নরকের ছবি দেখিয়ে মা কালী কালের কোলে ফেলে দিয়েছেন···

কোলে তুলে নে মা কালী
কালের কোলে দিস্ না ফেলে।

॥ ৫ ॥

কিছুদিন হলো ক্ষেপু মন্ত্র নিয়েছে। গুহ্যাতিগুহ্য সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে শ্রীভগবানকে জালে ফেলবার চেষ্টা চলছে। আমাকে কিছু বলে না, এড়িয়ে চলে; যদিও কানে সব খবরই আসে। দেখা ময়দানে। ক্ষেপুর আনন্দ আজ ধরে না; ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। জিজ্ঞেস করি—

: কেমন আছিস?

: আর কেমন! কলকাতার ওপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেল! সেণ্টার-ফরওয়ার্ড চমৎকার খেলেছে। ও যা শটু, গোলীর সাধ্যি আছে থামায় ওকে?··

: আদায়পত্র কেমন হচ্ছে?

: তা গুরুর ইচ্ছায় মন্দ নয়···ওদের ফরওয়ার্ড লাইন্ এককদম বাজে···

: গুরুর ইচ্ছায় মানে ?

: ও ! তোকে বলিনি বুঝি ! খুব বড় মহাত্মা, নাম কৈলাস বাবা ; বিশ বছর তিব্বত আর কৈলাস করেছেন ; শুধু বরফ আর বরফ ; অতি দুর্গম স্থান, লোকালয়ের বহু দূরে। সেখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

: চেহারা কি রকম ?

: তপ্তকাঞ্চন আভা, আজানুলম্বিত বাহু, আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী, আঁখি সদাই ঢুলুঢুলু···

: গাঁজা খান নাকি ?

: তুই যেমন গাধা প্রশ্নটিও—

: বুঝেছি। আঁখি ঢুলুঢুলু মদিরা পানে। গাঁজার চাইতে মদ ভাল।

: বুঝতে তোর এখনো অনেক দেরি। মদিরাই বটে, ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে ক্ষরিত হয়। ঢুকলো মাথায় ?

: না।

: তা জানি। পুঁথিগত বিদ্যায় এসব তত্ত্ব বুঝা যায় না। এজন্মে আর তোর হলো না কিছু ; ঘুরে আসতে হবে।

: আপত্তি নেই, কিন্তু আফসোস এই যে তোকে আর পাবো না। হুট্ করে অনেকটা তো উর্ধ্বে উঠেছিস, এই জন্মেই একটা ব্যবস্থা করে দে না ?

: তোর এখনো দেরি আছে।

: কেন ?

: বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।

: আমার জন্য তা হলে ঘুরে আসবি তুই ?

: ও সব ইয়ারকি ছেড়ে কোনও মহাত্মার চরণাশ্রিত হয়ে যা। আশ্রিত না হলে—

: ঈশ্বরকে ত্যাগ করে মাংসপিণ্ডের আশ্রয় ?

: গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করতে নেই।

: গুরুজী আহারাদি করেন তো ? তুই যা পেটুক, খেঁটের ব্যবস্থা—

: আচ্ছা, আসি আজ।

: গোসা হলো ? কতোদিন পরে দেখা ! ইস্টবেঙ্গল জিতেছে, কোথায় ইলিশমাছ-ভাতে খাওয়াবি, তা না—রাগ করে, মুখ ঘুরিয়ে, ছেলেমানুষের মতো—

: বেশ তো, চল।

: ও ভাবে বললে কি আর যাওয়া যায়? তবে লোভ হচ্ছে ঠিকই। ইলিশ-মাছ-ভাতে বৌদি যা করেন! সত্যিই উপাদেয়।

: উপাদেয় নয়, অপূর্ব। বাংলাদেশে পারবে কেউ? আর শুধু মাছ-ভাতেই বা কেন? ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক, কাঁটা দিয়ে ছাঁচি কুমড়োর তরকারি, ডিমের ডালনা; ফুলকপি দিয়ে কৈমাছের ঝোল, চালতের অম্বল, বাসমতী চালের পায়েস···গুরুদেব বলেন—ঐ যা! আজকে যে লক্ষ্মীবার, নিরামিষ; পূজো-আচ্চা আছে অনেক—

: তাতে আর কি হয়েছে? হবে আর একদিন। একটু মাংস—

: মাংস নিষিদ্ধ—গুরুদেবের আদেশ।

: ভাল কথা, বউদি-ও নাকি মন্ত্র নিয়েছেন?

: ছেলেমেয়েরা-ও।

: ছেলেমেয়েরা! তারা মন্ত্র দিয়ে কি করবে?

: গুরুদত্ত বীজ, নিজেই নিজের কাজ করে।

: ক্ষ্যাপা তুই চিরকালের, কিন্তু এমন বদ্ধ পাগল হয়েছিস জানতুম না।

: যা বুঝিস না তা নিয়ে ফাজলামি করিস না। আচ্ছা আসি।

: একদিন যাব'খন, ছেলেদের ভেতর মন্ত্রের বীজ কি রকম গজাচ্ছে দেখে আসবো।

: বাড়ীতে আজকাল আমি খুব কমই থাকি।

: রববার?

: রববার তো দম ফেলবার সময় নেই আমার।

: অর্থাৎ যেতে মানা করছিস?

: তা নয়; তবে মানুষের সরল বিশ্বাসে আঘাত করলে পাপ হয়। সেই পাপের ভাগী বরং নাই হলি।

ক্ষেপু তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠে পড়লো।···ও চিরদিনই মাছ-মাংসের পরম ভক্ত, কিন্তু গুরুর আদেশে নিরামিষ চালিয়ে অসুখে পড়ে। এখন নিষেধাজ্ঞা শুধু মাংসের ওপর, যদিও ছেলেরা দোকানে এন্তার ফাউল-কারি চালায়; গুরুদত্ত বীজের প্রভাবে তা হয়তো গঙ্গাজল হয়ে যায়। পরমহংসদেব বলেছিলেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? কিন্তু বোকা না হলে দেখছি ভক্ত হওয়া যায় না; যতো বেশী বোকা ততো বেশী ভক্ত। মানুষ নিজেকে কতো ভাবেই না ঠকায়! মাংস ছেড়েছে; কিন্তু উপুরি বেড়েছে—গুরুর কৃপায়! খরচ ও হয়ে যায় গুরুজীর

খেট ও মচ্ছবের চাহিদা যোগাতে।…চোখে জল আসে; ক্ষেপুও গুরুকৃপায় পর হয়ে গেলো!… বাড়ী এসে দয়ালদার চিঠি পেলুম…শুয়ে শুয়ে চিঠির কথাগুলো আওড়াই…নিষ্ফল চিন্তায় লাভ শুধু আয়ুক্ষয়…বাজে চিন্তা ছাড়ো…ভগবানের নাম করো… তাঁকে দুঃখ জানাও, আর্তিহর ভগবান্ সকল দুঃখ মোচন করবেন… হয় তো…নিষ্ফলচিন্তা… বটে-ও; কিন্তু ছাড়তে পারি কৈ?…বন্ধুজন কে কোথায় ছিটকে গেছে…বাইরের যোগ যেখানে আছে প্রাণের যোগ সেখানে নেই… অন্তরঙ্গ যারা ছিল তারাও পর হয়ে যাচ্ছে—অন্তরের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান…ক্ষেপুও কাছে গেলে দূরে সরিয়ে দেয়…দয়ালদা ভালবাসেন, স্নেহ করেন, আন্তরিক উপদেশ দেন—কিন্তু রোগ সারে না; দূর থেকে রোগটা হয় তো বুঝতে পারেন না, দূরত্বই বেড়ে যায়…রাঁচীর মাস্টারমশায়! একবার ঘুরে আসলে হয়…রাঁচীতে আছেন কি? কোথায় আছেন তাও তো জানি না…এক ভরসা ছিল ভগবান্ …রাত্রির অন্ধকারে তাঁকেও খুঁজে পাচ্ছি না…এই বিশাল জগতে আমি একা… অসহায়…নিঃসঙ্গ…we mortals live alone...হায় ভগবান্! তুমিও আমায় ত্যাগ করলে?… Oh God, my God! hast thou forsaken me?…রজনী অন্ধকার…গভীর, কালো, মিশমিশে অন্ধকার…ও কে?…ও কে? কঙ্কাল! …কে কে?…জিভ বের করে ছেলেটাকে গলা টিপে মারছে!…কালী! কালী! কালী!…

॥ ৬ ॥

যেমনি age of angst তেমনি উন্মনস্তার ব্যাধি; যুগের ঋণ শোধ করতেই হয়… ভুগে উঠলুম অনেক দিন। একটু বাড়াবাড়ি নাকি হয়েছিল। জানিনা। নার্ভাস্ ব্রেক-ডাউন্ গোছের; সময় নেয়। এখন সেরে উঠেছি। হলোও অনেক দিন, প্রায় আড়াই বছর। কী ভাবে যে কেটে গেলো—স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমঃ। ডাক্তারবাবুর আদেশে ঘুরলুম অনেক—সাঁচী, অজন্তা, ইলোরা, দেওগিরি, ঔরঙ্গাবাদ, বম্বাই, পুণা, বাঙ্গালোর, তাঞ্জোর, মাদুরা, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম, মান্দ্রাজ, ওয়ালটেয়ার, ভিজাগাপট্টম্। আমরা সাধারণতঃ গয়া-কাশী, মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে থাকি, দক্ষিণে বড় একটা যাওয়া হয় না। ওদিক-কার দৃশ্যে অভিনবত্ব আছে বলে ডাক্তারবাবু ওদিকেই যেতে বললেন। চিল্কা-পুরী-ভুবনেশ্বর যাওয়ার সংকল্প ছিল; কিন্তু জরুরী তার পেয়ে বাড়ী ফিরেছি। যাকগে, অনেক ঘুরেছি; ও-তিনটে আর একবার দেখা যাবে। ছুটিও প্রায় শেষ; দুদিন ঘরেই বিশ্রাম করা যাক।

ঘরে বসে ভাবি, কী দেখলুম ? কিছুই দেখি নি···কতকগুলো আব্‌ছা ছবি চোখের ওপর দিয়ে চলে গেছে, মনকে স্পর্শ করেছে কিনা জানি না···একবার কেষ্টদার সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়েছিলুম মাকে না জানিয়ে ; ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারি, ছোট্ট ছেলে, মা হয় তো যেতে দিতেন না। ···রাধাচক্রের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম, সেই ফাঁকে কেষ্টদা কোথায় তলিয়ে গেল। আর পাঁচজনকে দেখে লোভ সামলাতে পারলুম না, এক পয়সায় রাধাচক্রে চক্কর খেয়ে নিলুম। নাবতে আর পারি না, মাথাটা গুলিয়ে গেছে···দোকান পাট, লোকজন, রাধাচক্র, সব ঘুরপাক খাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে কেষ্টদাকে খুঁজি, কিন্তু সব গুলিয়ে যায়···দু-চারবার হয়তো দেখেও থাকবো কেষ্টদাকে ; না দেখার সামিল, চরকির মতো সব ঘোরে। কেন উঠতে গেলুম রাধাচক্রে ? সম্বল ছিল একটি পয়সা, সাধ ছিল মুড়িমুড়কি খেতে খেতে বাড়ী যাবো···এখন ঘুরপাক খাচ্ছি···যদি কেষ্টদার দেখা না পাই ! পিছন থেকে বিরাশি সিক্কার এক কিল ; 'কোথায় লুকিয়ে ছিলিরে দেবু ? খুঁজে খুঁজে হয়রানি।' কেষ্টদার কিল খেয়ে মনে হলো রাধাচক্রটা থেমেছে। সবকিছু চোখের সামনে সহজভাবে ভাসছে দেখে চোখে জল আসে। কেষ্টদা ভাবে, মার খেয়ে কাঁদছি ; হাতে বুটভাজা গুঁজে দিয়ে বলে, 'নে, খা ; চল্ এবারে বাড়ী···'

কলকাতা ফিরে মনে হচ্ছে, একটি কেষ্টদার এখনও প্রয়োজন—যিনি শক্-থেরাপি দ্বারা মনের সহজ অবস্থাটা ফিরিয়ে দেবেন।···দেখেছি অনেক কিছু, অর্থাৎ জল, মাটি, পাথর, গাছ ; গাছ, পাথর, মাটি, জল ; ঘূর্ণমান চলচ্চিত্রের অসহায় দ্রষ্টা। কাজকর্ম স্বুরু করেছি। ডাক্তারবাবু বলেন, 'যা না করলে নয় শুধু তা-ই করবেন, কোনো কিছুতে মাথা ঘামাবেন না ; মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যাবেন, ছোট ছেলেদের মতো চেঁচাবেন ; আর গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে পারেন'।···কতো গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছি ইয়ত্তা নেই। দাক্ষিণাত্য দেখার মতো—কতকগুলো ছবি, যখন যেটা চোখের সামনে আসে, দেখি ; পরক্ষণেই ভুলে যাই। কে খুন করলো, কোন্ গোয়েন্দা ধরলো, কি করে ধরলো, কার কী নাম, কে লিখেছে—কিছুই বলতে পারবো না। এই রাজ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, কোনো কিছুর বালাই নেই ; বাজে ঐ প্রশ্নগুলোর ঝামেলা থেকে দিব্যি ভুলে থাকা যায়। এইজন্যই পড়ি—ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু কী ভুলে আছি, কেন ভুলে আছি, ভুল ভাঙবে কি না, কবে ভাঙবে, এসব চিন্তা উঁকি মারলে ক্রাইম্ ক্লাব (Crime Club)-এর আর একখানা বই নিয়ে আসি। শেষ হলেই

মন সাদা সেলেট ; অথবা সেলেটের হিজিবিজি লেখা, দু-চার দিন পর নিজে থেকেই মিলিয়ে যায়। যাক্। সময়টা কাটে তো।···

অসুখের সময় একটি দৃশ্য চোখে ভাসতো···এখনও দেখি···এইন্‌শেন্‌ট্ মেরিনার (ancient mariner) সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে চলেছে জগতের সবকিছু পিছনে ফেলে···বিয়ে বাড়ীতে সানাই বাজে, রাগ তিলক-কামোদ···'মৈঁ কৈসে জায়ূঁ'র রেশটুকু কিছুতেই মিলিয়ে যায় না···তারপর অ্যালবেট্রসের হত্যা ··'সনি সনি স ঋ স' থেমে গেছে···অথৈ জল, পার নেই কূল নেই, শুধু জল আর জল··· পিপাসায় ছাতি ফাটে···এক ফোঁটা জলও নেই মুখে দেওয়ার···জীবনের সব রস সাগরের নোনা জল···আকাশে আগুন ধক্ ধক্ করে···সাগরে কৃমি, কীট, সরীসৃপ···ঘিন্‌ঘিন্ করে গা···মড়াগুলো জাহাজের এখানে, ওখানে, সেখানে··· অসীম সাগরের অফুরন্ত জল, সব নোনা···এইন্‌শ্যান্‌ট্ মেরিনার একা··· alone, alone, in the wide, wide sea···এপর্যন্ত বুঝি, তার পরেরটুকু আর বুঝি না—I blessed them unaware! নরকের পর বৃন্দাবন এলো কি করে?···বিভীষিকা দেখে?···উপোস করে?···প্রায়শ্চিত্তের ফলে?··· প্রেমলাভের সাধন কি এই? ··গোঁজামিল মনে হয়। কোল্‌রিজ্ (Coleridge) মরুভূমির ঊষরতা জেনেছিলেন; মরূদ্যানের সন্ধান পাননি। প্রেমের অধ্যায় তাঁর অনুভবের বাইরে ; গতানুগতিকের তাগিদে মিলনের হিন্দোল রাগ ধরেছেন, 'ঝুলনে ঝোলে শ্যামরায়' গেয়ে গান শেষ করেছেন। অহল্যাকে তিনি বুঝতেন a grief without a pang, void, dark and drear ; আমিও বুঝি। তারপর আর বুঝি না। ভাবিও না। ডাক্তারবাবুর নিষেধ আছে। ভাবনা তবুও আসে ; তখন চিড়িয়াখানায় যাই, পশুদের ছোলা-বাদাম খাওয়াই··· বাঁদরের কিচিরমিচির শুনি, ভেংচিকাটা দেখি···গণ্ডারের চামড়া—আমাদের চাইতে পুরু কি?···হরিণের ভয়-চকিত নয়নে বোধ হয় এখনো ভেসে ওঠে ঝোপঝাড়ের কালো ছায়া আর বাঘের জ্বলন্ত চোখ ; হরিণের দিকে তাকালে চোখ ছলছল হয় ···নম্র, কোমল, শান্ত, the gentlest of creatures in the world ; ভরতমুনির প্রিয় জীব। তাই কি জন্মান্তরে হরিণ হলেন? নম্র, কোমল, শান্ত ভাবকে সর্বান্তঃকরণে ভোগ করবার জন্য?···সাপের দিকে যাই না, সহ্য করতে পারি না ; গেলে। 'লাউকুন' (Laocoon) এর ছবি মনে হয়—ইংরেজরা যেমন ভারতের ওষ্ঠে-পৃষ্ঠে-ললাটে জড়িয়ে···হাঁসগুলোর দিকে যাই···এখানে পরম তৃপ্তি ···দেশের বাড়ীতে শোবার ঘরে একখানা ছবি ছিল—পাহাড়ের ধারে একটি ছোট্ট

পুকুর ; গাছের ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে ; নির্জন বিবিক্ত পরিবেশ ; জল শান্ত, স্তব্ধ। কার এই 'বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতির্জনসংসদি' ?...পুকুরের মাঝখানে একটি মরাল—ধ্যানস্থ ; মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকতুম...কী এর মানে ? দয়ালদা ছবিটি দেখে একদিন বলেছিলেন, 'বাঃ! খাসা ছবি—

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে

স এবাগ্নিঃ সলিলে সংনিবিষ্টঃ।

ভুবন, সলিল, অগ্নি, হংস...কী একটা সাড়া জাগে, কিন্তু বুঝিনা ; তবুও চেয়ে থাকি...হাঁসগুলোর কী আনন্দ ! খেলছে, সাঁতার কাটছে, ডুব দিচ্ছে, উৎফুল্ল হয়ে আনন্দ জানাচ্ছে...যেমন এককালে আমরা ছিলুম...কোথায় লুকিয়ে গেল সেই জগৎ ?...ধেৎ, ঐ কথাই উঁকি দিচ্ছে ; দু-হাতে সরিয়ে দিই। ফিরতি পথে ক্রাইম্ ক্লাবের আর একখানা বই কিনি এস্প্ল্যানেড্ থেকে...বেশ নেশা...খুনে কে? Who done it ? দেখাই যাক...বোধ হয় 'ঘ'...না, 'খ'...উহুঁ, নির্ঘাত 'ক'... শেষ পাতায় দেখি 'ঙ'। হাঁ, 'ঙ'-ই তো বটে ; মাথায় যা পাগড়ি, খুনে না হয়ে যায় ! প্রথমেই তো ওর কথা ভাবা উচিত ছিল...কিন্তু 'ঘ'—ও তো হতে পারতো...'ঙ' !...যাক্‌গে, মরুক গে, ঘুমই এবার।...দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে...মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু...মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট পূরণ...দেব নারায়ণ...শ্রীমধুসূদন...বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী... নম্র, কোমল, শান্ত—the gentlest of creatures...

কোথায় বনমালী ?...

কোথায় বৃন্দাবন ?...

॥ ৭ ॥

ইতিমধ্যে কতো কিছু-ই না ঘটে গেল ! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমঃ ? রাধাচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছি না তো ? ভারত স্বাধীন !...বিশ্বাস-ই হচ্ছে না ! আরও অসম্ভব মনে হয় এই যে মহাত্মাজী নেই ! অহিংসার পূজারীর মৃত্যু আততায়ীর গুলিতে !...এ-ও সম্ভব ?...হতভম্ব হয়ে ছিলুম অনেকদিন...মহাত্মাজী নেই !... ১১৫ বছর পরমায়ু ছিল, কিন্তু সত্যিই নেই। প্রয়োজন আমাদের মিটেছে, আর কী দরকার ?... আমরাও ঠকেছি...ভারত দ্বিখণ্ডিত, বঙ্গভঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত... তবুও স্বাধীন তো ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি...পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ছেলেরা চিরদিনই ঝগড়া করে এসেছে ; কিন্তু কী এমন তাড়া ছিল ঝগড়া থামাবার ?...

ধৈর্য হারিয়ে ফেললুম। রক্তারক্তি দেখে যে তাঁরা ভয় খেয়ে গেলেন ; হাঁ, ভয়ই, ইনক্লাব জিন্দাবাদের বুলি কপচালে কী হবে ? দস্তুর মতো ভয় খেয়ে গেলেন। ক্রান্তিকারী, revolutionary, বিপ্লবী, কতো-কি—শেষে ভয়ে ভয়ে রাতারাতি বাঁটোয়ারা !···যাক গে, মরুক গে ; ভাইয়ে-ভাইয়ে যখন বনছে না, থাক আলাদা··· উভয়ে-ই শান্তিতে আজাদী ভোগ করুক।···ঘোর অদূরদর্শিতা, ঘোরতর কাপুরুষতা, মহাত্মাজীর দৃষ্টি ঠিক ছিল ; কিন্তু মেষ আমরা নইতো মানুষ···শেষে মেষপালকও বিভ্রান্ত হলেন !-···আমরা যখন ভুল পথ নিয়েছি, গান্ধিজী সরে দাঁড়িয়েছেন, সায় দেন নি ; ভুলকে তাই শুধরে নেওয়া গেছে। হঠাৎ মতিভ্রম হ'লো কেন ? যাকে পাপ বলে জেনেছিলেন তাকে বর্জন করলেন না কেন ?···মায়ার কুহেলী ? অপত্য স্নেহের অন্ধতা ?···তবুও বিচলিত হইনি। বাপুজী তো আছেন ; কিছু কাল থাকবেনও ; সব ঠিক হো জায়েগা। সবই বেঠিক হয়ে গেলো ! শ্মশানে খুব চেঁচালুম, তারস্বরে চীৎকার করলুম—বাপুজী অমর হো গয়েঁ। হলেন কি ?···সোক্রাতেসের কথা মনে হয় ; যাকে সত্য বলে জেনেছেন নির্ভীক ভাবে তার প্রচার করেছেন ; যাদের সত্যনিষ্ঠ করতে চাইলেন তারাই বিষ খাওয়ালেন ; অম্লানবদনে হেমলক পান করলেন। হাসিঠাট্টা শেষ পর্যন্ত ; অন্তিম মুহূর্তে শিষ্যকে বলেন, 'ভাল কথা, ভুলেই গিয়েছিলুম ; মন্দিরে একটা কুক্কুট বলির মানত করেছিলুম ; বলির ব্যবস্থা করে দেবে। আসি।'·· অদ্ভুত চরিত্র ! আমাদের দেশে এর দৃষ্টান্ত পাই শহীদদের জীবনে—যতীন মুখুজ্যে, ক্ষুদিরাম, যতীন দাস, সূর্য সেন, প্রীতি ওয়াদ্দেদার···অহিংসার রাস্তায় মহাত্মাজী ···'সব কো সন্‌মতি দো ভগবান্‌'···কৈ দিলেন ? অহিংসার প্রতিষ্ঠা কোথায় হলো ? অহিংসার পূজারী শহীদ হলেন হিংসার যূপকাষ্ঠে। শহীদ হলেন, কিন্তু অমর হলেন কি ?···আমাদের ভিতর তিনি বেঁচে আছেন কি ? কৃতিত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। অহিংস-পন্থীরা বাপুজীর দোহাই দিয়ে বলেন, স্বরাজ আমরাই এনেছি, আমাদের-ই ভোগ্য। সহিংসবাদীরা বলেন, সিংহল, ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হলো কী করে ? আজাদী এসেছে হিট্‌লর-তোজোর লগুড়াঘাতে এবং ১৯৪২-এর প্রচণ্ড অভ্যুত্থান ও নেতাজীর আক্রমণের মাধ্যমে। মহাত্মাজী থাকলে ব'লতেন :

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম।

পতিত-পাবন রঘুপতিকে আমরা আর আমল দিই না, দম্ভ করে বলি মৈনে আজাদী ছিন লী ! মহাত্মাজী বেঁচে আছেন কি ? পটে আঁকা ছবি বা মঞ্চে

রাখা পাষাণ মূর্তি হ'য়ে নয়, নৈমিত্তিক ফুলের তোড়ার বিবেকদংশনে বা বিস্মরণে নয়—জ্যান্ত মানুষের বুকে তাজা ঘা হয়ে বেঁচে আছেন কি ?·· ভাষণ দিচ্ছি, ধূপধুনো জ্বালাচ্ছি, 'রঘুপতি রাঘব' করছি, বাপুজীকে কবর দিয়ে তাঁর নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছি·· প্রাণের স্পন্দনে, হৃদয়ের অনুভবে, স্মৃতির বেদীতে, চিন্তার শুভ্রতায় তিনি নেই—আছেন রাজসিক প্রহসনে···

গিয়েছিলুম দিল্লি একটু কাজে। রাজঘাটে যাই নি। হাতে একটা রববার ছিল, শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভেবেছি···মহাত্মাজীর বুকের রক্ত···তাজা, গরম, টকটকে রক্ত ঝলকে ঝলকে পড়েছে এখানে! জমে যায় নি ?···সমগ্র দিল্লি সহর যখন ধ্বংসস্তূপ হবে, পথঘাট যখন ইট-পাথর আগাছা ও জঙ্গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর চতুর্দিক হবে দুর্গম অরণ্য, যখন মহীরুহগণ করতালি দিয়ে মাথা নুইয়ে মহাত্মাজীকে প্রণাম জানাবে, তখন ঝিল্লিমুখরিত যমুনার পাড় দিয়ে কাঁটাগাছের ফাঁকে ফাঁকে রক্তাক্ত দেহে এগিয়ে গিয়ে দেখবো মহাত্মাজী বুকের রক্ত দিয়ে রামজীকে পুজো করছেন, নবদূর্বাদলশ্যামকে কাঁচা রক্ত দিয়ে স্নান করাচ্ছেন···প্রতি শোণিতবিন্দু মুখর হয়ে বলছে—

হে রাম, হে রাম, হে রাম··

* * * * *

কোথায় মহাত্মাজী ?···কোথাও খুঁজে পাই না তাঁকে। কুটোগাছটির মতো আবর্তে পাক খেয়ে চলছি—যেখানে আরম্ভ সেখানেই শেষ ; আবার পাক খাই ; এগুতেও পারিনা, বেরুতেও পারি না···শিয়ালদ স্টেশন দিয়ে গতাগতির মতো। দিনের পর দিন টানা-প'ড়েন করি···বিষাক্ত হাওয়া, বিষাক্ত ছায়া, বিষাক্ত আর্তনাদ···কতো আর উদ্বাস্তু দেখবো ? মানুষ পারে এভাবে থাকতে ?··· কুকুরবিড়ালের চাইতেও অধম, নরকের চাইতেও বীভৎস···মগর হিন্দুস্থান আজাদ হৈ ?···আজাদীর ভালো ভাগ-বাঁটোয়ারা···এই নরকের পাপ দিয়ে রোজ পঞ্চাশহাজারী মোটরগাড়ীতে 'গান্ধিজন' করে যাতায়াত অবিরাম পয়োনালী সম, উড়িয়ে দুর্বিনীত দম্ভপতাকা···রোল্‌স্ রয়স্ না হলে ভারতের মর্যাদা হানি হয় ? অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন গান্ধিজীর দেশে ? বিপর্যস্ত শরণার্থীর অশ্রুনদীতীরে ?··· কতো আর দেখবো! দেখে দেখে পাষাণ হয়ে গেছি···কোনো কিছুর-ই মানে হয় না·· গান্ধিজী থাকলে কী করতেন ? উদ্বাস্তুদের মাঝে বসে যেতেন,

রামজীকে ডাকতেন, উপোস করে আমাদের বিবেক উদ্বুদ্ধ করতেন, রঘুপতির নিকট প্রার্থনা করতেন—সবকো সন্‌মতি দো ভগবান।···বৈকুণ্ঠ থেকে আমাদের দিকে চোখ ফেরান না যেন···বুকের ঘাটা টনটনিয়ে উঠতে পারে...ভালয় ভালয় গেছেন···রামনাম করে জিরিয়ে নিন···শান্তিতে ঘাটা শুকিয়ে যাক···

* * * * *

ভারতে ঠাকুর-দেবতার সংখ্যা বড় কম নয়—উনকোটি, চুরাশি লক্ষ। বাড়াবাড়ি মনে হয়, কিন্তু অনেকেই বেঁচে নেই। এক যুগের ঠাকুর অন্য যুগের নুড়ি; কালেভদ্রে আনুষ্ঠানিক ধূপধুনো জোটে হয়তো, কিন্তু সত্যিকার পূজো পান না; নুড়ি জমে জমে পাহাড় হয়; উনকোটি কী আর তেমন বেশী? পাঠ্যাবস্থায় আমাদের ঠাকুর ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী; পরাধীনতার গ্লানির ভিতর নীতি ও ধর্মের বেদীতে আদর্শের অনুধ্যান ছিল···এযুগের ঠাকুর কালো বাজার, সিনেমাস্টার, ঠাট ও আত্মম্ভরিতা। যেমন দেখবে তেমন শিখবে। ছেলেদের বলা হয়—চরিত্র গঠন করো, ডিসিপ্লিন্ শেখো, দেশকে গড়ে তোলো। যাঁরা উপদেশ দেন তাঁরা কিন্তু দুর্নীতির কালাপাহাড়, অসংযমের বন্যা, দেশের রক্তচোষা জোঁক, মাংস-খেকো কুমীর, হাঙর। বিরাট মিথ্যাচার, পর্বত-প্রমাণ ভণ্ডামি, অনাবিল আত্মপ্রবঞ্চনা। ফল—ছেলেরা বায়স্কোপ দেখে, বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে, সারা বছর ধর্মঘট করে, পরীক্ষায় চুরি করে, ইন্‌ভিজিলেটরকে ঠেঙায়, হেডমাস্টারকে খুন করে, ভাইস্-চ্যানসেলরকে কয়েদ করে···সিনেমার কোন্ তারকার অসুখ করেছিল—বুলেটিন দেখবার জন্য ছেলেদের কী ভিড়! তারকার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য মারামারি হয়ে যায়···"এটা কি তোমাদের ঠিক হচ্ছে?" ভাইপো উত্তর দেয়, "সকলের হাঁড়ির খবরই জানা আছে। ঐ তো সেদিন বক্তৃতা দিয়ে গেলো, 'মৈঁনে ক্যা কিয়া হৈ! মাদকদ্রব্য বর্জন ইত্যাদি'—অথচ নিজেই একটি মদের পিপে···আপনি আচরি ধর্ম······" পোষাকের কী ঘটা! আমাদের আমলে ছিল এক জোড়া চটি, এক জোড়া ধুতি, একটি কামিজ। সেজেগুজে যারা আসতো তাদের নাম ছিল 'নাতজামাই,' 'নবাবপুত্তুর' 'আলালের ঘরের দুলাল'। এখন? সাহেবী পোষাকটাই রেওয়াজ হয়ে গেছে, ধুতিকামিজে লঘিমাবৃত্তি কাজ করে, সুতরাং বর্জনীয়।··· সরস্বতী পূজোর সময় ছাত্রাবাসগুলোতে শুনতুম ওস্তাদজীদের গান-বাজনা অথবা মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা এবং 'হরিশ্চন্দ্র'

জাতীয় পুরনো যাত্রা। এখন অভিশপ্ত 'মাইক'এর কল্যাণে শুনতে হয় 'লারেলাপ্পা'র বিস্ফোরণ—মা সরস্বতীর কান জর্জরিত, প্রতিবেশীর প্রাণ অতিষ্ঠ। 'মা' সরস্বতী ? মাতৃপূজো এ যুগে অচল। ক্ষেপু বলছিল, এবার নাকি সিনেমার তারকাদের মডেলে (!) সরস্বতীর মূর্তি বানান হয়ে ছি···'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—চুলোয় যাক। বেঁচে থাক 'অশ্রদ্ধয়া লভতে পাশম্'।···কোথায় ধর্ম ও নীতি ? কোথায় moral ideal···তামসিক অনাচারে দেশ ডুবে গেছে···এই রৌরবপয়োধিজল রোধিবে কে ?···মহাত্মাজী থাকলে প্রার্থনাসভায়···অন্য দেবতার যুগ এটা, সুতরাং রাজঘাটে ফুল চড়িয়ে গাই 'রঘুপতি রাঘব···

* * * *

পুরুষগুলো চিরদিনই একটু উড়নচণ্ডে, বেআক্কেল। দেশের ধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মায়েরা। তাঁরাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন, বা দিচ্ছেন। এখন নাকি মধুর ভাবের 'প্রগতি'-সাধনা চলছে। সেকেলে সুর (রামপ্রসাদী)—

মনের বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী, কালী ॥

আধুনিক সুর—

নূপুরের মতো বাজিবো চরণে চরণে,
আঘাত করিয়া ফিরিবো দুয়ারে দুয়ারে ;
সাধিয়া মরিবো ইঁহারে, তাঁহারে, উঁহারে,
বাঁচিবো হাজার মরণে।

আমার এক ভাই পুলিশে চাকরি করে, দুর্নীতি-নিবারক সংস্থায়। ও বলে শুধুই টাকার শ্রাদ্ধ, কোনো কাজই হয় না ; ধরলে কি হবে ? দিল্লিতে গেলেই সব ধামা চাপা। কিছুদিন আগে কার্যোপলক্ষে দিল্লি গিয়েছিল। স্থানীয় একজন সহকর্মীকে নিয়ে একটি জাতীয় মহাজাতিসদনে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। খবর এলো পেটেলজী মারা গেছেন। বিমূঢ় হয়ে ভাবে, তাই তো···সহকর্মীর তাগিদে এগয় ; ঘুরতে ঘুরতে জাতীয় সৌধের এক পাশে দেখে একটি 'বার' (Bar)—মেয়েপুরুষে এন্তার মদ খেয়ে নরক গুলজার করে আছে। হতভম্ব হয়ে সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাপার কী হে ? এমনি ধারা মদ চলছে ?'

: পেটেলজীর মৃত্যুতে শোক হয়েছে যে !

ঃ এদিকে বুঝি এমনিই রেওয়াজ ?

ঃ আগে ছিল না, এখন হয়েছে—নববিধান।

ঃ গান্ধিজীর মাদকদ্রব্য বর্জন ?

ঃ হরিজনদের জন্য ; এঁরা মহাজন।

ঃ মায়েরা-ও ?

নহ মাতা, নহ কন্যা ;
তুমি অকুণ্ঠিতা, অসম্বৃতা বিশ্বের প্রেয়সী,
বেলেল্লা উর্বশী।
তোমার মদির গন্ধ…

* * * *

ঃ দেবু যে ! ক্ষেপুকে ভুলিসনি তা হলে ?

ঃ ভোলা কি যায় ? এক পেয়ালা চা, আর খবরের কাগজটা।

ঃ খবরের কাগজ ! খবরের কাগজ দিয়ে কী হবে ?

ঃ খবর দেখবো, তাজা খবর যাকে বলে।

ঃ খবরের কাগজে খবর থাকে নাকি ?

ঃ কী থাকে ?

ঃ বক্তৃতা আর বাক্যবীরদের ছবি। এক ছবি রোজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর বক্তৃতা ? থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। কে ঐ বিদকুটে ছবির দিকে তাকায় ? 'বক্তিমা' পড়ে কেউ ?

ঃ একটু চোখ বুলিয়ে নিতে হয় বৈ কি ?

ঃ বাজে বকিস না। কেউ পড়ে না। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি ; সকলেই বলে, হ্যাঁ, ঐ একটু ; মানে পড়ে না। পড়া উচিত নয়।

ঃ উচিত নয় কেন ?

ঃ অনেক কারণে। প্রথমতঃ বক্তৃতা কিছু কম শুনেছিস্ ? সুরেন বাঁড়ুজ্যে-বিপিন পাল থেকে কতো যে জ্বালাময়ী কথা শুনলুম, কতো হাততালি দিয়েছি, কতো জয়ধ্বনি করেছি। থকে গিয়েছি, ঘেন্না ধরে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, বক্তৃতায় কোনো ফলই হয় না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, বঙ্গবিভাগ, ভারতবিভাগ, কাশ্মীর আক্রমণ, কাশ্মীর সমস্যা, পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ, বিশ্বযুদ্ধ—বক্তৃতায় থেমেছে

কোনোটা। মীমাংসা হয়েছে কোনো কিছুর? তারপর দেশবাসীকে উপদেশ—ও-তো লেগেই আছে। শোনে কেউ? শুনবেই বা কেন? নিজেরা তো টাকা নিয়ে মচ্ছব চালাচ্ছে, আর উপদেশের বেলা আমরা? চালাকির আর জায়গা পায় না? ইয়ারকি পেয়েছে? পাঠশালার ছাত্র আমরা? গোঁফে তা দিয়ে যে বড় লেকচার ঝাড়ছে? লাঠি ঘুরিয়ে যে .ড় কাপ্তেনি করছে? লোকে 'বক্তিমা' ধুয়ে খাবে? টাকার দাম চার আনা হয়েছে, খবর রাখিস? যা মাইফেল চালাচ্ছে টাকার দাম এর পর কানাকড়ি হবে। দেখে নিস্ তুই।

ঃ খুব চটে আছিস দেখছি। ইস্ট বেঙ্গল হেরেছে নিশ্চয়?

ঃ বাজে কথা ছাড়।

ঃ আসল কথাটা কী? "দরবারে না পেয়ে ঠাঁই?"

ঃ টেক্স।

ঃ টেক্স? কিসের টেক্স্?

ঃ হাত-সাফাই টেক্স বা indirect tax।

ঃ ও, পকেট থেকে টাকা উধাও হয়েছে?

ঃ তোর মাথা হয়েছে। বক্তৃতার জন্য টেক্স দিতে হচ্ছে।

ঃ বুঝলুম না।

ঃ তুই কাগজ রাখিস তো?

ঃ রাখি।

ঃ কাগজে কী থাকে? বক্তৃতা। বক্তৃতা পড়ে না কেউ, তবুও কাগজ কিনে যাচ্ছে। ধরে নিলুম তুই পড়িস। পয়সা লাগে তোর?

ঃ তা লাগে বৈ কি?

ঃ কিসের জন্য লাগে? বক্তৃতাগুলোর জন্য, জবুদ্গব ছবিগুলোর জন্য। বোকা পেয়েছিস আমাকে? কাগজ বন্ধ করে দিয়েছি।

* * * *

গীতাতে আছে দৈবী সম্পদের কথা।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ,
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্,

ভবতি সমানং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।

পৌরাণিক যুগের কথা, প্রগতির দিনে কুহেলীর মতো শোনায়। বললে, হাঁ করে থাকে; ভাবে, লোকটার মাথা খারাপ, ধর্মের নেশায় পেয়েছে, মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি কোথায় দুপয়সা ক'রে নেবে তা না, দৈবী সম্পদ্! Stuff and nonsense! এই ভারতের মহামানবের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এরা—গীতা, উপনিষৎ ইত্যাদি। ধম্ম-ধম্ম করেই গেল দেশটা···যারা বোঝে, যারা উৎকট প্রগতিপন্থী নয়, তারা হাসে; মন্তব্য করে, সে রামও নেই অযোধ্যাও নেই; অচল টাকা চালাতে গেলে লাভ হয় বিড়ম্বনা। বটেও। মাণিক নাকি আজকাল পয়সা করেছে; সোনার মাণিক ছিল, এখন কালো বাজারের এক উঁচু দরের মহাত্মা···যুগটা কীভাবেই না বদলে গেল—Evil, be thou my good। এখন দিন হচ্ছে তাদের জোর গলায় যারা বলতে পারে কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া; আসুরিক সম্পদ্ কিন্তু কর্তা ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে সকলেরই পরম বাঞ্ছিত··· বিষ্ণুপুরাণের ঘোর কলি—"ততশ্চ অর্থ এবাভিজনহেতুঃ, ধনমেব অশেষধর্মহেতুঃ, অভিরুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুঃ, অনৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ, স্ত্রীত্বমেব উপভোগহেতুঃ, রত্নতাম্রভাগিতেব পৃথিবীহেতুঃ, অন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ—আভিজাত্য শুধু টাকার, ধার্মিক মানে বিত্তশালী, ইন্দ্রিয়ার্থে পাণিগ্রহণ, মিথ্যা মোকদ্দমাজয়ের সাধন, স্ত্রীমাত্রই উপভোগক্ষেত্র, অর্থই ভূমিলাভের হেতু, এবং দুর্নীতি জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। প্রাচীন হলেও শাস্ত্রকারদের অদ্ভুত দূরদৃষ্টি··· মহাত্মাজী যে সব আদর্শ বা values আমাদের সুমুখে রেখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিদায় নিয়েছে; ওঁর তপস্যারচিত বেদীতে বসিয়েছি এক বিরাট দানব, অতিকায় বুল-ডোজার (bull-dozer) যে সব কিছু পিষে ভূমিসাৎ করে চলছে; বেদীটিও হয়েছে ছাতুছাতু···উদ্বাস্তু। জাতটাই তো আজ উদ্বাস্তু হতে বসেছে, ইওরোপের ভাসমান জনস্রোত···ছন্নছাড়া দিন-মজুর···গৃহ নেই, গৃহধর্মও নেই; ঠাকুরঘর নেই, ঠাকুরও নেই; তুলসীমঞ্চ নেই, সেঁজুতিও নেই; মাটি নেই, মাটির রসও নেই; মাটিতে যে শেকড়গুলো এতোকাল আঁকড়ে ছিল, উপড়ে তাদের ফেলে দেওয়া হচ্ছে।···ইওরোপের দানবধর্ম নূতন করে বেছে নিয়েছি···সে দিন গিয়েছিলুম এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দেশে তাঁর চকমিলান বাড়ী ছিল, আম-কাঁঠালের বাগান ছিল; পুকুরে মাছ ছিল, ক্ষেতে প্রায় বছরের ধান হতো; রান্নাঘরের পিছনে শাক-সবজির বাগান—সেখানে ফলতো লাউ, কুমড়ো, বেগুন,

ঝিঙ্গে, শসা, শিম, লঙ্কা, যেদিনের যেটা; নিজে খেতেন, পরকে বিলতেন। পেনশন নিয়ে পাকা একখানা ঘর করেছিলেন···পালিয়ে এসেছেন উদ্বাস্তু হয়ে। আছেন বাগবাজারে এক অন্ধ গলির অন্ধকূপে। বসতে মাদুর দিলেন, কিন্তু জমিন এতো সেঁতসেঁতে যে কাপড় ভিজে ওঠে; দরমার বেড়াকে গোবর দিয়ে পোক্ত করা হয়েছে, দুর্গন্ধে বমি আসে; চুলোতে আগুন দিয়েছে সব, চারদিক অন্ধকার, দম বন্ধ হয়···

ঃ এই নরকে আছেন কি করে?

ঃ যাব কোথায়?

ঃ গাছতলা এর চাইতে—

ঃ মেয়েদের নিয়ে গাছতলায় যাই কি-করে? সেখানেই কি ভেবেছ জায়গা আছে; ঠাঁই নেই রে দেবু, কোথাও ঠাঁই নেই।

ঃ কোনো বিহিত করা যায় না?

ঃ অসম্ভব। পঞ্চশীলের আওতায় পড়ে গেছি যে!

ঃ মানে?

ঃ বক্তৃতা, টেক্স, দুর্নীতি, আত্মীয়-পোষণ, বহ্বাড়ম্বর—এই পঞ্চশীল নরক গুলজার ক'রে আছে। তার উপর আমরা বাঙ্গালী—সেখানেও পঞ্চশীল। গান্ধিজীকে আমরা আমল দিইনি, বাংলার প্রভাব কংগ্রেসে কিছুই নেই, এতটুকু জায়গা—লোক অনেক; হিন্দ-হিন্দু-হিন্দি—আমরা হিন্দি জানিনা; তারপর শরণার্থী—ন ঘরকা, ন ঘাটকা। কী উপায় হতে পারে?

ঃ চেষ্টা-চরিত্র করলে—

ঃ কসুর করি নি। পাঁচ-সালার চাপে আরো মরেছি।

ঃ এরা আবার কারা?

ঃ 'কারা' নয়, 'কী'; অর্থাৎ five year plan; বাংলা ভাষায় ঐ এক অসুবিধা মূর্ধন্য-দন্ত্য-তালব্যের উচ্চারণ-ভেদ নেই। সুবিধা-ও আছে।

ঃ পাঁচ সালার চাপ, ঠিক বুঝলুম না।

ঃ এক পাঁচ-সালা যাবে, আর এক পাঁচ-সালা আসবে। এ নিয়েই সকলে ব্যস্ত, কারণ বন্যার জলের মতো টাকা ঘরে আসছে। উদ্বাস্তুদের দেখে কে? আন্তর্জাতিক সমস্যাও আছে তো! U. N. O.-তে চীনকে ঢোকানো, সুয়েজ সমস্যা, হাঙ্গারী সমস্যা, এটম্ বোমা সমস্যা, বিশ্বমৈত্রী সমস্যা···এসব-কিছুর সমাধান করা চাই তো? এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বাস করি আমরা, বিশ্বের দরবারে

আমাদের কী মহিমান্বিত স্থান! টি-বি-তে মরলেও ভারতের জয়-জয়কার হচ্ছে তো! শুনেও শান্তি।

: B. C. G. নিয়েছে সব?

: কী হবে নিয়ে?

: ওটা প্রতিষেধকের কাজ করে।

: সেজন্যই তো নিচ্ছি না।

: সেজন্যই মানে—

: মানে টি-বি হওয়াটা-ই তো বাঞ্ছনীয়। এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

: ছেলেরা—

: রোজ ঝুলে আপিসে যায়, রোজ ঝুলে আপিস থেকে ফেরে; তারপর এই নরককুণ্ডে মাথা গোঁজে। আমিও বলি না, ছেলেরাও চায় না। পঞ্চশীলের জয়-জয়কার হক; আমরা মরতে পারলেই বাঁচি।

* * * *

মহাত্মাজী বেঁচে থাকলে কী করতেন?…নিষ্ফল চিন্তা। তাঁকে তো আমরা রামজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি…বোধ হয় সেজন্যই আমাদের উপর রামজীর অভিশাপ…একটি একটি করে জীবনের সব স্বপ্নই বালির ঘরের মতো ধ্বসে পড়ে…কোনো illusion-ই ভগবান্ রাখেন নি যাকে ধরে বেঁচে থাকা যায়!… কী হবে?…কে জানে? মহাত্মাজীর জীবনের সব চাইতে বড় ট্র্যাজিডি এই যে একটিও যোগ্য মন্ত্রশিষ্য রেখে যেতে পারেন নি; রেখে গিয়েছেন শুধু তাঁর মৃত্যুর অভিশাপ…কোথায় এর পরিণতি?…শাম্বকে নিমিত্ত করে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ নিপাত করেছিলেন। আমাদের অদৃষ্টে কী আছে? তানহং ক্ষিপাম্যজস্রম্ অশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু—ধ্বংস নয় তো?…কে জানে?…

* * * *

ইওরোপের ঊষরতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে—টি-এস-ইলিয়ট (T.S. Eliot)-এর Wasteland; one world-ই বটে, সকলেরই এক দুরবস্থা…ওঁ শান্তিঃ

(om shanti) পাঠ করে কবিতা শেষ করলেই কি শান্তি আসে?…ইলিয়টের ন্যায় সকলেই মরুভূমিতে পথ হারিয়ে পিপাসায় আর্তনাদ করে চলেছে…কেউ বা এরই ভিতর মলস্তূপ তৈরি করে আসন বিছিয়ে নেয়…আমার এক বন্ধুপুত্র ছিল পাগল; হাতের কাছে যা পেতো তা দিয়ে মাটি খুঁড়তো। 'কী করছিস রে?' 'কুয়ো খুঁড়ছি।' 'কী হবে কুয়ো দিয়ে?' 'পৃথিবী এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবো।'…সে ভাবেই গেলো, কুয়োতে ঝাঁপিয়ে। লাশটা ছিল কুয়োতেই, কিন্তু প্রাণবায়ু পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করে ও-পিঠ দিয়ে বেরিয়ে ছিল কিনা ভগবান্ জানেন…পাথর, বালি ও কাঁটাগাছে মরুভূমির সব রাস্তা নিশ্চিহ্ন… মরুভূমির আবার রাস্তা!…উপরে আগুন, নীচে আগুন…মরুভূমির বুক চিরে রাস্তা খুঁজি, অথবা নালী ধরে এগই জীবনধর্মের তাগিদে…ইওরোপ একদিন চেয়েছিল, আলো—আরও আলো; এখন চায়, রক্ত—আরও রক্ত…আদিম বর্বরতা। জীবন, সাহিত্য, শিল্পকলা, সর্বত্র এক রোগ, schizophreniaর নানা রূপ অভিব্যক্তি—Primitivism, Barbarism (les fauves), Cubism, Abstract Art, Futurism, Expressionism, Dadaism, Sur-realism…Automatism, Infantilism, Vorticism…Fascism-Imperialism; Democracy-Communism. পৃথিবী এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবার নানাবিধ চেষ্টা…আকাশ জ্বলে, মরুভূমি জ্বলে, চিতার আগুন জ্বলে চিতে…উড়ো কতকগুলি চিত্র চোখে ভাসে…Picassoর Guernica…Van Goghএর The Prison Yard… Gauguinর The Tahitians…Nevinson এর La Patrie…Spencer এর The Resurrection…Bayesএর The Underworld…Daliর Suburbs… Dali ও Bunuelএর The Andalusian Dog (চলচ্চিত্র)…Ensorএর Skeletons Warming Themselves…Paul Nashএর Sunrise: Inverness Copse…Duchampএর L. H. O. O. Q.…Alfred Jarryর Ubu…এক মন্ত্র Je cherche le neuf, পারো তো নূতন কিছু করো; এক তাৎপর্য—মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর ও-পিঠ দিয়ে বেরুবার চেষ্টা…খুঁজি আনন্দের রাস্তা, পাই আগুন, রক্ত, ছাই, অন্ধকার—মরুভূমি। পল ক্লী (Paul Klee)-র 'বন্যা' ভাসিয়ে নেয় ধ্বংসের পথে সহরের পর সহর—Flood Swamps Cities… মরুভূমি…বালুর প্রচণ্ড ঝড়…একটি একটি করে সব সৌধ বালিচাপা পড়ে… দিনের পর দিন মরুভূমি এগিয়ে আসে বিশ্বের ক্ষুধা নিয়ে…আগুন…বালি…ঝড় …কোথায় নবদূর্বাদলশ্যাম?

কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে ;—
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া !
কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি
গেছি পাসরিয়া॥

কোথায় বনমালী ?···কোথায় বৃন্দাবন ?···শাপমুক্তি কি হবে না ?

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥

হে ভগবান ! কোনোই যে আর সম্বল নেই ! জীবনের সুখদুঃখে, ঝড়ঝাপটায়, সুদিনে দুর্দিনে তোমার দিকে চেয়েই পথ চলেছি···এমন আড়াল হয়ে গেলে ! কী নিয়ে আর বাঁচি ?...পার উতর গয়ে সন্ত জনা রে। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে। দয়ালদা বলেন, নাম করে যাও। করি, কিন্তু ভিতরটা শুকিয়ে গেছে···যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি···অভ্যাস জড়তা মনে হয়, ভালো লাগে না···ঈশ্বর যদি আছেন তবে এতো দুঃখ কেন ? জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষায় এমন আগুন জ্বালিয়ে দেন কেন ?···দয়ালদাকে আর কিছু বলি না ; বললে কষ্ট পান, ভগবান্‌কে নালিশ জানিয়ে কাঁদেন···কী দরকার ? আপনাতে আপনি থাক মন···রাঁচী যাবো ? মাষ্টার মশায়ের কথা প্রায়ই মনে হয়··· **sweetest of souls I have known**—কথা মধু, আচরণ মধু, স্বভাব মধু, অন্তর মধু,···আপন জন···কিন্তু তিনি···সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয় চলে যান নি তো !···যাঁর জোরে আপনাতে আপনি থাকা যায় সেই পরাণবন্ধুই যে আড়াল হয়ে আছেন !···জীবনের এই দুর্বহ বোঝা কতো কাল আর টানবো ! আর যে পারি না !···নির্বল কে বল রাম···হে রাম, হে রাম, হে রাম···

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকলি গরল ভেল

(খ)

কাশীধাম

কাশীধাম

॥ ১ ॥

অনেকদিন থেকে কাশী যাওয়ার ইচ্ছা; মামাবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে সুবিধা হয়ে গেলো। গিয়ে দেখি ভালই আছেন, তেমন কিছু হয় নি। কোন্ এক সাধুবাবা হাত দেখে বলে দিয়েছিলেন, 'এখন-তখন অবস্থা; যে-কোনো মুহূর্তে হার্ট ফেইল করতে পারে।' বুকটা ধড়ফড়ও করছিল ক'দিন থেকে; তাই শেষ দেখা দেখবার জন্য আমাকে জরুরী তার। ডাক্তারবাবু সজ্জন লোক, মামাবাবুর বন্ধুস্থানীয়; দেখে বলেছেন, 'কিছুই হয়নি আপনার; বেশী মিষ্টি খাওয়াতে পেটে বায়ু জমেছিল। এই বয়সে ২০।২৫টা সন্দেশ চলবে না—বড় জোর চারটে।' আমি সায় দিয়ে বলি,

ঃ ঠিকই তো বলেছেন ডাক্তারবাবু।

ঃ আগে যে ৪০।৫০টা খেতুম।

ঃ এখন বয়স হয়েছে তো।

ঃ তবে আর নেমন্তন্ন খেয়ে লাভটা কি ?

ঃ না-ই বা খেলেন।

ঃ সে বড় শক্ত কথা হলো না ?

ঃ কেন ?

ঃ মড়া পোড়াবো, আর নেমন্তন্ন খাবো না ?

ঃ ডাক্তারবাবু যখন নিষেধ করেছেন—

ঃ বাজে কথা। দু-দশটা মিষ্টি খেলেই মরে যাবো ? আগে যে—

ঃ কিন্তু এই দুর্দিনে কে আর নেমন্তন্ন করছে ?

ঃ সে কথা যথার্থ। এই তো সেদিন—

ঃ লিষ্টিতে নাম ছিল না ? ভালই হয়েছে। লুচি-মিষ্টি আজ কাল যা-তা দিয়ে তৈরী হচ্ছে। যুদ্ধের পর থেকে তো ঘি একদম উধাও; ঘিয়ের নামে যা চলে তা হচ্ছে চর্বি। তাইতো অসুখে পড়েছিলেন।

ঃ হুঁ। তা বটে। নেমন্তন্ন খাওয়া দেখছি ছেড়েই দিতে হবে।

ঃ একদম ছেড়ে দিন। এই তো সেদিন—গত রববার বোধ হয়—পাশের বাড়ীতে—

: খামলি যে ?

: বলবো আপনাকে ?

: ভয় পাবো ভাবছিস ? কতো মড়া পোড়ালুম ! শ্মশান সাধনা করেছি, জানিস ? মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে দেখবি আমার খাতির কতো !

: এখানে যদি মরি তা হলে তো কোনোই হেঙ্গাম পোয়াতে হবে না ?

: হেঙ্গাম বলিস কিরে ? রাজার হালে—ধেৎ ! কী যে সব অলক্ষুণে কথা বলিস !

: ঐ যা ! আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আপনার জন্য কলকাতা থেকে কি এনেছি বলুন দেখি ?

: কলকাতার মিষ্টি আমি মুখে-ই দিই না।

: মিষ্টি না ; অন্য জিনিস। খলশে মাছ, কৈ মাছ, ঢেঁকির শাক, বেতের ডগা, কল্‌মিশাক ; আর এক শিশি কাসুন্দি।

: কেন এসব জিনিস আনতে গেলি ?

: এখানে পাওয়া যায় না তো।

: তা বটে। কতো কাল যে এসব জিনিস খাইনি ! বেঁচে থাক। বাবা বিশ্বনাথ তোর মঙ্গল করুন। মা ব্রহ্মময়ী তারা ! কী যে করলি ! সোনার বাংলা ছারখার করে দিলি !

: করলুম তো আমরাই।

: লেখাপড়া শিখে বুঝি তোর এই বুদ্ধি হয়েছে ?

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি॥

আজকাল এসব কথাই ভাবি শুয়ে শুয়ে।

: ব্রহ্মময়ী তারার কথা ?

: উঁহুঁ। অসুখে একা পড়ে থাকতুম, এলোমেলো সব কথা মনে আসতো... ছোট মেয়েদের ব্রতকথা—

মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল, সোনার কুণ্ডলে ঢেলে ঘি
(আমরা) বড় মানষের পুত্রের ঝি।

তারপর পুকুর পাড়ে সূয্যি-প্রণাম। মনে আছে তোর ?

: হুঁ।

ওঠো ওঠো সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
'না উঠিতে পারি আমি হিমের লাগিয়া'।
হিমের পঞ্চঘুঁটি শিয়রে থুইয়া
সূয্যি ওঠবেন কোন্ খান দিয়া ?
'বামন বাড়ীর ঘাটিখান দিয়া।
বামনের মেয়েরা বড় সেয়ান,
পৈতা যোগায় বিহান, বিহান।'

ঃ বেশ তো মনে আছে তোর ! আর কী মনে আছে ?

ঃ মামা বাড়ীর ছড়াঃ আম পাকে ; জাম পাকে ; মামাবাড়ী বেথুন[১] পাকে।

ঃ তুই ভুলিস নি এসব ? কতো দিন যে এসব খাইনি !

ঃ কোন্ সব ?

ঃ এই বেথুন, লটকা, করঞ্জা, পাকা গাব। কতো রকমের মাছই না ছিল ! বাঁশপাতা, সুবর্ণখড়কা, কাচকিগুঁড়া, পাবদা, বউজা···কী দেশ ছিল ! সোনা ফলতো ! সব ছারখার হয়ে গেলো ! মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, যাই একবার দেশে ; বর্ষার দিনে, নৌকো করে ঘুরবো—

ঃ আর লটকা-করঞ্জা খাবেন ? ও-সব চিন্তা ছাড়ুন। কাশীতে আছেন ; মাকে ডাকুন ; বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করুন ; কথা, কীর্তন, ভজন, এসব শুনুন ; সাধুসঙ্গ করুন। কাশী তো সাধুসঙ্গের জায়গাই।

ঃ সে কথা যথার্থ। মহাতীর্থ কাশী ; আর সাধুর তো মেলা বসে আছে, দর্শনেই পুণ্যি হয়।

ঃ আচ্ছা মামাবাবু ! ভাল সাধু কেউ আছেন ?

ঃ সাধুর আবার ভালমন্দ কি রে ?

ঃ হ্যাঁ, মানে, এই যেমন হরিহর বাবা।

ঃ সাক্ষাৎ শিব রে, সাক্ষাৎ শিব। অমন সাধু আর হয় না।

ঃ তাঁকে দর্শন করেছিলেন ?

ঃ দর্শন বলিস কিরে ? কতোবার মাথা লুটিয়েছি। বছর খানেক আগে এলি না ! সাক্ষাৎ শিব ছিলেন।

ঃ ঐ থাকের সাধু কেউ আছেন এখন ?

---

(১) বেত-ফল

: পাগল না ক্ষ্যাপা! পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করতে পারতেন! অমনটি কি আর হয়?

: রাস্তা ঘাটে যে এতো সাধু দেখা যায়—?

: ভিখিরীর দল; লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে। আমি যে এতো কাল আছি, আমিই সেদিন বোকা বনে গেলুম। বেশ চেহারা লোকটার—মাথায় জটা, গায়ে ভস্ম, হাতে চিমটা, মুখে বম্‌বম্‌ববম্; দেখলেই ভক্তি হয়। দিলুম হাতটা বাড়িয়ে।

: হাতটা? বাড়িয়ে দিলেন!

: হ্যাঁরে। বয়স হয়েছে তো! মাঝে মাঝে পরমায়ুটা পরখ করিয়ে নিতে হয় না?

: কী বললেন হাত দেখে?

: দেড়শ বছর পরমায়ু। দিলুম পাঁচটা টাকা। তারপর ডাক্তারবাবুর কাছে শুনি, লোকটা এক নম্বরের ঠগ। গেলো তো গচ্চা?

: শোনা যায়, এঁদেরই ভিতর দু-এক জনা খুব উঁচুদরের মহাপুরুষ আছেন; গা ঢাকা দিয়ে থাকেন, ধরাছোঁয়া দেন না।

: আমিও শুনেছি—ডাক্তারবাবুর মুখে। তবে ঐ যা বললি, ধরাছোঁয়া দেন না।

: থাকেন কিভাবে?

: কিছুই বলা যায় না। কখনো পাগলের বেশে; কখনো ছেঁড়া কাঁথা গায়ে, দুর্গন্ধে ঘেঁষা যায় না; কাছে গেলে থুথু ছিটিয়ে দেন। অথচ ভিতরে টনটনে জ্ঞান, সদাশিবের অবস্থা।

: কিন্তু ধরা যায় কি করে?

: সে-ই তো বড় শক্ত কথা হলো না?

: সাধুদের তো কৃপার শরীর, আমাদের কৃপা করবেন না?

: নিশ্চয় করবেন। সাধুরা কৃপা না করলে সংসার যে উচ্ছন্ন যেতো!

: একটা খটকা—

: কী আবার খটকা? তোর বড্ড খুতখুঁতে মন। চিরকালটাই। কিছুতেই সোয়াস্তি নেই তোর।

: খটকা মানে, ভাবছিলুম আমাদের মতো পাপীতাপীদের যদি কৃপা না করেন?

: তবে কি সাধু মহাত্মাদের কৃপা করবেন? তা হলে আর কৃপার শরীর কি করে হলো

ঃ কিন্তু ধরবো কিভাবে? সাধারণ মানুষের মতো ওঁরা থাকেন না?

ঃ ওঁরা কি আর সাধারণ মানুষ?

ঃ আপনি এতোকাল কাশীতে আছেন, দু-এক জনাকে নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন?

ঃ বড় দুরূহ ব্যাপার রে দেবু।...হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু বলছিলেন, অসীঘাটের কাছে নাকি একজন ভাল মহাত্মা আছেন।

ঃ মহাত্মাজীর কী নাম?

ঃ নাম তো জানা নেই, তবে লোকে নাম দিয়েছে দুর্বাসা মুনি। বড্ড কড়া লোক। যাবি তো ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিস্।

॥ ২ ॥

পরম পবিত্র ধাম কাশী, মোক্ষধর্মের পীঠস্থান, আর্য উপনিবেশের প্রাচীন তীর্থ, কাশিকা, মহাশ্মশান, বারাণসী, বরুণা ও অসীর সঙ্গমস্থল, 'অবিমুক্তঃ...বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি,' বরণা ও নাশীর মধ্যস্থান জীবরূপ অবিমুক্ত বারাণসী,[১]

বিশ্বরাজ্যে জীবাত্মার মুক্তিনিকেতন।
ভূতলে ত্রিদিব কাশী আনন্দকানন॥

এতং ভগবতা বারাণসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, এই ঋষিপত্তন বারাণসীর মৃগদাবে ভগবান বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, প্রচার করেন শান্তির মহতী বাণী 'অকুপ্পা মে চেতো বিমুত্তি, অয়মন্তিমা জাতি, নত্থিদানি পুনব্ভবোতি', অবিনাশী আমার নির্বাণমুক্তি, এই আমার অন্তিম ভবচংক্রমণ, আর আমার জন্মান্তর নেই। নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধসস্।... শোনা যায়, এই ঋষিপত্তনেম মুসংহিতার টীকা রচনা করেন কুল্লুকভট্ট, নিরুক্ত রচনা করেন যাস্ক, ব্যাকরণসূত্র প্রণয়ন করেন ভগবান্ পাণিনি, এবং শারীরকভাষ্য প্রণয়ন করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ আচার্যশঙ্কর। ঋষিদের গোড়াপত্তন হয় তো করেন মহর্ষি কপিল ও গৌতম, কারণ সাংখ্যসূত্রের এবং ন্যায়সূত্রের প্রচার নাকি এই বারাণসীতেই প্রথম হয়। তারপর ইতিহাসের কতো ঢেউ চলে গেছে...... রাজা জয়চন্দ্র...সুজন সিংহ...বেণীমাধবের ধ্বজা ও ঔরঙ্গজেবের অপকীর্তি... মনসারাম...বলবন্ত সিংহ...ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে চৈৎ সিংহের যুদ্ধ ও গবাক্ষ-পথে পলায়ন...শিবালয় ঘাটে 'খালিমহল'...

---

(১) শারীরকভাষ্য ২-২-৩২

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ,
পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহর্নিশম্,
মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে,
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।

কিন্তু চৈৎসিংহের গতি হয় নি···স্বপ্ন সৌধ ভারতের ইতিহাস···বুদ্বুদ···ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে···কাশীধাম মহাশ্মশান···কোথায় আনন্দকানন? মামাবাবুর প্রিয় গানটি শুনলুম সকালবেলা—

আমি যাই রে ভাই সেই আনন্দকাননে।
সংসারের লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে॥
ভূতের বোঝা আজকে ভূতে মেশাইবার শুভ দিন।
ঘটাকাল আজকে আমার মহাকাশে হবে লীন।
রন্ধ্রগত বায়ু আমার মিশবে মহা সমীরণে॥
নিত্যানন্দ ধাম সে যে, সদাই আনন্দময়।
পিতা সদানন্দ আমার, মাতা যে আনন্দময়ী।
যার লাগে পরমক্ষুধা, খেতে দেয় আনন্দসুধা।
তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের আজ, এতো আনন্দ মরণে॥

কোথায় আনন্দ? কেবলই মরণের কালো ছায়া!···অশেষ অমঙ্গলের পিছনে সত্যিই কি শিব লুকিয়ে আছেন?···পাক খাই, ভাবি, আবার পাক খাই···ঘুরলুম আজ অনেক···মন্দিরময়ী নগরী···ঘাটের তো অন্ত নেই···তুলসীদাসজীর সমাধিতীর্থে প্রণাম করি···কতো কথাই মনে হয়···মিনতি জানাই—

ইতনী মিনতি রঘুনন্দন সে দুখদ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী,
আপনপদপঙ্কজপিঞ্জরমেঁ চিতহংস হামারা বৈঠাও জী।
"তুলসী"-দাস কহে কর জোড়ি ভবসাগর পার উতার জী॥

···বিশ্বনাথজীর মন্দির!···হে বিভো বিশ্বনাথ! হে প্রভো শূলপাণে! হে মহাদেব শম্ভো! হে মহেশ! হে শিবকান্ত শান্ত! হে স্মরারে পুরারে!

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে।
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে॥

···অন্নপূর্ণার মন্দির!···মা অন্নপূর্ণা!···চোখে জল আসে···কোথায় তুই অন্ন দিলি?···লক্ষ লক্ষ লোক 'হা অন্ন', 'হা অন্ন' করে শুকিয়ে মরলো!···গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি!···রাত কি পোহাবে না?

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,
জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

···মনের অন্ধকার কাটে না···তমসো মা জ্যোতির্গময়···অন্তহীন তমিস্র···জীবনটা হয় তো অন্ধকারে ঠোক্কর খেতে খেতেই শেষ হয়ে যাবে মণিকর্ণিকার চিতাগ্নিতে···মহাতীর্থ কাশী! মৃত্যু এখানে সকলেরই কাম্য—মোক্ষ হয়। মরে তো কতো লোকই, মণিকর্ণিকার চিতাভস্মে সব শেষ হয়···তারপর? কী হয় কে জানে?···গয়া বিষ্ণুস্থান, বিষ্ণুপাদ দর্শনে মহাপ্রভুর প্রেমলাভ হয়েছিল। কাশী শিবস্থান: এখানে মোহান্ধকার দূর হয়, জ্ঞানের আলোকে অবিদ্যা নষ্ট হয়···সেজন্যই নাম কাশী।···অন্ধং তমঃ, আমার চিত্তাকাশে কেবলই ঘনান্ধকার···মরাই ভালো···মণিকর্ণিকায় জ্বালিয়ে দেবে···চিতাভস্ম গঙ্গায় ফেলে দেবে···বল হরি, হরিবল···চিতায় গঙ্গাজল···ওঁ শান্তিঃ···দশাশ্বমেধ ঘাট!···এখানে পিতামহ ব্রহ্মা দশটি অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন করেছিলেন···পরম পবিত্রস্থান···কতো লোক গঙ্গাস্নান করে যায়—স্নিগ্ধ দেহে, শান্ত মনে···স্তোত্র পাঠ শুনি—

"দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥"

জীবনের সব আশা, সব স্বপ্নই তো ধূলিসাৎ হয়েছে; আর কেন?···এ জীবনের দিনগুলি মোর···

"অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা-তরুতলবাস স্তদপিন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ॥"

তরুতলে বাস···করতলে ভিক্ষা···চিবুক-সমর্পিত জানু···কতো কথাই মনে পড়ে···কতো ছবি চোখে ভাসে···বন্ধুরা সব কে কোথায় গেলো!···দেশটাও গেছে···কথা বলবারও লোক নেই···দয়ালদা গাইতেন—

মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মানুষ হয় যে জনা, (ও তার) নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দুই-এক জনা;
ভাবে ভাসে, রসে ডোবে, (ও সে) উজান পথে
করে আনাগোনা॥

দু-এক জনাও নেই…নিঃসঙ্গ জীবন…আপনাতে আপনি থাকা ছাড়া উপায় নেই। দেকারতে (Descartes)-র মন্ত্র ছিল **cogito ergo sum**, আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি। ইওরোপ যেদিন থেকে এই মন্ত্রে দীক্ষা নেয় সেদিন থেকে ইওরোপীয় সমাজে এসেছে মানুষের নিঃসঙ্গতা, নিজের ভিতরে নিজের নির্বাসন। ভারত সম্বন্ধে একথা ঠিক নয়। যাস্কের নিরুক্তে[১] আছে, যজ্ঞের ঐতিহ্য যখন মৃতপ্রায়, পুরোহিতবর্গ বিলীয়মান দেবগণকে আবেদন জানিয়েছিলেন, 'আমাদের কী গতি হবে! কী উপায়ে আবার দর্শন পাবো আপনাদের?' উত্তর আসে, 'এর পর দেবত্বলাভের উপায় হবে মননের দিব্যাস্ত্র।' মনন! কী এর মানে? সাংখ্যের বিবেক? অনাত্ম বস্তু থেকে আত্মাকে পৃথক করা?…প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ? মুঞ্জাতৃণ থেকে যেমন ইষীকা পৃথক্কৃত হয়? ধৈর্য সহকারে? …এরই নাম মননের দিব্যাস্ত্র?…"পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ!" বিবেকদ্বারা ব্রহ্মে পৌঁছন যায়?…বুঝি না ঠিক…এদিকে দিন ঘনিয়ে আসে…ক'দিনই বা আর বাঁচবো! সন্তায়ন (G. Santayana) বলেন, জীবমাত্রই তার মনোগহনে আবদ্ধ—কীরকেগারদ্ (Kierkegaard)-এর অলঙ্ঘ্য চিত্ত-কারাগার…বিরাট এক **cloud of unknowing**…মেঘ কাটে না…অন্ধকার ঘনিয়ে আসে গাঢ়তর হয়ে…দিন তো গেলো, সন্ধ্যা হলো…কোথায় নৌকো? "পুনরপি জননং পুনরপি মরণম্…পুনরপি রজনী পুনরপি মাসঃ…কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ?"

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই,
　　কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কতো কাঁদি হাসি,
　　কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
জানি না কেবা, এসেছি কোথায়,
　　কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়।
কতো আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
　　এই আছে আর তখনি নাই॥

ক্ষেপু ঠিকই বলে; গুরুর দরকার। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলা যায় না আর …চরণাশ্রিত? মন সায় দেয় না…'চেলা' তো অনেক দেখলুম—বোকা, ভণ্ড, শ্রদ্ধাজড়; আর গুরুজী-সাধুবাবা? লম্বোদর, অহংমুখ, বাহ্বাস্ফোট, স্বয়ংবীর,

---

(১) মনুষ্যা বা ঋষিষূৎক্রামৎসু দেবানব্রুবন্ কো ন ঋষির্ভবিষ্যতীতি, তেভ্য এতং তর্কমৃষিং প্রায়চ্ছন্ (১৩-১-১২, পরিশিষ্ট)।

পণ্ডিতম্মন্যমান।...যেমনটি চাই তেমনটির দর্শন পাচ্ছি কোথায়?...আমার ধাতে সইবে, আমার ধাত বুঝবেন...দয়ালদার মতো স্নেহ করবেন...দয়ালদার সঙ্গে বনে...উপদেশ দেন, গুরুগিরি করেন না...রাস্তা দেখান, ঘাড়ে চাপেন না...দোষ দেখান, দোষী করেন না...সঙ্গে চলেন, যেমন পরাণবন্ধু হে সখা আমার... ভগবানকে চিরদিন ঐ নামেই ডেকেছি; এখন আর সাড়া দিচ্ছেন না; অভিমানে বলি 'আর কতোকাল থাকবো বসে'...হয়তো একদিন মুখ ফিরিয়ে চাইবেন...হয়তো পাঠিয়ে দেবেন 'মনের মানুষ, কাঁচা সোনা'...মণিদার দরদভরা স্বর ভেসে আসে—

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
(তারে) ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর পেলাম না॥
(কবে) সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিভে না॥
পথিক কয় ভেবো নারে; ডুবে যাও রূপসাগরে;
ডুবিলে পাবে তারে, আর ভেবো না;
সে যে মনের মানুষ কাঁচা সোনা॥

॥ ৩-অ ॥

ডাক্তারবাবু সঙ্গে যেতে পারলেন না, একাই গেলুম; দুর্বাসাজীকে দেখলে প্রথমটায় একটু ভয় হয়। রুক্ষ চেহারা, কালো রং, ভরাট গাম্ভীর্য, ঠোঁটে রহস্যপ্রবণতার রেখা; চোখে স্নিগ্ধতা; একটু তীক্ষ্ণতাও—খানিকটা সোক্রাতেসের সঙ্গে যেন মিল আছে। প্রণাম করে চুপ চাপ বসে আছি। নাম তো দুর্বাসা মুনি! থাকি বসে...আর এক দিন না হয় ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসবো, তাঁর মারফৎ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে...ডাক্তারবাবুর খুব উচ্চ ধারণা...বলবো কিছু? যদি ভাগিয়ে দেন? যদি বিদ্রূপ করেন? কী দরকার?... চুপচাপ থাকাই ভালো...হয় তো অন্তর্মুখী হয়ে আছেন...সাধুরা অনেক সময় নির্বাক্ থেকেই প্রশ্নের মীমাংসা করে দেন...মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিত-পরব্রহ্মতত্ত্বম্...গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যা স্তু ছিন্নসংশয়াঃ...তেমন বরাত কি আর হবে?...বেশ শান্ত পরিবেশ...গোলমাল নেই...লোকজন বড় একটা কেউ আসে বলে মনে হচ্ছে না...হয় তো ভয়ে...এক পক্ষে ভাল...হই-চই নেই... শিষ্যদের অশিষ্টতা নেই...মোটর গাড়ীর ভিড় নেই...অর্থাৎ অলৌকিক কোনো শক্তির খেলা দেখাতে পারেন না বোধ হয়...শক্তি থাকলে কি আর রক্ষা ছিল!

মেলা বসে যেতো! অস্বস্তি মনে হচ্ছে···উঠবো?···দেখি আর একটু···হঠাৎ প্রশ্ন করেন—

ঃ *কি চাই···*

ঃ আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

ঃ কেন?

ঃ সাধু দর্শনে পুণ্যি হয়, তাই।

ঃ সাধুর লক্ষণ জানেন?

ঃ জানি বলতে পারি না, তবে গীতায় পড়েছি—অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ—

ঃ এতো মান্ধাতার আমলের লক্ষণ!

ঃ সাধুর লক্ষণ তো—

ঃ বদলায় না, বলছেন? ভুল ধারণা। The old order changeth yielding place to new; মহাজনো যেন গতঃ, যুগধর্ম, zeitgeist—এসব শোনেন নি?

ঃ শুনেছি, কিন্তু সাধুদের উপর এগুলোর ব্যাপ্তি আছে জানতুম না।

ঃ ব্যাপ্তি আছে বৈ কি! সাধুরা তো মানুষই; যুগধর্মকে এড়াবেন কী করে?

ঃ সাধু মানে যিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। যদি যুগধর্মের আওতা থেকেই নিজেকে মুক্ত করতে না পারলেন—

ঃ তবে আর সাধু হলেন কী করে?—এ তো মান্ধাতার আমলের যুক্তি, বর্তমানে অচল। মডার্ণ সাধু হবেন মডার্ণ লক্ষণাক্রান্ত।

ঃ যথা?

ঃ হাজার হাজার শিষ্য থাকবে, পদস্থ লোকের সংখ্যাই তার ভিতর বেশী; সফরের সূচী কাগজে ছাপানো হবে; যাতায়াত আকাশমার্গে, মানে এরোপ্লেনে; আশ্রমফণ্ডে মোটা টাকা চাই; নিয়মিত চাঁদা আদায়ের জন্য তসিলদার ঘুরবে; স্তাবক দিয়ে জীবনী লেখানো হবে; সাধনার পদ্ধতিতে নূতনত্ব থাকা চাই; শাস্ত্রকে অবশ্য বাদ দেওয়া চলবে না, তবে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে। এর নাম হচ্ছে প্রগতি, neo-religion; নব সহজিয়ার এই ersatz পন্থায় চলুন, সুখে থাকবেন : you can have the best of both the worlds; এই হচ্ছে পন্থা।

ঃ ও পথ আমার নয় বলেই এখানে এসেছি।

ঃ পণ্ডশ্রম। কারণ, আমি যে অসাধ্য সাধন করে সাধু হয়েছি তার প্রমাণ কি?

ঃ প্রমাণ উপস্থিত করবার যোগ্যতাই যে নেই আমার। আর যোগ্যতা থাকলেও সাধুদের উপর তা প্রয়োগ করা—

ঃ সঙ্গত নয়, বলছেন? দু-টি ভুল হলো। প্রথমতঃ আপনার পুণ্যসঞ্চয় হবে কিনা তা অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ প্রয়োগ না করলে তত্ত্ব নিশ্চয় কী করে হবে?

ঃ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ। তর্ক দ্বারা কি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হয়?

ঃ তর্ক না করলে এই প্রতিজ্ঞায়ই বা পৌঁছবেন কি করে? সাধু যা বলেন তা যদি অবিচারে মেনে নেন, তবে লাভ হবে শুধু শ্রদ্ধাজড়তা।

ঃ তর্ক করে সাধুদের বিরাগভাজন হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?

ঃ সাধুর কাছে যান কেন? তাঁকে কৃতার্থ করতে, না নিজের কল্যাণের জন্য? প্রকৃত সাধু বিরক্ত হন না, জিজ্ঞাসু দেখলে খুশীই হন, এবং তাঁর প্রশ্নের সমাধান করে আনন্দলাভ করেন।

ঃ Ersatz-পন্থীরাও তো তর্ক দ্বারাই নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করছেন? তাঁদের দোষ কোথায়?

ঃ দোষটা ব্যক্তিগত নয়, তত্ত্ব ও বৃত্তিগত। মানুষ সংস্কার-বশে এটা-সেটা চায়, এবং পায়, বা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। প্রশ্ন হচ্ছে এটাই শেষ চাওয়া ও পাওয়া কিনা?

ঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্—নানা মুনির নানা মত।

ঃ সেখানে নিজের বিবেকবুদ্ধি এবং অনুভূতিই পথনির্দেশক।

ঃ ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ঃ শুধু সম্ভাবনা নয়, ভুল করেও। ভুলের ভিতর দিয়েই তো মানুষ চলছে। তবে ভুলের স্বভাব এই যে সে ভাঙে, যদি জাগ্রত থাকা যায়। আত্মবিশ্লেষণ চাই; শাস্ত্র, যুক্তি, এবং অনুভূতির সাহায্যে নিজেকে বারবার পরখ করে নেওয়া চাই। শাস্ত্র মানে সাধুসঙ্গও বটে—এমনি সাধু যাঁদের 'চাহ গঈ, চিন্তা মিটী, মনুবাঁ বেপরবাহ'।

ঃ আর বৃত্তিগত দোষ কি?

ঃ সাধু যদি চাঁদার খাতা নিয়ে বেড়ান, বা অনুরূপ অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন, তবে বুঝতে হবে ঝামেলা খতম হয় নি। কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি গিরিপুরী, গোস্বামীবাবাজী, সকলেরই তত্ত্বনিষ্ঠ হওয়া দরকার—আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্।···যুগধর্মকে এজন্যই জানা দরকার। পথে অসংখ্য কাঁটা

ও গর্ত। চোখ চেয়ে বিচার করে না চললে যুগের এই অধর্ম-গহ্বরে পড়ে যেতে পারেন।...আসল কথা কি জানেন? বিবেকবৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না। উইলিয়ম ল'র (William Law) একটি কথা আছে—turning to God without turning from self; পরমহংসদেব যেমন বলতেন, 'আমি মরিলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। 'আমি'-কে না মেরে যারা জঞ্জাল ঘোচাতে চায় তারা আরও জঞ্জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর চলে আত্মপ্রবঞ্চনা, rationalisation, গোলক ধাঁধা খেলায় যেমন পুনঃ নরকে পতনম্।

: এতো মিথ্যাচারের কথা বলছেন; ঋতাচার আশ্রয় করলে—

: সেখানেও জঞ্জাল এসে জোটে—সাংখ্যকারের 'তুষ্টির্নবধা'। তত্ত্বজ্ঞানীকেও ছাড়ে না, মুমুক্ষুর তো কথাই নেই।

: বুঝলুম না ঠিক।

: মধুসূদন সরস্বতী গীতার টীকা লিখেছিলেন 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র পর—অর্থাৎ বহু সাধনা ও বিচার পরিপাকের ফল এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। বইখানা পড়বেন। সাধক দুই শ্রেণীর—কৃতোপাস্তি ও অকৃতোপাস্তি। উপাসনা, যোগাভ্যাস ইত্যাদি দ্বারা যাঁদের চিত্ত নির্মল হয়েছে তাঁরা অনেক সময় সমাধিজ সুখে আবদ্ধ হয়ে পড়েন; মাণ্ডুক্যে এই বিঘ্ন বা তুষ্টির নাম দেওয়া হয়েছে "রসাস্বাদ"। এঁরা সাধু কিন্তু জ্ঞানী নন, কারণ মহাবাক্য বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন নি।

: ভক্তরা তো বলেন, চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।

: এর নামই তুষ্টি—সুখসঙ্গেন বধ্নাতি। অতাত্ত্বিকও বটে। চিনি কেউ হয় না—জীব স্বভাবতঃই চিনি বা ব্রহ্মস্বরূপ। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর পার্থক্য এই যে একজন তাঁর স্বরূপ জানেন, অপরজন জানেন না। হরিদ্বারের টিকিট কেটে যদি মাঝরাস্তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই ও নেবে পড়ি, তবে ভুল করা হবে। রাস্তায় ধর্মশালা আছে, পথিক সেখানে বিশ্রামও করে; কিন্তু মোহ আসে যখন ধর্মশালা গন্তব্যস্থলে পরিণত হয়। জীবপ্রকৃতিতে এজাতীয় মোহ আছে, কিন্তু মোহ কাম্যও নয় তত্ত্বও নয়।

: কিন্তু জ্ঞানী তো গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছেন; তাঁর সম্বন্ধে এই যুক্তির প্রয়োগ সম্ভব কি?

: কৃতোপাস্তি জ্ঞানীর সম্বন্ধে এই যুক্তি চলে না, কারণ বিরোধী সংস্কারের অভাব বা পরিশুদ্ধি হেতু তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার মাত্রই জীবন্মুক্ত। কিন্তু অকৃতোপাস্তি

জ্ঞানীর বিরোধী সংস্কার থাকে, সুখ-দুঃখাদির ভোগও হয়; এঁরাই গীতোক্ত "অপরমযোগী"। কৃতোপাস্তি জ্ঞানীরা "পরমযোগী।"

: অপরমযোগীর তা হলে লাভ কী হলো?

: অজ্ঞানের আবরণী শক্তির নাশ হেতু স্বরূপ-নিশ্চয়, 'কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই' এই সমস্যার অন্তিম সমাধান; এবং প্রারব্ধভোগান্তে বিদেহমুক্তির চিরশান্তি।

: জ্ঞান দ্বারা যদি অজ্ঞানের নাশই হলো তবে প্রারব্ধ আসে কেন? প্রারব্ধ তো অজ্ঞানেরই কাজ?

আসে যে তা অনুভবসিদ্ধ। না আসলে মোক্ষশাস্ত্রই অসিদ্ধ হয়ে যেতো, সকলকেই চলতে হতো সাংখ্যোক্ত অন্ধপরমারান্যায়ে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানও প্রারব্ধবশতঃ হয়, সুতরাং প্রারব্ধের নাশক হয় না।

: তবে তো অজ্ঞানীর মতো জ্ঞানীকেও প্রারব্ধজন্য সুখদুঃখাদি ভোগ করতে হচ্ছে?

: অজ্ঞানীর মতো নয়। রজ্জুজ্ঞানের পর সর্পদর্শন হলেও সর্পভ্রম আর হয় না। তবে ভুগতে যে হয় তা ঠিকই। এজন্যই অপরমযোগীর সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় বা পুনঃপুনঃ তত্ত্বসেবা দ্বারা গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভের চেষ্টা।

: প্রারব্ধে যদি স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ না থাকে?

: কী আছে তা তো জানা নেই। সুতরাং শাস্ত্র বলবে, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। তারপর যিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্যন্ত পৌঁছলেন তিনি থেমে যাবেন কেন? মুক্তির জন্য-ই না চেষ্টা?[১] জীবন্মুক্ত না হতে পারলে চেষ্টা থেকে বিরত হবেন কেন? বিরোধী সংস্কারের প্রাবল্যে বিস্মৃতি আসতে পারে, কিন্তু সেই বিস্মৃতি সাময়িক।

: দৃষ্টান্ত?

: মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। জ্ঞানলাভের পর তিনি সংসারী হন, দুটি বিবাহ করেন, জনকরাজার পৌরোহিত্য করে বিত্তসঞ্চয় করেন, পণ্ডিত সভায় সকলকে পরাস্ত করে খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর সংসার ত্যাগ করে জীবন্মুক্তির জন্য বিদ্বৎ-সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যায় ব্রতী হন। অর্থাৎ পরমযোগী হয়ে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন। এব ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। সাধুজী নির্বাক, আত্মস্থ, প্রশান্ত···আমি-ও

(১) "আদৌ তু মোক্ষো জ্ঞানেন দ্বিতীয়ো রাগসংক্ষয়াৎ। কর্মক্ষয়াত্তৃতীয়স্তু ব্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণম্।"

নিজের ভিতর ডুব দিতে চেষ্টা করি, দেখি লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটেছে গভীর আঁধারে···প্রণাম করে বিদায় নিই।

॥ ৩-আ ॥

: একটা প্রশ্ন আছে।

: কী ?

: প্রেমলাভের উপায় কী ?

: অবাক্ করলেন।

: কেন ?

: বাঙ্গালীর মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না।

: আমি বাঙ্গালীর অধম।

: আমার জিভ নেই বলার মতো হচ্ছে ব্যাপারটা।

: বুঝলুম না।

: প্রেম লাভ কী-করে হয় এই তো প্রশ্ন আপনার ?

: আজ্ঞে হাঁ।

: যা-করে ছোটবেলা থেকে প্রেমলাভ করে আসছেন···খোল করতাল বাজিয়ে। কীর্তন করেন তো ?

: করি না, শুনি। অথবা শুনতুম। এখন আর ভালো লাগে না।

: কেন ?

: জীবন-সমস্যার সমাধান-সূত্র ওতে খুঁজে পাই না; অবাস্তব ভাবালুতা মনে হয়।

: ভাল কথা নয়। বাঙ্গালীর মুখে এমনধারা কথা শুনবো আশা করিনি।

: তাহলে কীর্তন করতেই উপদেশ দিচ্ছেন ?

: বাঙ্গালীর কী আর সম্বল ? মহাভারতের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ—সব ত্যাগ করে ধরেছি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবং খোল করতাল। ও-ছাড়া আর গতি কী ? আমরা গান গেয়ে থাকি—বেদবেদান্ত পায় না অন্ত খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে। আর ভাবনা কিসের ? বেদ বেদান্ত তো নস্যাৎ করে বসে আছি। শিলার (Schiller)-এর একটি কথা আছে—Against stupidity even the gods are helpless, চূড়ান্ত মূর্খতা যেখানে কাম্য দেবতারাও সেখানে অসহায়, কিছু করে উঠতে পারেন না।

: ভক্তির রাস্তাও তো আছে একটা ?

: কোথায় আছে ? আছে রসকীর্তন, নায়ক-নায়িকা ভাবের ছাড়াছড়ি। ফ্রয়ডীয় সমীক্ষায় কী দাঁড়াবে ?

: শুদ্ধাভক্তির ধারা ?

: ছিল ; যুগধর্মের প্রভাবে অত্যন্ত ঘোলাটে হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আবার মিশেছে রবিবাবুর গান, মানে পাঁচ ঘাটের জল ; ফলে প্রাচীন ধারাটির নাজেহাল অবস্থা। সবই যুগধর্ম। ঘি আর পেটে সয় না, দালদা ছাড়া গতি কী ?

: বৈষ্ণব মহাজন আর রবিবাবুতে—

: আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রবিবাবু বৈষ্ণবদের বিগ্রহ ত্যাগ করেছেন ; বৈষ্ণব-সাধনায় নাম-নামী অভেদ ; পৌত্তলিকতার ভয়ে রবিবাবু 'নাম' বর্জন করেছেন, যদিও হরের্নামৈব কেবলম্ ; রেখেছেন শুধু বৈষ্ণবদের মৃন্ময় মন্দির ও তার কারুকার্য ; আবার কবীর প্রমুখ সাধুদের ব্রহ্মজ্ঞানকে দুয়ো দিয়েছেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নেই। যোগাসন ? ব্যর্থচেষ্টা। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ ? মূঢ়তা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ? হিং টিং ছট্। শাস্ত্র ? তর্কজাল। যে রাস্তায় যিনি চলেন নি সে রাস্তা সম্বন্ধে বলবার তাঁর কী অধিকার ? শেষ পর্যন্তও তিনি মত বদলান নি। আমার এক বন্ধু রবিবাবুর 'রোগশয্যায়' কবিতা থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন—অরণ্য সভাটিই খাঁটি জিনিস, বৈরাগ্য-বাদীরা যদি তার অপবাদ করে থাকেন তা শুধু ঋষিদের "অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ"[১]...কিন্তু কবীরপন্থীদের সবটুকু বর্জন করেন নি ; রেখেছেন তাঁদের অরূপরতনের খোলসটি। এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন পাশ্চাত্যদের প্রকৃতি পূজো। অর্থাৎ মন্দির বৈষ্ণবদের, চুনকাম কবীরপন্থীদের এবং চুমকি ও জহরৎ প্রকৃতিপূজক পাশ্চাত্যদের—ভিতরে না আছেন শ্যামসুন্দর, না আছেন শিব। উপনিষদের পুরুষকে হাতছানি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিজাতীয় জাঁকজমক দেখে তিনি গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছেন।

: রবীন্দ্রনাথকে যদি প্রাণব্রহ্মের ঋষি বলি ?

: কাব্যের দিক থেকে বলছেন তো ? কারণ মতবাদই বিচারের বিষয় হতে পারে।

: হ্যাঁ, কাব্যের দিক থেকেই বলছি, ব্যক্তির দিক থেকে নয়।

(১) ৩০ নভেম্বর, ১৯৪০, প্রাতে।

: তবে কবি শব্দ প্রয়োগই নির্দোষ।

: ঋষি বললে—?

: দোষ হয়; কারণ প্রাণব্রহ্ম তত্ত্ব নয়; প্রাণ জড় বস্তু, দৃশ্য, মিথ্যা।

: ঋষি না বলে উপাসক যদি বলি?

: কিসের উপাসক? প্রাণ তো তত্ত্ব নয়।

: 'সীমার মাঝে, অসীম তুমি' এই মন্ত্রের?

: ঘটজ্ঞানের উপাসনা হয় না; উপাসনা করাও নিরর্থক।

: বুঝলুম না।

: ঘট সীমিত বস্তু; সেই অধিষ্ঠানে 'অসীম' গৃহীত হলে অখণ্ড সত্তা ঘটরূপে দেখা দেয়। এটাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা—এর জন্য উপাসনার কোনো প্রয়োজন নেই। "অসীমের" অধিষ্ঠানে সীমিত 'ঘট' গৃহীত হলে ঘট চিন্ময়রূপে দেখা দেয়। এই অনুভূতি তাত্ত্বিক, ও প্রযত্নসাধ্য। শাস্ত্র হবে অজ্ঞাতজ্ঞাপক; অজ্ঞাত তত্ত্বটি কী, এবং সেই তত্ত্বলাভের সাধন কী, এদুটো দিগ্‌দর্শন থাকে শাস্ত্রে। জ্ঞাত-জ্ঞাপক হলে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়।

: সীমার মাঝে—

: ও হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এজন্যই বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছেন—ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি।[১]

: সৌন্দর্যের উপাসক বলা যায় তো?

: সৌন্দর্য তো ঘটজ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ, তত্ত্ব নয়।

: তত্ত্ব নয় কেন?

: অসুন্দর আছে বলে।

: অসুন্দর তো নিষিদ্ধই হচ্ছে?

: এড়ানো হচ্ছে, নিষিদ্ধ হচ্ছে না। নিষিদ্ধ হলেও সামগ্রিক দৃষ্টি আসে না। অঘটকে নিষেধ করে ঘটের জন্ম, সুতরাং ঘট এবং অঘট উভয়ে সমসত্তাক। তেমনি অসুন্দরকে নিষেধ করে সুন্দরের উৎপত্তি, অতএব উভয়ে সমসত্তাক। অর্থাৎ ব্যাবর্তক বৃত্তিতে দ্বন্দ্ব থেকেই যায়।

: দুঃখকে বর্জন করে সুখকে খোঁজা তো জীবের স্বাভাবিক ধর্মই?

: নিশ্চয়; কিন্তু দ্বন্দ্বের অবসান হয় না বলে প্রাপ্তি হয় কেবলই দুঃখ।

: সুন্দর যদি তত্ত্ব না হয় তবে শ্যামসুন্দরের স্থান কোথায়?

(১) গীতা, ৭-১২;

: 'শ্যাম' মানে 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ'[১] ; এই 'শ্যামই' 'সুন্দর'।

: শব্দস্পর্শাদির নিষেধে ব্যাবর্তকবৃত্তি আসছে না ?

: নিত্যবস্তু সম্বন্ধে এই শঙ্কা ওঠে না। সত্তা-ও-স্ফুরণরূপ নিত্য শ্যামসুন্দর শব্দস্পর্শাদি যাবতীয় বস্তুর আত্মা। সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়কে আমরা যুগপৎ তখনই গ্রহণ করি যখন উভয়ের অনুস্যূত আত্মা শ্যামসুন্দর গৃহীত হন —যত্র ত্বস্য সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ[২]। নিত্য শ্যামসুন্দরের সঙ্গে অনিত্য রূপরসাদির ব্যাবর্তক সম্বন্ধ হয় না, কারণ নিত্য এবং অনিত্য সমসত্তাক নয়। আর যদি ব্যাবর্তক সম্বন্ধ মানেন তবে রূপরসাদির সত্তা এবং স্ফুরণই অসম্ভব হয়।

: রূপরসাদির ভিতর তো আমরা শ্যামসুন্দরকেই খুঁজছি ?

: কিন্তু পাচ্ছি কৈ ? ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি। অজ্ঞানান্ধকারে খোঁজা হচ্ছে। তবে সব খোঁজাই তাঁকে খোঁজা।

: শেষ পর্যন্ত দেখা দেন তো ?

: দেন বই কি !

: তা হলে অবিদ্যার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে জ্ঞানেতে পৌঁছই ?

: নিশ্চয়। জীবমাত্রই তো সাধক—মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ[৩]। পরমাত্মা সকলেরই আত্মা ; সকলেই সাধক।

: বিশেষ অর্থে সাধক কে ?

: গীতার ভাষায় 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে'[৪], অর্থাৎ যাঁরা প্রাপঞ্চিক সব কিছু চিন্তা ছেড়ে শুধু ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন। এই অর্থে সাধক ছিলেন তুলসীদাস, কবীর, সূরদাস, লোকনাথ গোস্বামী, নরোত্তমদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত। প্রেমলাভের প্রশ্ন করেছিলেন তো ? বৈরাগ্য ছাড়া প্রেম হয় না। ধরুন বৈষ্ণবদের—

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥

সাধকের এই জ্বালা, সর্বহারার এই বেদনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোথায় আছে ? কোথায় 'হিয়া দগদগি পরান পোড়নি ?' সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, চিত্ত জ্বলে মরুভূমি হবে, ভগবানের নামে 'দেওয়ানা' হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিলেন মীরা বাঈ—তবে না সাধনা। জ্ঞান, বীর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, তপস্যা,

(১) কঠ ১-৩-১৫ ; (২) বৃহদারণ্যক ৪-৫-১৫ ; (৩) গীতা ৪-১১ ; (৪) গীতা ৯-২২।

শীলচর্যা, সব ছেড়ে ফাঁকতালে প্রেমলাভ করতে চেয়েছে বাঙ্গালীরা; তার ফল পাচ্ছে এখন। কিন্তু তবুও কি শিক্ষা হচ্ছে? ঘা তো আর কম খায় নি! এখনো খাচ্ছে! কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে কৈ?

: তন্ত্রসাধনাও তো বাংলার একটা বিশিষ্ট সম্পদ্?

: হারিয়ে ফেলেছি। সাধনার ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে সাধকের তপস্যা ও বীর্যের প্রভাবে। সাধক কোথায়? যা-ও বা আছেন তাঁদের সঙ্গে সমাজ-জীবনের *যোগ কোথায়?*

: পরমহংসদেব?

: শুদ্ধ তন্ত্র; বৈষ্ণবসাধনার রকমফের। ম-কারাদি নিয়ে শব-সাধনা কোথায়? বীরাচারই হলো তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু আমাদের সমাজ ও-জিনিসকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখে নি। কাজেই ধারা শুকিয়ে গেছে। বাঙ্গালীদের ধাত হচ্ছে বৃন্দাবনী বৈষ্ণবের। সত্যকে দেখবার ও হজম করবার সাহস ও বীর্য হারিয়ে ফেলেছি। বিপ্লবীদের ভিতর ঐ ধারা সতেজ হয়ে উঠেছিল; ভেজাল অহিংসাবাদ এসে আবার তার মুখে বালি চাপা দিয়েছে। সুতরাং সম্বল মাত্র রসকীর্তনের আত্মপ্রবঞ্চনা।

: তন্ত্রধারাকে পুনরুজ্জীবিত—

: ও হয় না। ধারা একবার শুকিয়ে এলে তাকে বাঁচানো মুস্কিল! মরা গাঙে আর বান ডাকে না।

: অনুকূল অবস্থা তো আছে এখন বাংলাদেশে। যে শ্মশানলীলা চলছে—

: তা সত্ত্বেও হচ্ছে না কেন? আসলে তান্ত্রিকদের বীরাচারও একটা উৎকট ভাববিকার, Sentimental grotesquerie।

: বুঝলুম না।

: তান্ত্রিকরা শ্মশান সাধনা করেন কেন? মড়া দেখে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা, ভয় তাড়াবার জন্য কারণ পান করা, ত্যাগ করার জন্য ভোগ করা—এসব মনের বিকার ছাড়া আর কী? শ্মশানের ডোম মহাভৈরব হয় না কেন? অতো মড়াও কেউ ঘাঁটে না, অতো মদও কেউ খায় না। শ্মশানে না গেলে যদি বৈরাগ্য না হয় তবে শ্মশান-বৈরাগ্যের বেশী আর কিছু হয় না। জীবনের ক্রূরতা ও বীভৎসতার সঙ্গে পরিচয় দরকার? কলকাতার সহরে তো তার মচ্ছব লেগে আছে—এমনি উৎকট, যে তান্ত্রিকরা স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ভৈরব বাবা হতে পারি না কেন আমরা?

ঃ অনুধাবন করে দেখি না বলে।

ঃ ঠিক বলেছেন। অনুধাবন করে দেখা দরকার, বিচার করা দরকার ; সূক্ষ্মরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, নিবিষ্ট চিত্তে, তন্ময় হয়ে বিবেকের শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু এই বিচার নিভৃত গৃহকোণে ভালো হয়, না শ্মশানে মদ খেয়ে মড়ার বুকে বসে, 'বল হরি হরি বল' ইত্যাদি লোমহর্ষক ধ্বনির মাদক আবেশে ভালো হয় ?···তন্ত্র সাধনা এজন্যই হয়তো লোপ পেয়েছে। কিছু কিছু শক্তি হয় ; মারণ, বশীকরণ ইত্যাদির প্রলোভন আসে ; মোহান্ধ হয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করে··· কিন্তু যে মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শ্মশানে আসা, যে বিবেকনিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দ্বারা সেই মীমাংসা সম্ভব সেগুলোকেই ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির পৌনঃপুনিক কারণবারিতে।

ঃ উপায় নেই তা হলে ? পড়ে পড়ে কেবল মারই খেতে হবে ?

ঃ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। উপায় ?

সাধুজী চুপ হয়ে গেলেন, চোখ স্বপ্নাতুর···কী ভাবছেন···ধ্যানস্থ ··খানিকক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন—

ঃ এক কালে বিপ্লবী ছিলুম ; গীতাই ছিল পথপ্রদর্শক ; সংস্কারটা হয় তো এখনো যায় নি—গীতার উপর কটাক্ষ দেখলে সহ্য হয় না। গীতাতেই অন্য রাস্তার খোঁজ পাই। ছেড়ে দিলুম আগেকার পথ···পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াই···মন অশান্ত, গন্তব্যের বালাই নেই···দু-চোখ যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাই···দু-দিন থাকি, আবার চলি···তেজপুর এসে শুনলুম এক মহাত্মার কথা। চল্লুম তাঁর খোঁজে। গভীর জঙ্গল· ·জনমানবের চিহ্ন নেই··· ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়ে সরু একটি পায়ে-হাঁটা রাস্তার দাগ···আসামের জঙ্গল, কখন কী বেরিয়ে আসে বলা যায় না···ঘণ্টা দুই চলবার পর দেখি ছোট্ট একটি পাহাড় নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এমনি একটি পাহাড়ের গুহায় নাকি সাধুজী থাকেন। খুঁজে খুঁজে গুহার রাস্তা বের করে ঢুকে পড়লুম··· ঘন নিঃশব্দ অন্ধকার···বাঘভাল্লুকের আস্তানা হওয়াও বিচিত্র নয়···ক্রমে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে···চোখ চেয়ে দেখি মহাত্মাজীর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি। হয় তো ধ্যানস্থ ছিলেন। বসলুম···জমাট স্তব্ধতা···কোন্ এক নিঝুম নিথর রাজ্যে এসে পড়েছি···কতক্ষণ ওভাবে ছিলুম মনে নেই···সাধুজী আমার দিকে তাকিয়ে বলেন—

মনন করো বেটা, মনন করো।

॥ ৩-ই ॥

: দুর্বাসার কাছে এতো ঘন ঘন আসতে নেই।

: মার্জনা করবেন, কিন্তু 'দুর্বাসা' না-হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় ?

: (হেসে বলেন) তা বলা যায় না।

: কেন ?

: যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল দরকার।

: বুনো ওল না হয়ে শকরকন্দও তো হতে পারে ?

: তা হলে বাঘা তেঁতুলের প্রয়োজন নেই। কি জানেন ? অনেক রোগ আছে যার ওষুধ হচ্ছে শক্-থেরাপি (Shock-therapy)। আমার এক গুরুভাইর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভাল সাধক, বেশ সাধন ভজন করে যাচ্ছে; হঠাৎ খেয়াল চাপলো, কিছু টাকা জমানো দরকার, নইলে পরিব্রাজক জীবনে বড্ড কষ্ট হয়। প্রথমে চাকরি নিলো; তারপর একখানা বই লিখতে শুরু করলো। একদিন জিজ্ঞেস করি—

: কতো জমলো ?

: হাজার খানেক। আর এক হাজার হলেই ছেড়ে দেবো।

: এক হাজারেই ইতি দেবে যে বলছিলে ?

: জিনিসপত্র বড্ড মাগগি হয়ে যাচ্ছে।

: এখন থেকে কি দাম স্থির হয়ে থাকবে ?

: তা নয়, তবে—

: ধ্যান হচ্ছে ?

: ভালো বসছে না, বইর কথা—

: ছেড়ে দাও সব।

: বইটা আদ্ধেকের উপর হয়েছে, এখন—

দিলুম কষে এক চড়। পরদিন গুরুভাই বেশ প্রসন্নচিত্তে এসে বললে, 'চললুম দাদা, মোহটা কেটেছে।' আমি মন্তব্য করি, ওষুধটা একটু নূতন ধরণের।

: মোটেই না। চীনে জেন শাখার বৌদ্ধদের ভিতর এই প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে। মনের ভিতর জট পাকিয়ে গেলে তাঁরা কোয়াঙ্ (Koan) প্রয়োগ করেন—একটা কি দুটো কথা, কথার মানেও অনেক সময় থাকে না, অথবা বৈদ্যুতিক আঘাত। ধরুন, গুরুশিষ্য পুকুর পাড় দিয়ে যাচ্ছেন। শিষ্য বলছেন, 'ধ্যান বসে না কেন ?' গুরুজী এক ধাক্কা দিয়ে শিষ্যকে পুকুরে ফেলে দিলেন।

: মানে ?

: "ডুব দেরে মন কালী বলে"।

: দাওয়াইটা যেমনি উৎকট তেমনি উদ্ভট।

: প্রকৃতির একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

: প্রয়োগ ক্ষেত্র ?

: ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীব।

: দৃষ্টান্ত ?

: যুদ্ধ বিগ্রহ, মহামারী, প্লাবন, ভূমিকম্প, ইত্যাদি সমষ্টির জন্য ; শোক-তাপ, দুঃখ-দারিদ্র্য, আধি-ব্যাধি, আশাভঙ্গ, ইত্যাদি ব্যষ্টির জন্য। একরকমের নেচারোপ্যাথি।

: সাধুরা তা হলে প্রকৃতির পদাঙ্কানুসরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন ? অর্থাৎ মড়ার উপর খাঁড়া ধরেন ? কৃপার কোনো স্থান নেই ?

: কৃপার তো ঝড় বয়ে যাচ্ছে দেশে ! ইংরেজরা কৃপা করে আপনাদের স্বরাজ দিয়েছেন ! গান্ধিজী কৃপা করে স্বরাজ পাইয়ে দিয়েছেন ! গান্ধিজীর অনুচরগণ কৃপা করে স্বরাজের ফল খাওয়াচ্ছেন ! সরকারী বেসরকারী সব অনুষ্ঠানে তো কেবলই কৃপাভিক্ষা ও কৃপাদান। কৃপার উপরই তো সকলে বেঁচে আছে···তারপর সাধুমহাত্মা ? কৃপা করবার জন্য তাঁরা তো আসমুদ্রহিমাচল ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! দয়ানিধি, পতিতপাবন, আশ্রিতবৎসল—ভবে এসেছেন শুধু জীবকে তরাবার জন্য। তাঁদের চরণাশ্রিত হয়ে যান, হেলায় লঙ্কা করিবে পার। আপনার কিছুই করতে হবে না, অথবা যা খুশি করে যেতে পারেন···**Sin that you may be forgiven**—পারের কাণ্ডারী তো আছেই।···কতো সাধু দেখলুম ! শিষ্য ও স্তাবক জুটিয়ে নিজেও ডুবেছেন, পরকেও ডুবিয়েছেন···সমাজ যাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় সেজন্য গৃহীদের সঙ্গে বিরক্তদের যোগ থাকা দরকার—কিন্তু যোগাযোগের ফল দেখে এখন শিউরে উঠি। প্রয়োজন বিরক্তদের আদর্শে গার্হস্থ্যজীবন পরিশুদ্ধ হওয়া ; কিন্তু হচ্ছে গৃহীদের ভোগাদর্শে বিরক্তদের সর্বনাশ।

: অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে কল্যাণকর কাজও তো হচ্ছে ?

: উলট পুরাণ হলো না ? সন্ন্যাস মানে কর্মত্যাগ। কাজ করবে তো সংসার ত্যাগ কেন ? কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি গৃহস্থের ধর্ম। গৃহীরা সে কাজের ভার সন্ন্যাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে অধর্মে ডুবে আছে ; আর সন্ন্যাসীরা কাজের অছিলায়

শিষ্য করছে, চাঁদা উঠাচ্ছে, মঠ আশ্রমের নামে জমিদারি করছে, আর ভবপারের কাণ্ডারী সেজে জাহান্নমে যাচ্ছে। এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের আবার কী রেষারেষি! কোন্ প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী এই নিয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ, প্রচার, প্রোপাগেণ্ডা। আর প্রতিষ্ঠানের ভিতর যে কী পঙ্কিলতা! দ্বন্দ্ব, কলহ, দলাদলি, বিদ্বেষের চূড়ান্ত!

: তা হলে তো আমরা অনেক ভালো আছি।

: নিঃসন্দেহ। কারণ আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। সংসারী লোক জানে এবং বলে, 'পাপীতাপী আমরা, ষড়রিপুর দাস। কী করি! ভগবান্ যখন দয়া করবেন!' উত্তম কথা। কিন্তু দয়াবতারের দালালরা?

মন ন রঁগাএ, রঁগাএ জোগী কপড়া
কান বা ফড়ায় জোগী, জটবা বাঢ়ৌলেঁৗ,
দাঢ়ী বঢ়ায় জোগী হোই গৌলেঁৗ বকরা।

: সংসারীদের যে ঝগড়া তার কারণ খুবই স্পষ্ট—একটা আপেল, তাতে কে কতোটা দাঁত বসাতে পারে। কিন্তু সাধুরা—

: কোথায় সাধু? দালালি করেই সময় পায় না, সাধনভজন করবে কখন? সব অক্ষমতার বিলাস, সুপার-ইগো (Super-ego)র খেলা। কার গুরু বড়! অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

: গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা—

: এতো শ্রদ্ধা নয়, মূঢ়তা; এবং আধুনিক যুগের অবদান। হিন্দুদের বিশেষত্ব হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ববিচার। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সাংখ্যবাদ, কর্মবাদ, অনেক এমনি মতবাদ আছে। শাস্ত্রীয় আলোচনা হচ্ছে এর কোন্‌টি শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এ নিয়ে; শঙ্কর বড় কি রামানুজ বড় এ নিয়ে মাথাঘামানো ছিল না। সাধারণ লোকের ভিতরও যে দ্বন্দ্ব ছিল তা সাধ্যবস্তু "রাম" কিংবা "শিব"কে অবলম্বন করে। "রামদাস" বড় কি "শিবদাস" বড় এ প্রশ্ন উঠতো না, কারণ উভয়েই সাধু, অতএব নমস্য। তত্ত্বকে ছেড়ে মানুষকে ধরা হচ্ছে যাবনিক মনোবৃত্তি। হিন্দুধর্মবিগর্হিত এই মনোভাব প্রচারের মাধ্যমে সবাইকে যবন করে ছেড়েছে; দলীয় সংকীর্ণতা আধ্যাত্মিকতার স্থান নিয়েছে; নির্ভীক নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বচিন্তা দেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। বাঙ্গালীরা অক্ষম বেশী বলে এই রোগের প্রকোপও তাদের ভিতর বেশী।

: গল্প শুনুন। বিলেতের একটি বাইবেল প্রচারণী সংস্থার পাদ্রী সাহেব বড় এক

সাবানের কারখানার মালিকের নিকট সাহায্য চান। মালিক নিজের খরচায় দু-হাজার কপি বাইবেল ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বিলি করার পরদিন বিরাট এক মারমুখো জনতা বাইবেল প্রতিষ্ঠানের সুমুখে—আকাশ মুর্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত। ব্যাপার বুঝে পাদ্রী সাহেব থ হয়ে গেলেন—সাবানের মালিক প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি মরেল (moral) জুড়ে দিয়েছিলেন—

সুতরাং প্রত্যেক যিশু-প্রাণ ব্যক্তির কর্তব্য আমাদের X-মার্কা সাবান ব্যবহার করা।

: সেদিন রেডিওতে কমার্সিয়াল প্রোগ্রামে এ জাতীয় প্রচার শুনছিলুম—

ধুৰিয়া জল ৰিচ মরত পিআসা।
সচ্চা সাবুন লেহি ন মূরখ, ধোৰ্ ৰারহ মাসা॥

সুতরাং কবীর বলে শোনো ভাই সাধু সুরজ সাবুন ইস্তেমাল কীজিয়ে। কিন্তু আপনার গল্পের—

: আছে একটু বাকী। কিছুদিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলুম। আমার এক বন্ধু বললেন একখানা স্তবস্তোত্রের বই কিনে দিতে। দোকানে ভালো একখানা সংকলন পেয়েছিলুম; ছাপা বাঁধাই উৎকৃষ্ট; দামও খুব বেশী নয়। পাতা উলটোতে উলটোতে দেখি মাঝখানটায় প্রতিষ্ঠান বিশেষের কাণ্ডারীর উপর স্তোত্র, প্রার্থনা, শরণাগতি ইত্যাদি···

: আমাদের শেষ দুর্গটিরও যদি এই অবস্থা হয় তবে আশার বাতি তো একটিও থাকে না। এককালে মনে করতুম গান্ধিজীর সত্যাগ্রহই কল্যাণের রাস্তা। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পর দেশে যে অন্ধকার নেবে এসেছে তাতে মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কা সত্যে না পরিণত হয়।

: কী আশঙ্কা?

: সোক্রাতেসকে হত্যা করে তাঁর দেশবাসী ছারখার হয়ে গেছে; যিশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে ইহুদীজাতি চরম দুর্গতি টেনে এনেছে। তেমনি যদি যুগযুগান্তর ধরে আমাদেরও অভিশপ্ত জীবন বহন করতে হয়—

: হতো, যদি ভারতে পতিতপাবনী গঙ্গা না থাকতো।

: গঙ্গা?

: গঙ্গাকে নাবিয়ে এনেছিলেন ভগীরথ তাঁর তপস্যার প্রভাবে। তপস্যার হোমাগ্নি ভারতে কখনো নিবে যায় নি। মহাতপাদের অভাব এখনো নেই। তাঁদের সাধনার ফল সুরধুনীর পুণ্যসলিল; সকল পাপ মা গঙ্গাই বিধৌত করে নেবেন

···*আর যদি তা না-ই হয়, ইওরোপের ন্যায় ভারতও যদি ধ্বংসের পথে এগিয়ে* চলে—ক্ষতি কী? দেশ-সম্বন্ধীয় সংস্কারটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি; তবে বিক্ষেপ আর তেমন হয় না; ধ্যানে বসলে বা একটু বিচার করলে তাড়ান যায়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, কোনো কিছুর জন্যই মোহ রাখতে নেই। ভারতের জন্যও নয়। মহাকালের বুকে কতো অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে! কে তার খবর রাখে! যাক না নিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! আপনার তাতে কী? যাক ভারত খধূপের মতো শেষ হয়ে, ক্ষোভ কিসের? আপনার সত্তাকে বিনাশ করতে পারে কার সাধ্যি?······

নহি দ্রষ্টু র্দৃষ্টে বিপরিলোপো বিদ্যতে···

অবিনাশিত্বাৎ!

॥ ৩-ঈ ॥

: কৃপার স্থান সত্যিই নেই?

: চিরকাল নাবালকই থাকবেন? নিজের পায়ে কোনো দিনই দাঁড়াবেন না? ভয়টা কিসের? নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

: মহাত্মারা কৃপা করেন না?

: করলেও কৃপাপ্রার্থী হয়ে নিজেকে ছোট করবেন কেন? বিশেষতঃ কৃপা করবার শক্তিই যখন নেই! পাঁচ হাজার বছরের মানব সভ্যতায় বুদ্ধদেবের মতো দ্বিতীয় আর একজন মহাত্মা আজ পর্যন্ত জন্মান নি। তিনি বলছেন, আমি তোমাকে রাস্তা দেখাতে পারি কিন্তু এক পা-ও এগিয়ে দিতে পারি না। আনন্দকে তো খুবই স্নেহ করতেন; মহানির্বাণের ঠিক আগে তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন, নিজের জন্য যত্ন করো, নিজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হও, নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে অবহিত হও। কৈ! তাঁকে তো নির্বাণ পাইয়ে দিতে পারেন নি।

: সংসারে তো আমরা পরস্পরকে সাহায্য করে থাকি? অর্থ দিয়ে, সেবা দিয়ে, স্নেহভালবাসা দিয়ে—

: প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তা সম্ভব, যেমন রাজপুরুষ তার আশ্রিতদের সাহায্য করে থাকেন; যদিও সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আত্মা সদাপ্রাপ্ত; অজ্ঞানহেতু তা বুঝতে পারা যায় না। অজ্ঞানের নাশক জ্ঞান, করুণা নয়।

: তা হলে ভারতীয় তপস্বীদের তপশ্চর্যা আমাদের পাপনাশ কি ভাবে করবে? গ্রীকৃদের বা ইহুদীদের মতো—

: পার্থক্য আছে। গ্রীক্‌রা সোক্রাতেসের জ্ঞানকেই প্রত্যাখ্যান করেছে, বিষ খাইয়ে মারাটা গৌণ। তেমনি ইহুদীরা যিশু খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম ও দিব্যজীবনকে অগ্রাহ্য করেছে ; ক্রুশে বিদ্ধ করাটা প্রতীক্‌মাত্র। ভারতের শ্রৌতধর্মকে আমরা কখনো বিস্মৃত হই নি। বৈদিক যুগে যে আগুন জ্বালানো হয়েছিল তাকে যুগের পর যুগ তপস্বীরা দীপ্ত রেখেছেন। সেই আগুনে নিজের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে পারেন—এই অর্থে কৃপা। নিবে গেলে জ্বালাবেন কি করে? সেই দুর্ভাগ্য থেকে আমরা বেঁচেছি, এই মাত্র। কিন্তু নিজের প্রদীপ নিজেকেই জ্বালাতে হবে, কৃপা করে কেউ জ্বালিয়ে দিতে পারেন না।

: জ্বালাবার উপায়?

: "মনন করো বেটা, মনন করো।"

: ইওরোপের পণ্ডিতরাও তো মনন করছেন।

: মুখ্য প্রমাণটি বাদ দিয়ে।

: কোন্ প্রমাণ?

: আপ্ত প্রমাণ, শ্রৌত প্রমাণ, মহাবাক্য[১]রূপ শব্দপ্রমাণ।

: শব্দপ্রমাণের তাৎপর্য ঠিক বুঝি না। আমার এক দার্শনিক বন্ধু বলেন, আচার্য শঙ্কর যেখানেই যুক্তি দিতে পারেন নি সেখানেই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করে দায় সেরেছেন।

: পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীদের এখানটায়ই ভুল হয়। পরোক্ষ বিষয়েই অনুমান প্রমাণ সার্থক, যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'। কিন্তু অনুমিতিদ্বারা অগ্নি প্রত্যক্ষ হয় না। পরমাত্মা সদা প্রত্যক্ষ—সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম[২]। অপরোক্ষ বস্তু সম্বন্ধে শব্দই মুখ্য প্রমাণ ; যেমন ঘটাদি বস্তু দর্শনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই মুখ্য প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঘটের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু ঘটদর্শন হয় না। তেমনি আত্মদর্শনপক্ষে দশমস্ত্বমসি[৩]। আপাতদৃষ্টিতে 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' অসম্ভব বলে মনে হয় ; এই অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হয় মনন দ্বারা। আর বিষয়ভাবনা হেতু

(১) মহাবাক্য চারটি : (ক) ঋগ্বেদীয় 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐতরেয়) ; (খ) সামবেদীয় 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য) ; (গ) যজুর্বেদীয় 'অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদারণ্যক) ; (ঘ) অথর্ববেদীয় ('অয়মাত্মা ব্রহ্ম '(মাণ্ডূক্য)।

(২) বৃহদারণ্যক ৩-৫-১।

(৩) শ্রুতির আখ্যায়িকা। দশজন লোক নদী পার হয়ে দেখে একজন নেই। পথচারী এক প্রবীণ ব্যক্তি এদের কান্নাকাটির কারণ শুনে বুঝিয়ে দিলেন যে গণনাকারী নিজেকে বাদ দিয়ে নয়জন গুণেছিল। গণনাকারী নিজেই দশম পুরুষ—"দশমস্ত্বমসি"।

চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ মনন তত্ত্বাবগাহী হয় না; এ জন্য বিক্ষেপাত্মকে বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত করতে হয় নিদিধ্যাসন দ্বারা। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় শব্দপ্রমাণের সাহায্যে।

ঃ মননের উপায়টা যদি একটু বিশদ করে বুঝিয়ে দেন।

ঃ সাধুজী চুপ করে কী ভাবেন···খানিক বাদে প্রশ্ন করেন।

ঃ ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী দরকার? বেশ তো সুখে আছেন।

ঃ সুখে নেই, অসুখে ভুগছি। অনেকদিন থেকেই।

ঃ ও! কী অসুখ?

ঃ সে অনেক কথা। যদি দয়া করে শোনেন তবে বলি।

ঃ বেশ তো। বলুন।

বললুম। অনেক কথাই বললুম। মনটাও একটু হালকা হলো। সাধুজী মন দিয়ে শুনছিলেন। একটু নরমও হলেন। বললেন,

ঃ দুঃখবোধ তো ভালো জিনিস। পরহিতে কাজ করুন না?

ঃ রুচি নেই; প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

ঃ সাংসারিক কাজকর্ম ও ভোগাদিতে ডুবে থাকুন।

ঃ চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। তাৎকালিক বিস্মৃতি আসে; তারপর যথাপূর্বম্ তথা পরম্—একটানা অবসাদ।

ঃ দুঃখের হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি নেই। আরও অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে। From the frying pan to the fire!

ঃ আপত্তি নেই, যদি আগুনে পুড়ে সোনা হতে পারি।

ঃ যদি আধ-পোড়া হয়ে থাকেন?

ঃ এ জন্মে তা হলে আশা নেই?

ঃ জন্মান্তরের কথা কে জানে?

ঃ তা হলে নিরুৎসাহ করছেন কেন?

ঃ খুব দুঃখ পাচ্ছেন, না?

ঃ মনে তো হয়।

ঃ হুঁ। দুঃখের যদি আত্যন্তিক নিবৃত্তি চান তবে বুদ্ধদেবের রাস্তায় চলুন। বাসনার জন্য দুঃখ, বাসনার নিবৃত্তিতেই শান্তি। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্—এই ভাবনা দ্বারা বাসনা ত্যাগ করুন, দুঃখময় জগৎ শূন্যে পর্যবসিত হবে।

: কী থাকবে ?

: সর্বং শূন্যং শূন্যম্।

: শূন্যের দ্রষ্টা কেউ থাকবে না ?

: তা হলে সাংখ্যযোগ। প্রচলিত বৌদ্ধমতে শূন্যের দ্রষ্টা স্বীকৃত হয় না, যদিও মতভেদ আছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতিই তত্ত্ব। সুতরাং দৃশ্য জীব-ও-বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে দ্রষ্টাকে পৃথক্ করুন, বিবেক খ্যাতি লাভ হবে। মনন মানে প্রকৃতি হতে দ্রষ্টা পুরুষকে পৃথক্ করা।

: সাংখ্যবাদীরা তো প্রকৃতির সত্তা মানেন ?

: তা মানেন।

: দুঃখরূপ প্রকৃতি তা হলে থেকে যাচ্ছে না ?

: প্রকৃতি সম্বন্ধীয় অবিবেকই দুঃখের কারণ ; বিবেক খ্যাতিতে জগৎপ্রপঞ্চ ও মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত, অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য জড় ও দৃশ্য হয়ে যায় ; সুতরাং দুঃখদায়ক হয় না।

: কিন্তু ঈশ্বরের স্থান তো সাংখ্যানুভূতিতে নেই ?

: তা নেই। ঈশ্বরীয় সংস্কার যার আছে তার জন্য ভক্তিমার্গ।

: ভক্তিমার্গে মননের প্রয়োগ কোথায় ?

: সব রাস্তাটায়ই। ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে চান তো ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: ঈশ্বরলাভ হয় না কেন ?

: হয় তো ডাকার মতো ডাকতে পারি না বলে ; কিন্তু কী ভাবে ডাকলে ডাকার মতো ডাকা হয় তা জানি না।

: ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগ না করলে ডাকার মতো ডাকা হয় না।

: সর্বত্যাগ মানে ?

: জগৎ, ভারতবর্ষ, নিজের সুখদুঃখ, মন-বুদ্ধি-অহংকার, দেহ-ইন্দ্রিয়াদি, সব কিছু। জাগ্রত থেকে অহরহ মনন করতে হবে সর্বত্যাগ হচ্ছে কিনা, কেন হচ্ছে না, কোথায় জট পাকিয়ে আছে, ইত্যাদি। দেশের ভাবনা, পাখির গান, অশ্রু-পুলক-কম্প—এ সব-ও কম বন্ধন নয় ; বর্জনে দুঃখ আসে।

: সর্বত্যাগ হলে থাকবে কী ?

: থাকবেন ঈশ্বর—সচ্চিদানন্দ।

: 'আমি' থাকবো না ?

: জলে যেমন চিনি থাকে—একাকার ও তৎস্বরূপ হয়ে।

: তা হলে ভক্তির প্রয়োজন কী ?

: একনিষ্ঠা ভক্তি না থাকলে ত্যাগই করতে পারবেন না। ঈশ্বরে যদি অচলা ভক্তি না থাকে, কার কাছে নিজেকে উজাড় করে দেবেন ?

: অচলা ভক্তি আসবে কী করে ?

: আছে, ধরে নিতে হবে।

: যদি না থাকে ?

: নাম করুন।

: নামে যদি রুচি না থাকে ?

: নাম করতে করতেই রুচি আসে, রুচির সঙ্গে ভক্তি বাড়ে, ভক্তি বাড়তে বাড়তে অচলা হয়।

: সেই বিশ্বাস ছিল ; নামও করতুম। কিন্তু এখন রুচি নেই।

: নেই কেন ?

: বললুম তো আপনাকে ; মনটাই যেন মরে গেছে—মনমরা যাকে বলে ; সিনিসিজ্‌ম্ (cynicism) কিনা জানি না, তবে ঈশ্বরের নব নব রূপ দেখে ঈশ্বর-সত্তায়ই সন্দেহ এসেছে। দয়াময় আর্তিহর ভগবানের সঙ্গে আর্তি ও দুঃখের কি সমন্বয় হতে পারে ? ভেবে কূল-কিনারা পাই না।

: ঈশ্বরে আর বিশ্বাস নেই ?

: ঠিক যে নেই তা-ও বলতে পারি না। তবে মনের শঙ্কাগুলো থেকেই যাচ্ছে, নিরস্ত হচ্ছে না।

: কী শঙ্কা ?

: ঈশ্বর আছেন যদি তবে দুঃখ কেন ? পাপ, অসত্যের জয় কেন ? সব জায়গায়ই তো ঠকছি। ধর্মক্ষেত্রে অধর্ম কেন ? সবটাই কথার কারচুবি নয় তো ? আর পাঁচটার মতো এটাও ব্লাফ্ (bluff) বা ধাপ্পা নয় তো ?

: ছেড়ে দিন না এ-সব চিন্তা ?

: পারি কৈ ? একই চিন্তার আবর্তে পাক খাচ্ছি।

: তা হলে জ্ঞানমার্গের সাধনা করুন। মনন করতে হবে—ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা জীবের ব্রহ্মৈব নাপরঃ। অর্থাৎ বিখ্যাত্ব বিচার দ্বারা জগৎ ত্যাগ করে মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একাত্মতা উপলব্ধি করুন।

: হরেদরে কিন্তু একই দাঁড়াচ্ছে—জগৎবর্জনটা সর্বত্রই সমান।

: তাতে আর সন্দেহ কী? রিক্ত না হলে পূর্ণ হওয়া যায় না! সর্বত্যাগই সাধনার মূল সূত্র।

: মূল সূত্র এক, লক্ষ্যও এক। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা কি তবে রুচির পার্থক্য হেতু?

: রুচির পার্থক্য আছে ঠিকই, তবে লক্ষ্য এক নয়।

: সব রাস্তায় একই জায়গায় পৌছনো যায় না?

: সাধ্য যদি ভিন্ন হয়, সিদ্ধি এক কী করে হবে? গীতাকার বলেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।

: কিন্তু পথের শেষে?

: পথের শেষ আর যাত্রার শেষ এক জিনিস নয়। পথগুলো হচ্ছে ছক-কাটা; হাত তুলে অবধি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যাত্রার শেষ গৃহীত পথের অবধিকে অতিক্রম করেও হতে পারে। যেমন সাংখ্যমার্গের শেষ সীমা বা last post হচ্ছে বিবেক। কিন্তু প্রকৃতি বিবিক্ত হলেও নষ্ট হয় না; সুতরাং ভেদবুদ্ধি থেকে যাচ্ছে। এই ভেদবুদ্ধিকে তাড়াবার জন্য পাতঞ্জলোক্ত নির্বীজ সমাধি অভ্যাস করতে হয়; তার ফল প্রকৃতির পূর্ণ উপশান্তি।

: অর্থাৎ বৌদ্ধদের শূন্যাবস্থিতি?

: একটু পার্থক্য আছে। বৌদ্ধদের শূন্য বৈরাগ্যসম্ভূত; পাতঞ্জলের শূন্য বিবেকরূপ তত্ত্বনিষ্ঠ।

: এখানেই কি যাত্রার শেষ?

: বৈদান্তিকরা স্বীকার করেন না।

: কেন? কী আর বাকি রইলো?

: সাংখ্যোক্ত বিবেকে যে ভেদবুদ্ধি বা logical opposition আছে নির্বীজ সমাধিতে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়, কিন্তু নিরস্ত করা হয় না। কারণ-বশতঃ উদ্বুদ্ধও হতে পারে।

: শেষ তবে কোথায়?

: দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেকে নয়, একাত্মতায়; 'যত্র ত্বস্য সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ'—এই অনুভূতিতে। 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি'[১] এই চরম দর্শনেই সকল দ্বন্দ্বের চিরশান্তি।

[১] গীতা ৬-২৯

॥ ৩-উ ॥

: কাল যাচ্ছি দ্বারকা ; গুরুভাইর তাগিদ এসেছে।

: সেখানে আশ্রম আছে ?

: আশ্রম না, কুটিয়া। গুরুদেব সেখানেই দেহ রাখেন।

: তারপর কোথায় যাবেন ?

: কিছুই ঠিক নেই। আজ এখানে, কাল ওখানে।

: কোথাও বসে যান না কেন ?

: সন্ন্যাসী হবে 'অনিকেত' ; কোথাও বসতে নেই।

: জিজ্ঞাসুর কল্যাণের জন্য ?

: কোথায় জিজ্ঞাসু ?

: নেই ?

: আছে, কিন্তু বিরল—

সাঁচে কা কোঈ গাহক নহীঁ, ঝুটে জগৎ পতীজ জী।

কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, আন্ধোঁকো ক্যা কীজৈ জী ॥

সত্যি কথা শুনতে কেউ চায় না, চায় স্তোকবাক্য। সাধুরাও অনেক সময় স্তোকবাক্য দিয়ে সরে পড়েন।

: ভালো সাধুরাও কি তা করেন ?

: তিব্বতীবাবার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই ? বড় মহাত্মা ছিলেন। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয় তাঁর মহাভক্ত; তিনি একবার বায়না ধরলেন, মন্ত্র দিতে হবে। তিব্বতীবাবা বললেন, 'আচ্ছা বাবা, দিচ্ছি একটি মন্ত্র ; রোজ সকাল সন্ধ্যায় জপ করতে হবে দাঁড়িয়ে দশবার, হাঁটু গেড়ে দশবার ; আবার দাঁড়িয়ে, আবার হাঁটু গেড়ে, এমনি পাঁচবার ; তারপর বসে আটবার ; মোট ১০৮ বার। মন্ত্র খুব জাগ্রত ; বিশ্বাস নিয়ে জপ করে যাবে'। বাবাজীকে একান্তে জিজ্ঞেস করলুম।

: এটা কী করলেন ?

: খুব ভালো প্রক্রিয়া ; উপকার হবে।

: কী উপকার হবে ?

: ভুঁড়িটা কমে যাবে।

: শুধু ওঠ্-বস্ করতে বললেন না কেন ?

: করতো না। সঙ্গে জপ আছে, ঠিক করে যাবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, তিনিও তিব্বতী বাবার ওষুধ এক-আধটুকু প্রয়োগ করেন কি না। জবাব দেন,

ঃ ও আমার ধাতে সয় না। এক ভদ্রলোক কিছুদিন আসতেন এখানে। তাঁর মত হচ্ছে, ঈশ্বরই সব হয়েছেন—স্ত্রী, পুত্র, মান, যশ, সব তিনিই; এইভাবে নাকি তিনি সাধনা করেন। একদিন জিজ্ঞেস করলুম, 'সব তো তিনিই, কিন্তু তিনি বস্তুটি কী তা নিশ্চয় করেছেন?' কে কার কথা শোনে! ভদ্রলোক কেবলই বলেন, সব তিনিই। প্রশ্ন করি, সব যদি তিনিই তবে মলমূত্রও তিনি, ডাস্টবিনের আবর্জনাও তিনি, নর্দমার ক্লেদ, রাস্তার মড়া, কুকুর-বিড়াল এসবও তিনি? 'পুত্রং দেহি, বিত্তং দেহি, যশো দেহি' যেমন বলেন, তেমনি বলুন তো 'রোগ, শোক, মৃত্যু দাও; মার বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নেও, বাপের সুমুখে ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরুক; এসব তুমিই।' পারেন বলতে?...রেগে গেলেন ভদ্রলোক। তখন ধমক দিয়ে বলি, 'স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে সুখে আছেন, থাকুন; ভোগবাসনা আছে, প্রাণভরে ভোগ করুন; ওসব বুকনি ছেড়ে দিন। অধ্যাত্মবিদ্যাটা ছেলেখেলা নয়'। তারপর আর ভদ্রলোক আসেন না।

ঃ প্রকৃত জিজ্ঞাসুও তো আছে। তাদের প্রয়োজনে—

ঃ যতদিন দরকার বসে যেতে পারি।

ঃ আমার তা হলে "জিজ্ঞাসা" আসে নি?

ঃ বলা শক্ত। হয় তো বা এসেছে।

ঃ তবে মন্ত্র দিন।

ঃ রামৈয়াকী দুলহিন লূটা বজার।
কনফুঁকা চিদকাসী লূটে, লূটে জোগেসর করত বিচার।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো, ইস ঠগনীসে রহো হুসিয়ার॥

ঃ মানে, গুরুর প্রয়োজন নেই?

ঃ প্রয়োজন আছে বৈ কি? গুরু ছাড়া এরাস্তায় চলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব।

ঃ সেই আবর্তেই ফেলে দিচ্ছেন।

ঃ কেন?

ঃ গুরুর প্রয়োজন; বলছেন, হুঁশিয়ার। আপনার সাহায্য চাইছি, তাতেও নারাজ।

ঃ নারাজ নই, তবে বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ গুরু শিষ্যের মনের গড়নে খানিকটা সমানধর্মিত্ব থাকা দরকার। আমি শক-থেরাপিস্ট, আপনি বাঙালীদের মতোই মৃদু-স্বভাব। স্পর্শকাতর-ও।

: আপনিও তো বাঙ্গালী!

: জীবনে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে—

: তত্ত্বলাভের পরও কি আঘাতের দাগ থাকে?

: কিছুটা থেকে যায় বোধ হয়; **Substratum of nature** হয়তো বদলায় না। অন্ততঃ আছে এখনও।

: আর কী বিঘ্ন আছে?

: দীর্ঘকাল গুরুর সাহচর্য দরকার; আমি তো কালই চলে যাচ্ছি।

: দীর্ঘকাল সাহচর্য দরকার কেন?

: গুরুর নিকট শাস্ত্রপাঠ না করলে তাৎপর্য ধরা যায় না; কাজেই সময় সাপেক্ষ। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন-নিদিধ্যাসন অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাস আরম্ভ করলে নানারূপ বাধা, বিঘ্ন, শঙ্কা ইত্যাদি উপস্থিত হয়; গুরুর সঙ্গে আলোচনা করে সে সব সরাতে হয়। বড় বন্ধুর পথ, না চললে ঠিক ধরা যায় না। সংসারী জীব কতকগুলো অবলম্বন নিয়ে থাকে—আত্মীয়, বন্ধু, মান, যশ, টাকা ইত্যাদি অসংখ্য রজ্জু দিয়ে দেহবৃক্ষটিকে বেঁধে রাখা হয়। সত্যিকার সাধনা আরম্ভ করলে সব বাঁধনগুলো কেটে দিতে হয়; তারপর শিকড়গুলোও কাটলেন; কিন্তু সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো তখনও রস আহরণে ব্যস্ত; আপনি কম্বলী ছেড়েছেন, কিন্তু কম্বলী আপনাকে ছাড়ছে না—অথচ জীবনে কোনোই অবলম্বন নেই। রোজের পর রোজ তত্ত্ববিচার করে চলছেন, কিন্তু পাচ্ছেন একটানা ঊষরতা, চিত্তের শুষ্কীভাব। তার উপর আবার ব্যাধিও এসে জোটে···কী যে কষ্ট শুধু ভুক্তভোগীই জানে। বুদ্ধদেবের একটি কথা আছে—

হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিবং সুচিগবেসিনা।
অলীনেন'প্পগব্‌ভেন সুদ্ধাজীবেন পস্‌সতা॥

বিনয়, শুচিতা, তত্ত্বানুশীলন, শীলচর্যা, বিশুদ্ধিমার্গসেবা, ইত্যাদিতে যাঁরা রত থাকেন তাঁদের জীবন দুঃখময়। আমি নিজেই কতো বার ভেবেছি, দিই সব ছেড়ে, কিছু নেই এ রাস্তায়, কেবলই মরুভূমির শুষ্কতা; বিপ্লবী জীবনই ভালো, **something real and tangible to fight against**; গুরুদেবের কাছ থেকে পালিয়ে যাবো কিনা এ প্রশ্নও মনে উঠেছে। সেজন্যই বলছিলুম, বেশ তো আছেন। বড় বন্ধুর পথ—"ক্লেশঃ অধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।" গীতার কথা।

ঃ 'সু সুখং কর্তুম্' একথাও তো আছে গীতাতে ?

ঃ প্রক্রিয়ায় কোনো দুঃখ নেই ঠিকই। উর্ধ্ববাহু, হেঁটমুণ্ড, কণ্টকাসন, ব্রতোপবাস, কতো সব কৃচ্ছ্রসাধনের উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—বিশেষতঃ জৈনদের সাধনায়। জ্ঞানমার্গের সাধনা এই তুলনায় সু সুখং কর্তুম্—কোনো হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই, প্রক্রিয়ানৈপুণ্যের ভোজবাজি নেই—শুধু একান্তে এক মনে বিবেকবৈরাগ্যের সঙ্গে তত্ত্ববিচার করে যাওয়া। কিন্তু নিরালম্ব হয়ে তিষ্ঠানোই দায়, যদি জীবন্ত একটি ব্রাহ্মী স্থিতির দৃষ্টান্ত চোখের সামনে না থাকে।

ঃ আপনার গুরুদেব—

ঃ ধ্যানস্থই প্রায় থাকতেন। একদিন শুষ্কতার কথা বললুম ; পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিলেন, 'সকলেরই হয়'। পাতঞ্জলের যোগবিঘ্নের সূত্রটি[১] উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিলেন, যোগাভ্যাস করলে ও-সব চিত্তমল দেখা দেবেই ; নয় তো চিত্ত নির্মল কী করে হবে ? সব ঠিক হয়ে যাবে ; শুধু লেগে থাকা চাই......... এজন্য-ই গুরুর প্রয়োজন। কানে ফুঁ দেওয়ার জন্য নয়, সাহচর্যের জন্য, রাস্তার অন্তরায়গুলো সম্বন্ধে জাগ্রত করিয়ে দেওয়ার জন্য, অবসাদ আসলে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা উৎসাহিত করার জন্য।

ঃ মরুভূমি পার হওয়া দেখছি আমার অদৃষ্টে নেই !

ঃ নেই কেন ?

ঃ বড় কঠিন মনে হচ্ছে।

ঃ কঠিন তো বটেই। সহজিয়া চান ? Made easy হলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না ? ঈশ্বরলাভের দুর্জয় অভিযানকে ঘুমপাড়ানীর গানে পর্যবসিত করতে চান ?

ঃ আমি অন্য কথা ভাবছিলুম, মানে, আমার সামর্থ্যে কুলবে কিনা।

ঃ মানুষেরই তো হয়। নিজেকে হীনবীর্য ভাববেন কেন ? 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লেগে যান, হতেই হবে।

ঃ এই জন্মে যদি না হয় ?

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।[২]

(১) ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানিচিত্তবিক্ষেপাস্তে-ঽন্তরায়াঃ (১-৩০)।

(২) কেন ২-৫।

জন্মান্তর আছে কিনা, এবং থাকলে কী হবে-না-হবে, কে জানে?

: 'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' নয়?

: *আত্মবিশ্বাস না থাকলে তত্ত্বলাভ করবেন কি করে?*

: *গুরুলাভই যে হলো না।*

: হবে, হবে। ঘাবড়াবেন না। প্রশ্ন জেগেছে, উত্তর আসবে না? একি হয়? আধ্যাত্মিক জগতেরও একটা অমোঘ নিয়ম আছে; তার ব্যতিক্রম কখনও হয় না।

: প্রারব্ধে না থাকলে নাকি হয় না?

: আপনার প্রারব্ধে নেই এ খবর কোথায় পেলেন?

: ভুগে ভুগে নিজের সম্বন্ধে আর তেমন আস্থা নেই।

: না ভুগলে কি এ রাস্তায় কেউ আসে?

: এ রাস্তায় চলবার সম্পদ্ থাকা চাই তো?

: মা শুচঃ সম্পদং দেবীম্ অভিজাতোঽসি পাণ্ডব।

॥ ৪ ॥

দশাশ্বমেধ ঘাট; যাত্রীদের ভিড় এখানে লেগেই আছে; গান, কীর্তন, ভজন, কথা, ও স্নানার্থী। স্নান করলে হয়; সাঁঝ পেরিয়ে গেছে; যাক। দুর্বাসাজীকে আগে যেন দেখেছি!...কৈ, সাক্ষাৎ তো কোনো দিন হয় নি আগে!...গঙ্গাজল মাথায় দিই...হরিদ্বারের কথা মনে হয়...একই গঙ্গা, তবুও এক নয়...কাশীর গঙ্গা মানে মণিকর্ণিকার ঘাট...কতো কোলাহলই না জীবনে সৃষ্টি করি...অক্ষয় কীর্তি...অমর বাণী...হইচই...হঠাৎ সব চুপ...'চার জনে মিলি খাট উঠাইনি রোবত লে চলে ডগর ডগরিয়া'...চিতাভস্ম...গঙ্গাজল...ওঁ শান্তিঃ। তারপর অঙ্গারের আসন নিয়ে বসেন শিবজী! মড়া পুড়িয়ে তাই পিছন ফিরে দেখতে নেই...দেখলে ক্ষতিটা কী?...দেখা যায়ও না—এক-আধ বার চেষ্টা করেছি, দর্শন পাই নি। মৃত্যুর পর দেখা যায়? এখানে দেখা না পেলে যে 'মহতী বিনষ্টিঃ'! চিতাভস্ম-গঙ্গাজল-শিবম্। একটা আনুপূর্ব আছে বোধ হয়... ত্রৈলঙ্গস্বামীকে সাক্ষাৎ শিব বলা হতো। ছোটবেলা ওঁর ছবি দেখেছি...মনোগহনে কাশী আর ত্রৈলঙ্গস্বামী এক হয়ে আছে...অদ্ভুত চোখ; কতো সাধুর ছবি দেখেছি, কিন্তু অমন চোখ কোথাও দেখিনি—স্থির অথচ সর্বগ্রাসী; ভয় হয়, আকর্ষণও করে...দুর্বাসাজীর চেহারা অন্যধরণের—স্বস্থ, বৈরাগ্যপূর্ণ, যেন গাছতলায় বসে

আছেন···স্বপ্নে দেখেছিলুম ওঁকে ?—একটি আমবাগান, আসনে উপবিষ্ট একজন সাধু ; প্রণাম করতেই বললেন, 'প্রণবমন্ত্র জপ করো' ; স্বপ্নদৃষ্ট সেই সাধুজীর মতো যেন চেহারা···ভুলও হতে পারে। শক্-থেরাপি পছন্দ করেন। কেন ? অনেক ঠোক্কর খেয়েছেন বলে ? বিপ্লবী জীবনের শক্ ?···জীবনের এই না জানা ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে কৌতূহল হয়, কিন্তু জানবার উপায় নেই। ইতিহাস লেখা এখন আমরা শিখেছি, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি আমাদের মজ্জাগত ধর্ম নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই বুদ্বুদের মতো ওঠে, লয় পায়। ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ডিত কাল-পরম্পরার কী মূল্য ?···সেইজন্যই হয় তো জীবনী লেখা আমাদের ধাতস্থ হয় না—বিশেষতঃ সাধুদের জীবনী। মালমসলা নেই বললেই চলে···জীবনসংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাত তো মায়ার তরঙ্গমাত্র···কী প্রয়োজন সেদিকে নজর দিয়ে ? নজর দেওয়া নিরাপদও নয়—অহমিকার চোরাবালিতে বিপদের আশঙ্কা আছে।··· কতো মহাত্মা সমগ্রজীবনের সাধনা দিয়ে শাস্ত্রের টীকা লিখে গেছেন ; টীকাগুলো অমূল্য সম্পদ, কিন্তু টীকাকারের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না।···কিছু দিন আগে এক মহাত্মার জীবনী পড়ছিলুম—না আছে ঘটনা, না আছে চিত্ত-লহরীর কোনো পারম্পর্য। অন্তশ্চেতনার বিকাশ কী করে হলো, কোন্ নিষ্পত্তির পর কোন্ দ্বন্দ্ব দেখা দিল, কেন দেখা দিল, কী তার স্বরূপ, কিভাবে তার নিষ্পত্তি হলো, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের কী ধারা ও রূপ এবং কোন্ অবস্থাচক্রে ও সাধন বলে দ্বন্দ্বাতীত পূর্ণতায় এসে পৌছলেন—কিছুই বুঝবার উপায় নেই। যোগাভ্যাস করলেন, সমাধিস্থ হলেন, তত্ত্ব লাভ করলেন, ব্রাহ্মী স্থিতিতে সমাসীন হলেন! জীবনটা যেন একটা প্রক্রিয়া মাত্র, যার শেষ ধাপ ব্রহ্মানন্দের পরম সুখ! অথচ এঁদের জীবনেই থাকে চূড়ান্ত চিত্তসম্পদ্। কর্ম ও কথার হইচই থাকলেও সাধারণ লোকের জীবনে কতটুকুই বা অগ্রগতি ? জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ—এর বেশী আর কী ?···সাধুদের জীবনী যাঁরা লেখেন তাঁরা পরম ভক্ত, অর্থাৎ সত্যকে দেখবার বা যাচাই করবার সাহস নেই ; কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁদের! মাটির সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই, অথচ আকাশে অজস্র ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছেন ; অথবা অণু প্রমাণ ঘটনাকে রং ফলিয়ে পর্বতাকার বিস্ময়ে রূপান্তরিত করেন ? ধাঁধা লাগে, কিন্তু পথিকের কোনো দৃষ্টিই খোলে না।······

মানুষের চিত্তরাগ, জীবনের আলো-আঁধারি, প্রাণের দ্বন্দ্ব, মনের লুকোচুরি, সংঘাতের বেদনা, নৈরাশ্যের কালো ছায়া, নব নব উষার নিত্য নূতন আরক্তিমা, অর্থাৎ মানবতার দিক্‌টা এক বিরাট শূন্য···দুর্বাসাজী এক-আধটুকু ইঙ্গিত

দিয়েছিলেন···কিন্তু বোধিধর্মের শক্-থেরাপিতে কী করে বিশ্বাস এলো?···বোধিধর্ম-ও এক অদ্ভুত চরিত্র!···দাক্ষিণাত্যে ঘর; খ্রীষ্টীয় ছয় শতকে চীনে গিয়ে জেন বৌদ্ধমত প্রবর্তন করেন। কী ঘটেছিল তাঁর জীবনে? কোয়াঙ (koan)-এর সঙ্গে তাঁর জীবনের কী সম্বন্ধ?···জানবার উপায় নেই। হাতীর দাঁতের মূর্তিটি (খ্রীঃ ১৯ শতক) কিন্তু অপূর্ব! জাপানী শিল্পীর তৈরী; ছোট্ট দেহাবয়ব, সুন্দর নিখুঁত; চাদরে গা ঢাকা, হাতে মালা, গলায় হার, কানে কুণ্ডল, আর চোখ! তাইতো! ঠিক ত্রৈলঙ্গস্বামীর মতো!···বোধিধর্মের চোখে ভীতির ব্যঞ্জনা আরও তীব্র, uncanny ভাবের চূড়ান্ত দ্যোতনা, কী দেখে যেন ত্রাস লেগে গেছে! শূন্য?···হয় তো। ত্রৈলঙ্গস্বামী—শূন্যকেও হজম করে ফেলেছেন। অগস্ত্যমুনি সমুদ্রপান করেছিলেন। হয় তো একই অর্থ। সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে গ্রাস করে ত্রৈলঙ্গস্বামী শিব হয়ে বসে আছেন···শ্মশানে শিব···ত্রিভুবন উদরস্থ করে শিবত্বলাভ?···ত্রৈলঙ্গস্বামী—বারাণসী—মণিকর্ণিকা—আনন্দধাম! দেহ-ত্যাগের পর বিশ্বনাথের আবির্ভাব! মণিকর্ণিকায় চিতাভস্ম; মানে সর্বত্যাগ?··· বোধিধর্মের শূন্য? বাসনাগ্নির নির্বাপণ ও গঙ্গোদকে ওঁ শান্তিঃ? শান্তিই কি তত্ত্ব? সব জ্বালার উপশান্তি—যেন অভাবসূচক। তারপর শিবত্ব?··· উপায়?···মনন করো বেটা, মনন করো···ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই মনন?···ব্রহ্মকে জানিনা···আর জগৎ? থাক আর না থাক, আমার তাতে কী?···

> ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
> নবন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥

দূর হতে সানাইর সুর ভেসে আসে; রাগ কেদারা; সুরের কম্পনে রূপায়িত হয়ে ওঠে কেদারনাথের উদাস গাম্ভীর্য। মীড়ের আকুঞ্চনে অন্তশ্চেতনা মোড় ঘুরে ঘুরে এগোয় শিবলোকের তটভূমির সন্ধানে···সুরের হিল্লোলে ক্রন্দসী আচ্ছন্ন··· এবার ধুনের তরঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে···মণিকর্ণিকার আগুন···চিতানলের ঊর্ধ্বশিখা···বিশ্বময় আগুন ছড়িয়ে পড়ে···বিশ্বজন মন্ত্রপাঠ করে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?···সহস্রশীর্ষ সুরের অগ্নিতে আরত্রিক বাজে কাশীশ্বর কেদারনাথ বিশ্বেশ্বরের···বিরাট, ভাস্বর, স্তব্ধগম্ভীর দেবমূর্তি···মূর্তি নয়···জ্যোতির্ময় চক্ষু··· সর্বগ্রাসী চক্ষুরাত্তম্···সহস্রজিহ্ব অগ্নির ভোক্তা, ভর্তা, মহেশ্বর···হে বিশ্বম্ভর! হে মহাদেব! হে কাশীনাথ! হে রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকলি গরল ভেল

(গ)

জন্মভূমিশ্চ

জন্মভূমিশ্চ

॥ ১ ॥

কাশী থেকে ফিরে কেবলি মনে হচ্ছে দেশ থেকে একবার ঘুরে আসি শেষ দেখা যাকে বলে। মামাবাবুকে নিষেধ করার ফল হয়তো—ভূটো আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে।···একলা যাবো?···ক্ষেপুকে সঙ্গে নিলে হয়···ক্ষেপু কিন্তু বেশ বদলে গেছে, আগের মতো গোঁড়ামি নেই···অনেকটা ধাতস্থ; হয় তো অবস্থাচক্রে··· গুরুদেব দেহত্যাগ করেছেন, আয় কমতির দিকে, সংসারের চাপ বেড়েছে···ইষ্ট বেঙ্গলের খেলা থাকলে যেতে চাইবে না···হার-জিতের পরিস্থিতি বুঝে কথা পাড়লে রাজী হতে পারে···হারের মুখে গেলে হয় তো কথাই কইবে না···যাক গে, দেখাই যাক···

ঃ কীহে দেবলচন্দ্র! তীর্থ করা হলো?···কাশী থেকে ফিরলি কবে?

ঃ মাস খানেক হবে বোধ হয়।

ঃ তুই তো এখন বেশ ভালই আছিস!

ঃ একরকম। তবে মনটা এখনো জোড়া লাগে নি। এজন্মে—

ঃ তোর বাঙ্গালে গোঁ ছাড় এবারে; কারু চরণাশ্রিত হয়ে যা। নিজের কেরামতিতে কি আর ভবসিন্ধু পার হওয়া যায়?

ঃ তোর নৌকোয় নিয়ে চল না? না হয় ওপার থেকে নৌকোটা পাঠিয়ে দিস।

ঃ ও-সব চালাকি রাখ। গুরু করে ফেল—দিব্যি পাল তুলে চলে যাবি।

ঃ ইষ্ট-বেঙ্গলের খবর কি?

ঃ হারে নি—ড্র। তখনই বলছিলুম—

ঃ দেশে যাবি নাকি?

ঃ গেলে হতো। যাবি তুই? দু-জনা—মন্দ হতো না। একটা ঝামেলায় পড়েছি। দেখি···আমাদের কেষ্টদা আজ কাল খুব কীর্তন গাইছে···ভাল কথা, একজায়গায় কীর্তন আছে; চল শুনে আসি।

ঃ রস পাই না।

ঃ বায়স্কোপও তো দেখে কতো লোক! বিনা পয়সায়, 'কিউ'তে না দাঁড়িয়ে, কীর্তনানন্দ ভোগ করবি—আপত্তিটা কিসের?

ঃ কীর্তনের নামে রসাভাস, ভাবের অসামঞ্জস্য—গা জ্বালা করে। কোথায় আনন্দ?

: সে ভয় নেই। সুরানন্দ বাবাজীর নাম শুনিস নি ?

: না তো। সুরানন্দ! মদ খান নাকি ?

: ঐ তো তোর রোগ! সুরা না; সুর, মানে রাগ-রাগিণী। বাবাজী ভাল কীর্তন করেন। অপরূপ চেহারা, সিল্কের গেরুয়া, এরোপ্লেনে যাতায়াত, কাগজে টুর প্রোগ্রাম (tour programme), এনগেজমেণ্ট (engagement) করে ভেট-মুলাকাত—বেশ আপ-টু-ডেট্ (up-to-date) সাধু! কিন্তু ইণ্টারভিউ (interview) পাওয়াই মুস্কিল।

: শিষ্য না হলে দর্শন দেন না বুঝি ?

: উঁহু। মেয়েদের ভিড় লেগেই আছে—লেডিজ্ ফার্স্ট। অনেকবার চেষ্টা করেও সুবিধে করতে পারি নি। তারপর একদিন সট্ করে ঢুকে পড়লুম। শিষ্যরা তো এই মারে কি সেই মারে! পথ আগলে বলে, 'ও-দিকে যাচ্ছেন যে বড়! আপনার মাথা খারাপ নাকি ? গুরুদেব এখন ড্রেসিং রুম্-এ।'

: তারপরও তুই ওখানে যাস ?

: সাধুদের উপর রাগ করতে নেই। অন্য কারণও আছে। শিষ্যদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছি।

: বেশ মডার্ন সাধু দেখছি! কীর্তন সুবিধার হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

: আগে শোন্ই। আমি অনেকবার শুনেছি। ভাল গলা। গানেই তো বাজার মাত করে ফেলেছেন। বেশ মডার্ন কীর্তন!

: কীর্তন আবার মডার্ন কিরে ? তেঁতুলের আমসত্ত্ব ?

: না শুনে টিপ্পনী কাটবি না। চল্।

ক্ষেপু মহারাজের পাল্লায় যখন পড়েছি, শুনতেই হবে। শুনলুম। মাঝখানটায় উঠে আসাটা অশোভন দেখাতো। ক্ষেপু হয়তো গালাগালিও করতো। প্রসাদের পাট ছিল মডার্ন, বেশ লোভনীয়; কলা বাতাসা কিংবা মালপুয়া নয়—কচুরি, সন্দেশ, বিস্কুট, আপেল, চা। মডার্ন কীর্তনের টি-পার্টি···মহিলারা গিজগিজ করছেন; টি-পার্টি আরম্ভ হওয়ার আগে সুরানন্দকে আরতি করে প্রসাদ খাওয়ানো হলো—একাজের ভার পেয়েছিলেন মহিলাভক্তবৃন্দের ভিতর যাঁরা বিশিষ্ট ভি-আই-পি, মানে ক্লাস ওয়ান (class I) ···যাক গে, মরুক গে··· সুখে থাকাটাই বড় কথা···

: দেখলি তো! তোফা গায়! তোর কেমন লাগলো ?

: মন্দ কি ?

: বিনা টিপ্পনীতে 'মন্দ কি' !···তা হলে ভালোই লেগেছে ?···কীর্তন তো কতো জায়গায় শুনি, কিন্তু এই বাজারে এমন প্রসাদ !···সন্দেশের পাকটা আর একটু কড়া হলে—এটাই বুঝি তোর অন্য কারণ ? কিন্তু প্রসাদ সম্বন্ধে টিপ্পনী কাটা ঠিক নয়···বৈষ্ণবাপরাধ হবে।

: টিপ্পনী তো নয়। তবে যাক গে।···কচুরির ঘিটা বেশ ভালো ছিল—খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ ; এবাজারে দুর্লভ।

: দালদাও তো হতে পারতো ?

: সে ভয় ছিল বলেই খোঁজ নিয়ে রেখেছিলুম। আমাকে কি কাঁচা ছেলে ভেবেছিস ?

: যদি দালদা হতো ?

: খেতুম না। দালদা আমার সহ্য হয় না।

: প্রসাদ তো ? অগ্রাহ্য করা—

: প্রসাদ কণিকামাত্র। ভেঙ্গে একটু মাথায় দিতুম।

: প্রকারান্তরে অবজ্ঞা করাই হতো।

: তা বলে দালদা খেতে হবে নাকি ?

: সাধু নাগমশায়কে পাতায় করে প্রসাদ দিলে পাতা পর্যন্ত খেয়ে ফেলতেন।

: হুঁ ; তা বটে। নাগ মশায়—তা নাগ মশায়ের মতো ভক্তি আসুক আগে। শুধু শুধু দালদা খেয়ে লাভটা কি ?···এখানটায় ট্রামে উঠবো। মোটের উপর কীর্তন তোর ভালই লেগেছে, কি বলিস ?

: এর নাম কীর্তন ? মাথা ধরে গেছে। লোকটা এক নম্বরের জোচ্চোর ; ধরে চাবকানো উচিত।

: তাই বল ! আমি ভাবছি দেবলচন্দ্র চুপ মেরে আছে কেন ? তবে কি শরীরটাই আবার খারাপ হলো ? দেবল দি ক্রিটিক অথচ মুখে রা-টি নেই। ঐ যে ! ট্রামটা এসে গেছে। চলি আজ। আর একদিন কথা হবে···

মাথাটা ধরা ছিল। হেঁটেই চললুম। বেশ দক্ষিণে হাওয়া ; খানিকটা হেঁটে যেন বেঁচে গেলুম···শরীরটা ঠিক সারে নি দেখছি···স্নায়ুগুলো সবল আর কোনো দিনই হবে না···গাঁয়ে মানুষ হয়েছি, পথচলার নেশাটা এখনো আছে···দৈহিক শ্রান্তি আসে কিন্তু মনটা চাঙ্গা হয়···একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম পাবনার এক গণ্ডগ্রামে ; ঠাকুরদের জমিদারি ; আমার এক কাকাবাবু কাজ করতেন তাঁদের সেরেস্তায়, সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম···নূতন দেশ, বাঁধানো রাস্তা, গরুর

গাড়ী, অচেনা মানুষ…আবেশে চলি…মাঝে মাঝে মনে হয়, ফিরি এবারে… রাস্তার দিকে তাকাই…দূরে একটা মন্দির না! দেখা যাক…হয়তো কোনো সাধু আছেন…অনেকটা যে এলুম…মন্দিরটাও তো আর দেখা যাচ্ছে না… দেখি একটু এগিয়ে…খাল যে! লোকজন অবশ্যি পেরিয়ে যাচ্ছে…না, আর এগনো ঠিক নয়…গাছতলায় একটু জিরিয়ে নেই বরং…ঘড়িটাও আনি নি… কটা জানি বাজে!… এমনি খাল পেরিয়ে ইস্কুলে যেতুম; সঙ্গে গামছা থাকতো …ধুতি, গেঞ্জি, কামিজ, বই, সব মাথায় করে খাল পার হই…ঐ তো ইস্কুল ঘর …সেরেছে! ঘণ্টা তো পড়ে গেলো…ছুট্‌ছুট্‌…আজ আবার তক্ষক পণ্ডিতের ক্লাস…নির্ঘাত নীল-ডাউন (**Kneel down**); না হয় স্ট্যাণ্ড্‌ আপ্‌ অন্‌ দি বেঞ্চ (**Stand up on the bench**); পণ্ডিত হলেও ঐ আদেশগুলো ইংরিজিতেই দিতেন…কথা বলতেন পণ্ডিতি ভাষায়—অর্ধ সংস্কৃত। ক্লাসে টুঁ শব্দ করলে শাস্তি ছিল 'ব্যাস-বাক্য বল্‌ তো রে'। কেষ্টদার সাতখুন মাপ …"কীর্তনে গিয়েছিলুম সার।" ঐ ওজুহাতে পাশের নম্বরও পেয়ে যেতো…পণ্ডিত মশায়ের বয়স হয়েছিল, ক্লাসে প্রায়ই ঢুলতেন…একদিন হেডমাষ্টার মশায় এসে হাজির… আমাদের মৃদুগুঞ্জন হঠাৎ থেমে যায়; হয়তো সেকারণেই পণ্ডিত মশায় পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে চোখ বুজেই বলেন, "ভেবে দেখলুম, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।"… নিকটেই মামাবাড়ী; কালবৈশাখীর দিনে মাঝে মাঝে মামাবাড়ী চলে যেতুম। মামাবাবু বিপত্নীক, ছেলেপিলে ছিল না, কর্মস্থলে থাকতেন। দেশে থাকতেন দিদিমা…কী যত্নই না করতেন! এমন স্নেহ আর হয় না। রাত্রি বেলা খাওয়া দাওয়ার পর শুকনো নেকড়া দিয়ে পা মুছিয়ে, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে সরষের তেল লাগিয়ে, মশারি ফেলে, গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতেন—যেন নারায়ণ ঠাকুরকে শুইয়ে দিচ্ছেন…স্নেহের অমৃতপ্রস্রবিণী…দিদিমার কথা ভাবলে এখনো চোখে জল আসে…

কোয়ারটারস-এ ফিরে দেখি বাড়ীর লোক বেশ ভাবিত হয়ে উঠেছেন। কাকাবাবু বলেন, 'তোর দেরি দেখে ভয় হচ্ছিল! নূতন জায়গা, হয়তো পথ ভুল করে ঘুরছিস।'…কলেজ স্কোয়ারে বসেছিলুম। বাড়ী ফিরতে রাত প্রায় দশটা… শুয়ে শুয়ে কীর্তনের কথাই ভাবছিলুম। এর নাম কীর্তন!…পাবনার সেই গাঁয়ে কীর্তন শুনেছিলুম…যেমনি গলা, তেমনি আখর, আর অপূর্ব খোলের বাজনা… শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনছিল…নদী তরঙ্গসঙ্কুল…মাঝি তরী নিয়ে এসেছে… পারের কড়ি এক আনা নয়, দু-আনা নয়…নয় আনা নয়…পুরোপুরি ষোল

আনা…আড়ালে বসে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলুম…মডার্ন সাধু! মডার্ন অভিশাপ…সব আদর্শ-ই জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছি…দয়ালদা একদিন এক সাধুর কথা বলছিলেন।

ঃ তখন আমি জামালপুর থাকি। ‥রুদেব বললেন 'এখান থেকে ৭।৮ মাইল দূরে একটি ভাঙ্গা বাড়ীতে একজন মহাত্মা থাকেন ; দর্শন করে আসবি।'… পড়ো একটা দালানবাড়ী চারদিকই ভাঙ্গা, একটি কুঠরির সামনে বাঁশের কঞ্চির দরজা, তার দিয়ে বাইরের দিক থেকে বাঁধা…ভিতরে গিয়ে দেখি কেউ নেই ; পোয়ালের উপর একটি কম্বল বিছানো রয়েছে ; এক কোণে একটি ঘড়া আর দু-চারটে জিনিস…বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলুম ; অদূরে একটি গরু বাঁধা ছিল। গাছতলায় বসে ভাবি, সাধুজী যদি আজ না ফেরেন!…পনর ষোল মাইল হাঁটা হবে…পণ্ডশ্রম যদি হয়!…পিপাসা লেগেছিল…ফিরবো? কী আর কাজ!…ধ্যান করি বসে…বিকেল নাগাদ বরং ফিরবো…ঘাস মাথায় করে একজন লোক এলো, নগ্ন দেহ, মলিন বেশ। গরুটিকে ঘাস বিছিয়ে দিয়ে আমার কাছে এলো ; জিজ্ঞেস করে—

ঃ কী চান আপনি?

ঃ সাধুজীর দর্শনে এসেছিলুম।

ঃ কোথা থেকে আসছেন?

ঃ সহর থেকে।

ঃ অনেকটা হাঁটতে হয়েছে আসুন ভিতরে।

এক গ্লাস দুধ ও জল দিল লোকটি। খেয়ে প্রশ্ন করি।

ঃ সাধুজী কখন আসবেন?

ঃ আমিই এখানে থাকি।

লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাই। গৈরিক ছিল না, বুঝতে পারি নি। তারপর কথা হলো। খাঁটি অদ্বৈতবাদী সাধু, পূর্ণ জ্ঞানী ; তত্ত্ব যেন চোখে ভাসছে…যাওয়ার মুখে জিজ্ঞেস করলুম,

ঃ গরু রেখেছেন কেন? অসুবিধা হয় না?

ঃ পেটে কিছুই সয় না, গ্যাসট্রাইটিজ না-কি, ডাক্তারবাবু শুধু দুধ ভাত খেতে আদেশ করেছেন। চালটা ভিক্ষায় জুটে যায় ; গরু একটি বাধ্য হয়ে রাখতে হয়েছে। মাপ চেয়ে, প্রণাম করে বিদায় নিলুম…খাঁটি সাধুর সঙ্গ না করলে দৃষ্টি খোলে না। সেজন্য গুরুদেব কোনো মহাত্মার খবর পেলেই বলতেন, 'দর্শন করে এসো'।

শুধু যে আদর্শ-ই নষ্ট হচ্ছে তা নয় ; রুচিবিকার-ও ঘটেছে। মডার্ন কীর্তন মানে মডার্ন ভুনিখিচুড়ি—লাল আলু, গোল আলু, লঙ্কা, গরম মসলাও যেমন আছে, তেমনি আছে পেঁয়াজ, রশুন, ডিম, মেটে···মডার্ন কীর্তন = কীর্তন + রবীন্দ্রসঙ্গীত + ভজন + শ্যামাসঙ্গীত + আধুনিক গান। আরম্ভ হলো গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে ; তারপর পদাবলী ; মহাজনের পদ যতক্ষণ ছিল ঠিকই ছিল ; আখর দিতে গিয়েই তালগোল পাকিয়ে ফেললেন, রসাভাসের পর রসাভাস···হঠাৎ চাবুক মারেন, আমার নয়ন-ভুলানো এসে। কথা, ভাব, পরিবেশ, সংবেদন সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু এখানেও স্থিতি নেই ; সুরু হলো ভজন—সুর ও ভাবের অদ্ভুত সাংকর্য··· ভজনের বৈশিষ্ট্য নিঃসঙ্গতা ও বৈরাগ্য ; কীর্তনের বৈশিষ্ট্য রসের গুরুপাক ও বহুজনের সাহচর্য। ভজন শান্ত ও স্থির ; কীর্তন উচ্ছল, উদ্বেলিত। কীর্তনে ভোগ হয় বহুর সঙ্গে পথের আনন্দ ; ভজনে চাই আকাশতলে একাকী বসে ভগবানের সান্নিধ্য। কীর্তনে বাজে একাধিক তারের মিশ্রগুঞ্জন, অরকেস্ট্রা ; ভজন একতারার নিঃসঙ্গ রাগিণী। রবীন্দ্রসঙ্গীত তুষ্টিমূলক ; আরাধ্য গৌণ, মুখ্য তাঁর নূপুরধ্বনি। শিউলি ফুলের রাশি, শিশিরভেজা ঘাস, আলোছায়ার আঁচল, বনদেবীর শঙ্খরব—আর প্রয়োজন কিসের? নয়ন-ভুলানো তো এসেই গেছে··· যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে !···কোথা থেকে কোথায় ! রসাভাস-দোষ হলে মহাপ্রভু কীর্তনীয়াকে তাড়িয়ে দিতেন ; গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা তাঁকে ডেকে আনা হয়েছিল ; অভিশাপ দিয়ে নিশ্চয় সরে পড়ে থাকবেন···রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর শ্যামাসঙ্গীত !···মামাবাবুর কাছে অনেক শ্যামাসঙ্গীত শুনেছি···একটা প্রপঞ্চোপশম ভাব থাকে ; মন জগৎকে ছেড়ে, নামরূপকে বর্জন করে, শূন্যাবগাহী হয়···কথার সঙ্গে যে সব রাগরাগিণী ও তাল ব্যবহার করা হয় তাদের দ্যোতনা আঁধার সমুদ্রের —sublime। কোথায় পূর্ণিমারাতের বঁধুয়া, কোথায় শরৎলক্ষ্মীর অঙ্গসৌষ্ঠব, কোথায় অমানিশার দুর্গম যাত্রা, আর কোথায় 'অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ'র নির্জন গাম্ভীর্য···আগে রেওয়াজ ছিল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ; এখনকার রেওয়াজ 'গরলেন', নইলে আধুনিকত্ব বজায় থাকে না। সুতরাং শেষে এলো 'টিপিক্যাল আধুনিক গান' যা শুনলেই মনে হয় বয়স্ক লোক দাড়ি গোঁফ কামিয়ে শাড়ি পরে, গালে হাত দিয়ে মেয়েলী ঢং এর অনুকরণ করছে···অর্থাৎ 'অনুরোধের আসর'·· সর্বত্রই এক 'সুর' মানে 'বেসুর'। কিছুদিন আগে একটা পরব ছিল। কৃষ্টিসম্পন্ন ভদ্রলোক যাঁরা রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাঁরা আজাদ হিন্দ এর 'ধন্য' লাউড্‌স্পীকারে চালালেন সিনেমার কতকগুলো অশ্রাব্য রেকর্ড। অগ্নিবর্ষণ যখন

থামলো তখন শুনি পাঁড়েজীদের আড্ডার ভজন—রাম সুমির, রাম সুমির, এহী তেরো কাজ হৈ।·· মহাপ্রস্থানের পথেও তো মুলোর ঢেকুর তুলে চলি ···যাক গে মরুক গে, আমার ও-ভাবনায় কাজ কি?

সাগরকূলে বসিয়ে বিরলে হেরিব লহরমালা।
মনোবেদনা কব সমীরণে, গগনে জানাব জ্বালা॥

তাই ভালো·· আপনাতে আপনি থাক মন···কিন্তু একা যাবো? ক্ষেপু যেতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না···একা যাওয়া ঠিক হবে কি?···যদি ফিরে আসতে না পারি?···তাই তো!···পাশের বাড়ীতে কে গান গায়—

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—
আমি আর বাইতে পারলাম না।
(আমি) সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে,
তবু মোর মনের নাগাল পাইলাম না॥
ভাঙ্গা দাঁড় আর ছেঁড়া দড়ি রে,
নৌকার হালে জল আর মানে না।
অফর বেলায় ধরলাম পাড়ি রে,
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না॥

পদ্মা নদী একবার পাড়ি দিতেই হয়। একাই যাবো, যা থাকে বরাতে। তারপর···হয়তো আর পর নেই···

একাই চলছি। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা; যাত্রা করা হয়তো ঠিক হয় নি—পক্ষান্তে মরণং ধ্রুবম্।···কী আছে কপালে?···বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।···দুদিকের জল কেটে মন্থর গতিতে স্টীমার এগচ্ছে; এক কোণে বসে জলের দিকে চেয়ে আছি···ভেবেছিলুম এমনি করে পিছনকে পিছনে ফেলে চিরদিন চলবো··· ভাগ্যদোষে পড়ে গেলুম ঘূর্ণপাকে···এই সেই পদ্মানদী···কতো বার পাড়ি দিয়েছি···পদ্মার খর স্রোতের মতো ছিল প্রাণের উচ্ছল গতি···বর্ষাবাদলের মতো চিত্তের আবেশ···মন্ত্রের মতো আওড়াতুম 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী

বাওয়া'···কী তৃপ্তি নিয়ে দেশ থেকে ফিরতুম আপন কর্মস্থলে···কোথায় সেই শিশির-ভেজা মন ?···সূক্ষ্ম শিকড়গুলোও কে যেন উপড়ে ফেলে দিয়েছে···পাতা ঝরে গেছে···আছে শুকনো কাঠ···যে দেশ আমার স্বদেশ ছিল সে দেশ আমার স্বদেশ নয়···খেদ করেছিলেন স্টীভ্‌ন্‌সন্‌ (R. L. Stevenson), কিন্তু আমাদের মর্মন্তুদ ব্যথা তিনি জানেন নি···পদ্মার সেই পুরাতন ছন্দ···ঘোলাটে জল···লাস্যময়ী গতি···অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া···স্টীমারের সারেঙ সাহেব হয়তো বা আমাদেরই গাঁয়ের লোক, চাচা সাহেবের সঙ্গে কতোবার ছাদে কাঁচের ঘরে বসে গল্পগুজব করেছি···এখন ভাবি দেখা না হওয়াই ভাল···দু'পাড়ের দৃশ্য তেমনি নয়নাভিরাম···জল কেটে, ফেনা তুলে, বাঁশি বাজিয়ে স্টীমার চলেছে ··বাঁশির সেই পুরনো সুর, যার ডাক শুনে কতো অচিন দেশে হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় দেবতাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, কতো অজানা রাস্তা ধরেছি··· কতো ঘাস কতো ফুল···কতো পাখী ও জোনাকি পোকা ··পাহাড়ের ওপারের স্বপ্ন···মাঠের শেষে গাছ···গাছের ফাঁকে সেঁজুতির রহস্যময় আহ্বান···একটা দৈত্য এসে সব তছনছ করে দিল···অনেকদিন আগেকার কথা; একবার বাস্তুপূজো হচ্ছিল মাঠে, গাছতলায়; কোদাল দিয়ে মাটির চাপড়া তুলে গোবর দিয়ে বেশ করে নিকিয়ে পূজোর আয়োজন করা হলো···ফুল, বেলপাতা, দূর্বা, চন্দন, আম্রপল্লব, গঙ্গাজল, এবং নৈবেদ্যর জন্য চাল, কলা, বাতাসা, দুধ, দই, ক্ষীর ইত্যাদি। পুরুতঠাকুর গিয়েছিলেন নারায়ণ বিগ্রহ আনতে; একটি ছেলে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে কাক তাড়াচ্ছে। হঠাৎ এক বাঁদরের আবির্ভাব—এসেই চালকলা সাবাড় করতে লাগলো; আমাদের দেশে বাঁদর নেই, ছেলেটি ভয়ে দিল চোঁচা দৌড়। বাঁদর দেখে এলো কুকুর···ফলারের শেষে গরু ও ছাগল এসে ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, সব সাফ করে দিল। পুরুত ঠাকুর এসে দেখেন—বাঁদর, কুকুর, গরু ও ছাগলের পায়ের দাগ, গোময়, ছাগলের নাদি, গোমূত্র···এখন আছে শ্মশানের পোড়া কাঠ, মড়ার খুলি, শেয়াল কুকুরের লড়াই···

রাম হলেন রাজা;
খেতে পায় না প্রজা।
বাঁদরে খায় কলা;
আমরা? কানমলা॥

কেন এমন হলো ?…পাল তুলে একটা নৌকো যাচ্ছে…বর্ষাকালে একবার ছোট্ট একটি নৌকো করে পদ্মায় এসেছিলুম ইলিশ মাছ ধরতে। কেষ্টদা এবিষয়ে ওস্তাদ, আমি আনাড়ি, দর্শকমাত্র। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও হাওয়ার ঝাপটা চোখে মুখে লাগে…কাপড় জামা ভিজে যায়…কেষ্টদার অফুরন্ত উৎসাহ… আমার বিস্ময় ও ভয়—যদি নৌকোটা উলটে যায়।…হালে ছিল জগাদা, চৌকশ মাঝি; তবুও বুকটা দুড়দুড় করে…দুঘণ্টার চেষ্টা ও নানা রকম কারবাই সত্ত্বেও জালে আর ইলিশ এলো না…এপাশে, ওপাশে কিন্তু একটা দুটো ধরছে— তকতকে, ঝকঝকে অঙ্গসৌষ্ঠব, যেন রূপোর পাতে মোড়ানো…আজও পদ্মানদীতে তেমনি হাওয়া বয়ে যায়, তেমনি গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, চিল ওড়ে…ছেলেরা তেমনি পদ্মা নদীতে আসে পাল তুলে, বৈঠা বেয়ে, মাছধরার উন্মাদনায়…যে দেশ আমার স্বদেশ ছিল সে দেশ আমার স্বদেশ নয়…চণ্ডীদাসের ধুয়া ধরে বলতে ইচ্ছা হয়—

আমার প্রাণের দেশ যে করেছে পর।
দিবস দুপরে যেন পোড়ে তার ঘর॥

কোন্ পাপে জন্ম হয়েছিল এদেশে ?…কোন্ অপরাধে দেশ বিদেশ হয়ে গেলো ?

দেশের কথা বলিতে বলিতে পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি আসিতে যাইতে কাটে॥

…ঐ সেই কাশবনের চড়াটা; স্টীমার ওখানেই ভিড়বে…একবার স্টীমার ধরতে এসে দেখি ছেড়ে দিয়েছে—আবার রাত্রি আটটায় স্টীমার। বেলা দশটা থেকে সমস্ত দিনটা কাটিয়েছিলুম বালুর চড়ায়। লোকালয় প্রায় তিন-চার মাইল দূরে; চড়াতে টিকিট ঘর, মালঘর, দু-চারটে দোকান, যাত্রীর সংখ্যা কম; মুড়ি মুড়কি, চিঁড়াগুড়, দই-ক্ষীর সন্দেশ-রসগোল্লা, পান, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। চায়ের দোকানও আছে, বাবুরা বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছেন। কর্ম্মস্থলে কালকে হাজিরি দেওয়া একান্ত দরকার, তাই আর বাড়ী ফিরে গেলুম না। নির্জন উদাস পরিবেশ; শীতের হাওয়ায় কাশবন দুলছে; নদীতে দু-চারটে নৌকো, অমল ধবল পাল এবং হাল বৈঠার গোঙানি…হালে বসে মাঝি তামাক খায়…শীতের দিনের রোদ মিষ্টি কিন্তু বেশীক্ষণ পোয়ানো যায় না… একান্তে একটি গাছের নীচে বসে ছিলুম; সারেঙ্গী নিয়ে একজন বৈষ্ণব সামনে এসে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞেস করেন, 'বাবু গান শুনবেন ?'…ভিখিরী গোছের বেশ !

কী আর এমন গান গাইবেন ?…বোধ হয় পয়সা চান। তবে সময়টা কাটানো চাই তো ; শোনাই যাক। বললুম, 'বেশ তো'।

: কী গান গাইবো ?

আপনার যা ভালো লাগে।

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥

*　　*　　*　　*

হাহা প্রভু নন্দসুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়

: আপনি তো বেশ ভাল গাইতে পারেন। যত্ন করে—

: হ্যাঁ বাবু। যাত্রাদলে ছিলুম এককালে। ওস্তাদের কাছে গান শিখতে হয়েছিল—বেশ মেহনত করে।

: যাত্রাদল ছাড়লেন কেন ?

: কিছুদিন ঝোঁক ছিল ; তারপর আর ভালো লাগলো না। সঙ্গটা সুবিধের নয়। একদিন ঝগড়া হলো—গান নিয়েই। আমি বলি এক গান ; অধিকারী মশায় বলেন, 'না, অন্য গান গাইতে হবে'। দিলুম ছেড়ে।

: আর একখানা গান হবে না ?

: বেশ তো। এগানটির কথা বৃন্দাবনী সারঙ্গে বাঁধা। শুনুন। দিনের বেহাগ ; উপযোগী স্থান-কাল ; ভালো গাইয়ে, ভক্তও। তবুও ভাবছিলুম, কি জানি কেমন হয়।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরত যমুনাক তীর।
প্রিয়দাম শ্রীদাম সুবল মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর ॥
বাজত ঘনঘন বেণু,
আনন্দে চরত সব ধেনু,
নূপুর রুণু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দ দাস পহুঁ নিতি নিতি
ঐছন বিহরত বিদগধ রাজে ॥

প্রাণ ঢেলে বাবাজী বৃন্দাবনী সারঙ্গটি গাইলেন। বেদনার সঙ্গে গাম্ভীর্যের, আকুতির সঙ্গে স্থৈর্যের, বৈরাগ্যের সঙ্গে মাধুর্যের অপূর্ব মিলন। স্তব্ধ হয়ে শুনছিলুম। বাবাজীর চোখে জল দেখে আমিও অভিভূত হই। চোখ মুছে বাবাজী বলেন,

ঃ বাবুর তো বেশ ভক্তি আছে।

ঃ কোথায় ভক্তি? সাধুসঙ্গের গুণ। মধুর ভাবের একখানা—

ঃ গুরুদেবের মানা আছে বাবু!

ঃ কেন?

ঃ আমি নামকীর্তনই করে থাকি। আপনার হয় তো ভালো লাগবে না, তাই মহাজনের পদ ধরেছিলুম। গুরুদেব যখন মন্ত্র দেন তখন আদেশ করেছিলেন, ষড়রিপু যতদিন পুড়ে ছাই না হয় ততদিন যেন রসকীর্তন না করি···ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে আছি, জানি না, এজীবনে তাঁর দয়া হবে কিনা।

ঃ নামকীর্তনই না হয় করুন একটু।

ঃ সেকি আপনার ভালো লাগবে?

ঃ অনেকদিন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম শুনি নি। যদি দয়া করে—

ঃ দয়ার কথা বলবেন না বাবু, অপরাধ হবে। ভগবানের নাম করবো—আপনার ভালো লাগলে আমারই পুণ্যি······

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥
জয় রাধা গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥

হরিনাম বিনেরে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু ॥
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দেবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন ॥

* * * *

অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখেন গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥

* * * *

বৃন্দাবনচন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতী।
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি ॥

* * * *

হরে কৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম।
ললিতা রাখিল নাম দূর্বাদলশ্যাম ॥

* * * *

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী নন্দের নন্দন।
নরোত্তম কহে এই নামসংকীর্তন ॥

লোক জমে গিয়েছিল। কার্তন শেষ হতেই ফরমাশ হয়, একখানা পদাবলী ধরুন। বাবাজী উত্তর দেন, নামের পর আর কিছু চলে না। শ্রোতারা সব প্রস্থান করলে জিজ্ঞেস করি,

ঃ আচ্ছা বাবাজী! নামের পর আর কিছু চলে না কেন?

ঃ আমি তো বাবু বুঝিয়ে বলতে পারবো না; তবে গুরুদেব বলতেন, যেই নাম সেই কৃষ্ণ, তার পর নাই। নামই মধু, তারপর আর উচ্ছেভাজা কেউ খায় কি?

ঃ শুধু কৃষ্ণ নাম-ই তো যথেষ্ট; এতো নাম কেন?

ঃ যার যেমন ভাব।

ঃ নরোত্তম বাবাজী তো সব নামই গেয়েছেন?

ঃ গুরুদেব বলতেন, ভাবের পর প্রেম। প্রেম এসে গেলে সব ভাবেই ভগবান্‌কে আস্বাদ করা যায়। নরোত্তম গোসাঁই প্রেমিক ছিলেন। প্রেম না আসা পর্যন্ত এক নাম নিয়ে থাকতে হয়।

ঃ আপনার গুরুদেবের কথা একটু বলুন।

অনেক কথাই বললেন, কেঁদে বুক ভাসিয়ে।…রসের সাধনা বাঙ্গালীরা খুবই করেছিল…সবই উলট-পালট হয়ে গেল…স্টীমার ঘাটে লেগেছে, নেবে পড়লুম। ঘড়িটা সঙ্গে আনি নি। ভয়ে ভয়ে এক বস্ত্রে এসেছি। বেলা প্রায় দশটা হবে হয় তো…আগেকার দোকানপাট কিছুই নেই…বালু আর তপ্ত হাওয়া…কাশবন নিশ্চিহ্ন…সব ধুধু করছে…বিরাট এক মরুভূমি!…তাড়া ছিল না কিছু, পুঁটুলীতে খাবার নিয়ে এসেছিলুম…পদ্মাতে স্নান করতে করতে গঙ্গার কথা মনে হয়… মা গঙ্গা ভারতসন্তান সকলেরই মা; পদ্মা আমাদের নিজের মা; পদ্মার জল মাতৃস্নেহের মতো পূত কিন্তু নিজস্ব…সেই স্নেহধারা থেকে আজ চিরদিনের মতো বঞ্চিত…এজল আমার নয়…অপরাধীর কুণ্ঠা নিয়ে ডুব দিই…এটাই শেষ ডুব…দু-হাতে অমৃত পান করি…জীবনে আর হবে না…হাতে জল নিয়ে চেয়ে থাকি…আবার জল নিই, মাথায় দিয়ে বলি,

মা তুই পরের দুয়ারে পাঠালি তোর ঘরের ছেলে।
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষার ঝুলি দেখতে পেলে॥

সংকল্প করে একটা শেষ ডুব দিই, তারপর উঠে পড়ি।…পরিচিত রাস্তা, কিন্তু অচেনা ঠেকে…লোকজনের চলাচল নেই বললেই হয়…যারা ছিল ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তারা আজ নিরাশ্রয়, শরণার্থী…রাস্তায় পড়ে ভাজা ভাজা হচ্ছে…বক্তৃতায়

বিশ্বপ্রেমের তুফান, আশ্বাস-বাণীতে ভূস্বর্গ লজ্জিত—বাস্তবে তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা।···দূর হয়েছে কপটবন্ধু ; নিকট, পরমশত্রু···রোদ খাঁ খাঁ করে··· একটা বটগাছের ছায়ায় বসি···কতোবার যাতায়াত করেছি এই রাস্তায়···পায়ের দাগটুকুও চোখে পড়ে না···একটা ঘুঘু ডেকে ওঠে···কী করুণ ও উদাস রব! ভৈরোঁ রাগের বিলীয়মান রেশটুকুর একটানা অনুরণন।···আগেকার দিনে ভিটেতে ঘুঘু চরানো হতো···ঘুঘু কেন? কোনো কিংবদন্তী আছে নাকি?··· ঘুঘুর ডাকে ঘরছাড়ানো সুরটুকু ঠিকই আছে···হলোও তো ঘরছাড়ানো ··তা-ই বা কি-করে বলা যায়? ঘরগুলোই যে নেই! কতোটা রাস্তা তো পেরিয়ে এলুম—মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ কোথায়?···আছে ভিটে-মাটি-উচ্ছন্ন উঁচু উঁচু ঢিবি···এককালে ঘরবাড়ী ছিল—মানুষের হাসি কান্না, ঠাকুরঘর, তুলসীমঞ্চ, শঙ্খধ্বনি·· সর্বত্র ঘুঘুর করুণ উদাস ক্রন্দন···আবার ঘরের দিকে চলি; ঘরটি আছে কিনা জানা নেই···ঘুঘুর ডাকই ভালো—এখন মানুষের আওয়াজে পাই ভয়, শঙ্কা, ত্রাস···নিকট যে এখন পর, পরম শত্রু! ঐ আমাদের বাড়ী না! কী জানি!···হয় তো···এই রাস্তায় একবার ফুটবল খেলা দেখে বাড়ী ফিরছিলুম; ঘনঘটা আগে থেকেই ছিল, হঠাৎ ঝড়-জল আরম্ভ হলো···চারদিক অন্ধকার··· রাস্তা অত্যন্ত পিছল···সামনে কিছুই দেখা যায় না···মাঠের মাঝখানে আশ্রয়ও নেই···সঙ্গে আলো নেই, টর্চ নেই···পা পিছলে পড়লুম বলে! · শুধু ঘন ঘন বিজলি চমক—দু-পা দেখে এগই; আবার অন্ধকার···আজকে ক্ষণপ্রভার আলোটুকুও নেই···দুপুরের প্রখর রোদ—midnight at noon...মাঝেমাঝে অশরীরী আর্তের তপ্ত নিঃশ্বাস; আকাশে চিলের বুকফাটা আহত রব··· midnight at noon···মধ্যাহ্নের দীপ্তি নিয়ে শ্মশানের কালিমা···এসে পড়েছি। প্রণাম!··· পুকুরটা আছে, বাড়ীঘরের চিহ্নও নেই···স্নান করবো? কিন্তু জলের যা অবস্থা—গাঢ় সবুজবর্ণের একটা সর পড়ে আছে! নাঃ, সাহস হয় না···পুকুরের এক পাশে, আমাদের ঘরের কোণের সেই হিজলগাছটি এখনো আছে; আগের দিনের মতো লালফুলের চাদর বিছানো রয়েছে···শুয়ে পড়লুম···কতো দুপুরের শয্যা, কতো স্বপনের নীড়! শ্রান্ত ছিলুম, গা এলিয়ে দিতেই বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়লুম। উঠলুম প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। এমন ঘুম অনেকদিন ঘুমই নি। কলকাতার ছেদহীন কোলাহলে মানুষ ঘুময় ঠিকই, কিন্তু ঘুমটা হয় আধ-জাগরণ অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে টের পাই না। আজ যেন সুষুপ্তির অতলজলে ডুবেছিলুম, কেউ কিছু ছিনিয়ে নিলে বা গলাটা এক কোপে কেটে ফেললে হয়তো জানতেও

পারতুম না···গাছটার বয়স হয়েছে ; ছোটবেলা থেকে এমনিই দেখে আসছি··· ঐ ডালটায় বসে ভাবতুম, কানু বোধহয় বৃন্দাবনের ঘনশ্যাম কোনো গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বাঁশি বাজান···হয়তো একদিন এই ডালটায়ও এসে বসতে পারেন···আকাশে সেদিন কালো মেঘ ছিল ; এই ডালটায় বসে অনেকক্ষণ ডাকলুম—কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ হে···হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ···দেখা দিলেন না। ঝড় এসে গেলো ; চোখ মুছে নেবে পড়লুম···

নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, মহিমা অপার॥

কৃষ্ণ নামের অপার মহিমা ? তার ফলেই কি এ দশা হলো ? মহিমা যে নেই তা বলতে পারি না। কিছু দিন আগে যাদবপুর 'জয় হিন্দ টি স্টল্'-এর এক কোণে বসে চা খাচ্ছি ; মাঝখানটায় একটা গোল টেবিলের চারদিকে যুবকদের চা-সহযোগে তর্ক চলছে······নেতাজীর ভক্ত বলছেন—

ঃ যতো ছিল নাড়াবুনে হলো তারা কীর্তনীয়া, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ে করতাল।

একজন প্রশ্ন করেন, 'তার মানে ?'

ঃ মানে অতি স্পষ্ট। নেতাজী নেই বলেই হাড়হাবাতেরা করে খাচ্ছে। যোদন 'জয় হিন্দ' বলে এসে দাঁড়াবেন তিনি, থেমে যাবে সব ছুঁচোর কীর্তন ; সেলাম ঠুকে সব বলব—জয় হিন্দ। নেহরুজীর ভক্ত উত্তর দেন—

ঃ ভয়ে সব আঁতকে উঠবে ঠিকই, মানে ভূতের ভয়ে।

ঃ সবজান্তা বাক্যবাগীশের পদলেহকগণ এমনিই বলে থাকে বটে। রাখবে না কোনো খবর, কিন্তু হলপ করে বলবে—বেঁচে নেই। যতসব ইয়ে—

ঃ বেঁচে আছেন তো আসেন না কেন ?

ঃ সময় হলেই আসবেন।

ঃ আসলেই বা কী ? Spent force দিয়ে কাজ হয় না।

ঃ যতো কাজ হয় নেহরুজীকে দিয়ে ?

ঃ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী ?

ঃ আহা ! কী কাজটাই না করেছেন ?

একজন টিপ্পনী কাটেন—

যাহা তুমি করিয়াছ সব ভুল করি।
যাহা তব অবদান শুধু গুণাগারি॥

ঃ কী কাজটা করেন নি, বলুন। ভারতের এক সন্ধিক্ষণে দেশের ভার ঘাড়ে নিয়েছেন ; দেশকে এক করে রেখেছেন, শতধা ছিন্ন হওয়ার সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন ; জীবনযাত্রার মান উঁচু করেছেন ; আমাদের চিরাগত অন্ধ কুসংস্কার তাড়িয়েছেন ; বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়েছেন···নেহরুজী যদি এখনও সরে দাঁড়ান—

ঃ বাঁচি। অফুরন্ত বক্তৃতা থেকে বাঁচি ; বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ থেকে বাঁচি ; আর আপনাদের জহরকোট ও চোস্ত পায়জামা থেকে বাঁচি। সর্বনাশ থেকে বাঁচান নি মশায়, সর্বনাশ ডেকে এনেছেন ; ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন ; লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে ছন্নছাড়া ভিখিরী করে দিয়েছেন ; আর **U.N.O.** র প্যাঁচে পড়ে কাশ্মীরকে খোয়াতে বসেছেন। আপনি স্পাই নন তো ?

ঃ আপনি ক্ষেপা কুকুর নন তো ?

'Shut up' ; **'Shut up'** ; 'তবেরে,' 'তবেরে'······তারপর আস্তিন গুটিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কেউ থামাবার চেষ্টা করে, কেউ উসকানি দেয় ; দু-একটা পেয়ালা ভাঙ্গে ; দোকানী চিৎকার করে। অর্থাৎ বেশ গজকচ্ছপের লড়াইর মতো অবস্থা····· হঠাৎ কানে আসে—

কই কৃষ্ণ এলো কুঞ্জে প্রাণসই।
দেরে, কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই ॥

মৃদঙ্গের ধ্বনি, মহাজনের পদ, কীর্তনের প্রাণ-মাতানো সুর—রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই।

রাস্তা দিয়ে গেয়ে যাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে শোনে সবাই। যুযুধান দৈত্যগুলো ঘুমিয়ে পড়ে ; সকলেরই চোখ ছলছল, মন বিরহকাতর ; সকলের অন্তশ্চেতনায় বিরহিণী রাধা কেঁদে ওঠে 'কই কৃষ্ণ এলো কুঞ্জে প্রাণ সই'······বাঙ্গালীর দৈবী সম্পদ্··· কতো কাল ধরে কেঁদেছি 'কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে'···

কিন্তু অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।···শ্রীকৃষ্ণও ভুল হয়ে যায়···তিনিও ভুলেছেন আমাদের···অপরাহ্লের রোদ এসে মুখে পড়ে। উঠে উত্তরের বাগানের দিকে যাই···কতো গাছই না ছিল—আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, কুল, তেঁতুল, চালতে, গাব, বাঁশবন, বেতবন, কাঁটা গাছ···বেশ অন্ধকার থাকতো। একবার বাগানের এক নিভৃত কোণে আমরা পাঁচ-সাতজন চক্রে বসে হরিকে ডাকছিলুম ; চোখ বুজে, মনে মনে। খানিকক্ষণ পর কেষ্টদা চেঁচিয়ে

ওঠে—পেয়েছি, পেয়েছি। খুব ভয় হলো। হরিকে ডাকা এক জিনিস ; কিন্তু চাক্ষুষ দেখা! ভয়ে যদি অজ্ঞান হয়ে যাই! ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখি, কিছুই নেই, শুধু আবছায়া অন্ধকার। কেষ্টদা বলে, 'আমার সামনে এসে দাঁড়ালো ; হাত বাড়িয়ে যেই চোখ খুললুম, দেখি নেই।' জগাদা গালাগালি দেয়, 'তুই একটা আস্তো গাধা! চুপিচুপি বললি না কেন? আমরা সবাই দেখে নিতুম'। জেঠামশায় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; আমাদের গলা পেয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দেন, "কে রে ওখানে?" হাওয়ার মতো সব মিলিয়ে গেলুম। কেষ্টদার কথা যে বিশ্বাস করেছিলুম তা নয়, তবে মনের কোণে একটু 'কি জানি, হয়-তো-বা' ছিল। আজ হাসি পায়। বাড়ীর দক্ষিণধারে একটি কদমগাছ ছিল ; ফুলের কী সজ্জা! ···কেষ্টদা নাকি এই গাছে শ্রীকৃষ্ণকে পা ঝুলিয়ে বেণু বাজাতে দেখেছে। জানতুম ধাপ্পাবাজি ; তবুও জ্যোৎস্না রাতে গাছের আড়ালে চুপিচুপি দাঁড়িয়ে থাকতুম—দেখি নি কিছু। কদমগাছটি আর নেই। দক্ষিণ-পূব কোণে কালীর কাকীমাদের ঘর, যে ঘরে কাকী ফাঁস দিয়ে জিভ বের করে ঝুলছিল ; ঘরের চিহ্নও নেই··· বাগান আর চেনা যায় না ; অনেক গাছই নেই, 'কোনো কোনো গাছে মানষের মাথা'···অর্থাৎ নারকেল গাছ ; একটিও নেই। বাগানে ঢুকতেই উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি জাম গাছ ; ডাল ভেঙ্গে একবার পড়ে গিয়েছিলুম ; গাছটি নেই। ঈশাণ কোণের তেঁতুলগাছটি আছে। কেষ্টদার মতে ওটি ভূতের বড় আড্ডা। একবার কালীবাড়ীর পূজারীঠাকুর কালীপূজো শেষ করে পাঁঠার মাথাটি নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। তেঁতুল গাছের পাশ দিয়ে রাস্তা ; গভীর রাত, অমাবস্যা ; ঝড়ো হাওয়া। হঠাৎ দেখেন রাস্তা নেই···লণ্ঠনটা দপ্‌দপ্‌ করে নিবে গেলো···বিরাট এক অন্ধকার পূজারীঠাকুরকে পিছনে ঠেলছে···পাঁঠার মাথাটা দশমণ ভারি, দুহাত দিয়ে ধরে রাখতে পারছেন না ; গাছ থেকে গোঁগোঁ শব্দ···কিন্তু পূজারীঠাকুরের সঙ্গে ছিল মৃত্যুঞ্জয় কবচ ; 'কালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহারুদ্র দেবতা' বলে স্তোত্র পাঠ করতেই আলোটা জ্বলে উঠলো ; রাস্তা দেখা যাচ্ছে ; মড়মড় করে একটা ডাল ভেঙ্গে পড়ে। পূজারীঠাকুর পাঁঠার মাথাটা ফেলে দিয়ে বাড়ী যান·· কেষ্টদার নোটবুকে মৃত্যুঞ্জয় কবচের মাহাত্ম্য লেখা ছিল—

ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
দূরাদেব পলায়ন্তে দ্বীপাদ্ দ্বীপান্তরং ধ্রুবম্ ॥

আমার এক কাকাবাবু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পণ্ডিত ছিলেন। জন্মভূমি সম্বন্ধে

তাঁর কৃত একটি স্তোত্রের ছন্দঃপতন ও ব্যাকরণ অশুদ্ধি থাকা বিচিত্র নয়। কিছু কিছু মনে পড়ে—

এষা পল্লী ভবেৎ কাশী দীর্ঘিকা পুষ্করস্তীর্থঃ।
পদ্মা বৈ অলকানন্দা, বটস্ত্বক্ষয় এব চ ॥
কদম্বতরুশাখায়াম্ আসীনো নন্দনন্দনঃ।
গোচারণভূমৌ চাপি খেলতি সখাভিঃ সহ ॥
উত্তরস্যামস্তি বনং বৃক্ষরাজিসমাবৃতম্।
তিন্তিড়ীশীর্ষভাগে তু বিরাজতে ভূতনাথঃ ॥

* * *

অস্মিংস্তীর্থে যস্য জন্ম মহাপুণ্যফলহেতৌ।
ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে ॥

তাই সব দেশ ছাড়া!…বড় গাবগাছটা এখনো আছে…একবার লুকোচুরি খেলায় এই গাছটির মগডালে লুকিয়েছিলুম…অনেকক্ষণ বসে আছি…সন্ধ্যা হয়ে আসে…আমার কথা কি ভুলে গেলো?…কেউ তো আসছে না খোঁজে …আকাশটা কী উঁচু! শেষ নেই! কতদূর চলে গেছে!…আরও উঁচুতে? নিবে যায় হঠাৎ আকাশটা…বুকটা দুড়দুড় করে…কোনো প্রকারে গাছ থেকে নাবি…ঐ মাটি…গম্ভীর অজানা ভয়ের উদাত্ত রব—হুতোম পেঁচার ডাক—অন্তহীন গহ্বরের সীমাহীন অন্ধকার…ভয়ে হয়তো গাছ থেকে পড়েই যেতুম, লোক জন দেখা যাচ্ছিল তাই রক্ষে…বুকের ঢিবঢিব আওয়াজ কতোক্ষণ যে ছিল!…চিঁহিঁচিঁ—একটা চিল উড়ে যায়; উদাস সুর, কিন্তু ভাব-লঘু—হাওয়ায় গা এলিয়ে চলার অলস ছন্দ…ঘুঘুর ডাকের করুণ গাম্ভীর্য নেই… এখানটায় আমাদের ঘর ছিল; বসলুম। রামপ্রসাদ চেয়েছিলেন, 'মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা, পাই যেন তায় খড় যোগাতে'।…আমরা চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে…চালা নেই, খড় নেই, খুঁটি নেই, আছে মাটির ঢিবি। মধু বৈরাগী কার্ত্তিকমাসে প্রভাতী গেয়ে টহল দিতো…

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে ॥

তন্দ্রালস মনে কী এক অপূর্ব সংবেদন জাগতো…কোথায় মধু বৈরাগী ? কোথায় শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি…মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু…পুকুরধারের গাছটি ! 'পাখী ঐ যে গাহিল গাছে' ! ভোলাদা আর আমি ঐ ডালটায় বসতুম …জলের দিকে উবু হ'য়ে বারোঁয়া রাগিণীর পাখী-ও-মানুষের প্রতীক্ষায় গাছটা এখনো ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে··কান পেতে শুনছে সে মানুষ আসে কিনা, সে পাখী গায় কিনা…ডন্ (Dawn) কুকুরের করুণ মুখখানা ভেসে ওঠে ; সখ করে সহর থেকে এনেছিলুম—বিলিতি কুকুর, নাম রেখেছিলুম Dawn ; নিজে মাছ না খেয়ে ডনকে খাওয়াতুম…বড়ই জ্বালাতন আরম্ভ করলো, বিশেষতঃ কাকীমা-জেঠাইমাদের দোরগোড়ায় ; তা নিয়ে রোজ ঝগড়া-বিবাদ। বাবা ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক ; অশান্তি দেখে একদিন বলেন, 'কালকের ভিতর কুকুরটাকে বিদেয় না করলে আমি জলগ্রহণ করবো না'…ডনকে নিয়ে মাসীমাদের গাঁয়ের দিকে চললুম…ডন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না ; ঢিল মারি, তবুও আসে…পাঁচ-ছ মাইল পর একটা খাল। খেয়া নৌকোতে আমি পেরিয়ে গেলুম…ওপার থেকে ডন কেঁউ কেঁউ করতে লাগলো…কতো দিন যে ওর জন্য কেঁদেছি, কতো বার স্বপ্নে দেখেছি ওর কাতর মুখ, ছলছল চোখ, মূক বেদনা…বৈতরণীর ওপারে হয়তো ডন আমার প্রতীক্ষায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে…যাঁদের জন্য ডনকে তাড়ালুম আজ তাঁরা কেউ নেই…সকলেই বিতাড়িত…হারাধনের একটি ছেলেও বেঁচে নেই·· যদি থাকে কেউ বেঁচে সে হয়তো মনের দুঃখে দেশান্তরে গিয়ে কাঁদছে ভেউ-ভেউ…চার দিকেই কাঁটা গাছ…একটা কাঁটাগাছে তারার মতো লাল ফুল ফুটে আছে·· ভিটেমাটি উচ্ছন্ন…ঘুঘু চরানো হয়েছে…আমাদের ঠাকুর ঘরের ভিটেতে হাল চালানো হয়েছিল বোধ হয় ; পাশের তুলসীমঞ্চে বিছুটির বন ··কোটর পেঁচা ডেকে ওঠে…অলক্ষুণে ডাক, কিন্তু অনাগতের ইঙ্গিতে পূর্ণ ; মনে হয় অন্ধকার কেটে এসেছে। অরুণোদয়ের মাঙ্গলিক বাজবে এবার—কিন্তু বর্তমান পরিবেশে তার কোনো মানে হয় না। তুলসীমঞ্চের উদ্দেশে প্রণাম করি ·· দিদিমা সেঁজুতি দিয়ে ঠাকুরকে শোয়াতেন, তারপর ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে জপ করতেন… ঠাকুরঘর নেই, তুলসীমঞ্চ নেই, বাতি নেই, বাতি দেওয়ার লোক নেই …আছে কাঁটা গাছ ; বিছুটি বন।…একটি একটি কয়ে সব বাতিই নিবে গেলো…কি নিয়ে আর বেঁচে থাকি ? অন্তহীন তমিস্রা ? ও নিয়ে বাঁচা যায় ?…কী দুঃখ পেয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন—সর্বং দুঃখং দুঃখং, সর্বং

শূন্যং শূন্যম্ ?…হে তথাগত! সব বাতিই তো নিবিয়ে দিয়েছ! শূন্যের বেদনাটুকু আর রেখে দিয়েছ কেন? রিক্ত করেছ, পূর্ণ করো না কেন? দগ্ধ নিঃশ্বাসেই কি জীবনটা ছাই হয়ে যাবে?…অতন্দ্রিত জ্যোতির স্নিগ্ধতায় ঐ ওঠে সন্ধ্যাতারা! জীবনের কালরাত্রি ভেদ করে তুমি কি তেমনি জ্বলে উঠবে না? করুণার পরশ দিয়ে নিয়ে যাবে না সেই "অক্ষিত অমৃতলোকে"? পৌঁছিয়ে দেবে না 'যত্র জ্যোতির্ অজস্রং, যস্মিন্ লোকে স্বর্ হিতম্'? হে অমিতাভ!

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ
মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্
তত্র মাম্ অমৃতং কৃধী॥

তৃতীয় অধ্যায়

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

(ক)

মাষ্টার মশায়

(ক)

মাষ্টার মশায়

॥ ১ ॥

বিকেল বেলা; কলেজ-স্কোয়ারের এক কোণে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি— আকাশ হচ্ছে শ্মশান, পাতাল হচ্ছে নরক; জন্মভূমি শ্মশান, কর্মভূমি নরক। শ্মশান ও নরক; নরক ও শ্মশান—এমনি শ্মশান যে চিতা জালাবার অধিকার-টুকুও নেই। আছি এবং মরবো এই ভারতের মহাদানবের নরককুণ্ডে…মুক্তির সব রাস্তাই বন্ধ। এককালে কতো স্বপ্নই না দেখেছি এখানে বসে…পুণ্যতীর্থ এই পথ…কতো যুবক কতো ভাব ও চিন্তার আবেশে, কতো মহান্ আদর্শের অনুপ্রেরণায়, এই রাস্তা দিয়ে চলে গেছে·· দূর দূরান্তরে গিয়ে স্বপ্নকে রূপ দিয়েছে…প্রাণের আহুতি দিয়েছে কর্মে দেবায়…কোন্ অজানার করাল আহ্বানে 'বিদায় দেহ ভাই' বলে আকাশসমুদ্রে পাল তুলেছে…আকাশ হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে দানবের তাণ্ডবনৃত্যে! কালীসাধক মুকুন্দদাস গেয়েছিলেন—

আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড—রুদ্র, দীপ্ত, মূর্তিমান্!

তন্ময় হয়ে শুনেছি, জপের মালায় দিন গুণেছি…দণ্ড এলো কিন্তু আমাদেরই উপর অভিশাপ হয়ে।… শকুনির চক্রে পাশা উলটে গেলো…

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে,
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

মহাভারতের আশ্বাসবাক্য; অটুট বিশ্বাস ছিল। শুধুই স্তোকবাক্য! অনৃতমেব জয়তে, ন সত্যম্!…কোথায় ধর্মের জয়?…শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বা কতটুকু ধর্ম বাঁচাতে পেরেছিলেন?…মহাভারতের যুদ্ধ থামাতে পারেন নি; ক্ষাত্রশক্তির বিপর্যয়ের পর এলো অরাজকতা, অনাচার, স্বৈরাচার, অধর্মের ক্রূর ব্যাপকতা…

গাণ্ডীবধারী অর্জুন মেয়েদের রক্ষা করতে পারেন নি দস্যুর হাত থেকে·· পাপের প্রকোপে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেলো···পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানে গেলেন···ভারতব্যাপী ঘোর অন্ধকার ঃ অধর্ম একচ্ছত্র সম্রাট্···সত্যমেব জয়তে? বাজে কথা···শ্মশান ও নরক, নরক ও শ্মশান···দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ···শকুনিস্তস্য শাখা···কোনো কিছুরই মানে হয় না—যেমন স্বপ্ন! কতো কিছু দেখি, কী তার অর্থ?···সেদিন স্বপ্ন দেখছিলুম কোন্ এক তীর্থে যাচ্ছি; আমার আগে একজন যাত্রী—দোহারা গড়ন, ফর্সা রং, মুখ দেখা যাচ্ছে না; চেনা চেনা মনে হয়; এগবার চেষ্টা করি, ধরতে পারি না; পা চালাই, কিন্তু পিছনেই পড়ে থাকি···কোথায় দেখেছি এঁকে? পূর্বজন্মের স্মৃতি?···কে জানে?···কোনো কিছুরই মানে হয় না···পুণ্যতীর্থ ভারত, কিন্তু কী তার ইতিহাস? চিরটা কাল মারই খেলো···ভারত এক বিরাট্ রহস্য-স্ফিংক্স্ (Sphinx) এর অন্তহীন প্রশ্ন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের চিরন্তন জিজ্ঞাসা; যিনি উত্তর জেনেছেন তিনিই অমৃত; আমাদের ভাগ্যে হাঁড়িকাঠ···পাশে এক ভদ্রলোক এসে বসলেন···পুকুরের ধারে একটা 'গোলাপ ফুল ফুটে আছে···ফুলের মতো সুন্দর এ জগতে কিছুই নেই···জাতকের একটি গল্প মনে পড়ে। সারিপুত্র একজন শ্রমণকে দেহের কদর্যতা ও নশ্বরতা সম্বন্ধে ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন; ধ্যান বসছে না শুনে বুদ্ধদেবের কাছে তাঁকে নিয়ে এলেন। বুদ্ধদেব বললেন, 'পূর্বজন্মে ইনি স্বর্ণকার ছিলেন, কারুকার্যে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল,···কদর্যতার ধ্যান এঁর বসবে না। সামনের ঐ জলাশয়ে যে পদ্মফুল ফুটে আছে তার ধ্যান করুন···একটার পর একটা পাপড়ি খসে পড়বে···সৌন্দর্য মিলিয়ে যাবে অন্তহীন মহাশূন্যে···কোথায় মহাশূন্য? কিন্তু ফুলটি কি সুন্দর! নীচে সবুজ ঘাস; মালী জল ঢেলে স্নান করিয়ে গেছে; হাওয়াতে ঘাসগুলোর তৃপ্ত শিহরণ···ছোট শিশুর মতো সজীব, প্রাণবন্ত···ওখানটায় শুয়ে গোলাপফুলটির দিকে তাকিয়ে জীবনটা মহাশূন্যে লয় করে দিতে পারলে বেঁচে যেতুম···অসম্ভব···মরুভূমি··· বালু ও কাঁটা গাছ···বালুতে চাপা কাঁটাগাছ···কিন্তু ঘাসগুলোর কি অপূর্ব সজীবতা! ফুলটি এক অপার্থিব আনন্দে দোল খাচ্ছে! এই নরকে?···একি সত্যি?

ঃ দেবলবাবু না! ভালো আছেন তো?

পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকাই। মাষ্টার মশায়! রাঁচীতে কিছু দিনের পরিচয়েই যিনি পরমাত্মীয় হয়েছিলেন ··এখানে মাষ্টার মশায়! গোলাপফুলটির মতো লাল টকটকে মুখখানা—কে যেন আবীর ঢেলে দিয়েছে!···And the

angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush and he looked, and behold, the bush burned with fire···আনন্দের দীপ্তিতে মুখখানা ফুলের মতো বিকশিত, আগুনের মতো লাল! এখানে? এই অপার্থিব আলো! একি সম্ভব?

: চিনতে পারলেন না?

অভিভূতের মতো চেয়ে আছি···অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত···স্বপ্নচর সেই যাত্রী? যাঁকে ধরতে গিয়ে ধরতে পারি নি?···প্রণাম করলুম। তারপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলুম! অনেক কালের চাপা কান্না—থামাতে পারি না···মাষ্টার মশায় চুপ করে বসে ছিলেন···কিছু বললে হয়তো বেসামাল হয়ে পড়তুম···মনটা বেশ হালকা হয়ে গেছে···সহজভাবে প্রশ্ন করি 'কবে এলেন?'

: মাস খানেক হলো।

: রাঁচীর খবর কি?

: অনেক কাল রাঁচী-ছাড়া। কিছুদিন ছিলুম বৃন্দাবনে; তারপর কাশী, পুরুলিয়া, হাজারিবাগ, ধানবাদ, পাটনা, গয়া···এখন কিছুদিন এখানেই থাকবো।

: কোথায় আছেন?

: বেলেঘাটা। আসবেন; আলাপ-সালাপ হবে।

অনেক কথা হলো; রাঁচীর কথাই বেশী—মুরাবাদির মাঠ, গোঁধা পাহাড়, বড়কা তলাও, রাঁচী পাহাড়, সুবর্ণরেখা নদী, ফুলবাবার আশ্রম, হর্মু নদীর ধার, চুটিয়ার বাবাজী মশায়···নিজের কথাও বললেন। কোনো বন্ধনই নেই এখন; ভাইপোরা মানুষ হয়েছে, তাদের কাছে এখানে-ওখানে থাকেন। বর্তমানে বেলেঘাটায় দিদির বাড়ীতে আছেন; থাকবেন কিছুদিন। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে পারলুম না—কথা যোগাচ্ছিল না; মনটাও ছিল থমথমে। চুটিয়ার বাবাজী মশায়ের সম্বন্ধে, মাষ্টার মশায় বলেছিলেন, 'ওঁর স্মরণে গঙ্গাস্নানের ফল হয়'। আমারও মনে হলো গঙ্গাস্নান করে পূত দেহে, স্নিগ্ধ চিত্তে বাড়ী ফিরলুম।

॥ ২ ॥

আমার সব কথা শুনে মাষ্টার মশায় বলেন,

: ভালোই তো হয়েছে।

: ভালো?

: মোহ কাটানো কি কম তপস্যা ? যেখানে যেখানে সুখের বন্ধন ছিল ভগবান্ সেগুলো কেটে দিয়েছেন। ভালো নয় ?

: কিন্তু দুঃখ ?

: দুঃখ মানুষের আসে ; কিন্তু দুঃখবোধ অতি বিরল—পোড়াভাত ছেঁড়া-কাঁথা সত্ত্বেও আসে না। দুঃখবোধ এলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে। সর্বং দুঃখং দুঃখং—হাড়ে হাড়ে একথা না বুঝলে সাধন ভজন সার্থক হয় না ; সাধুরা এমনি বলেন।

: কিন্তু কেন এই দুঃখ ?

: বুদ্ধদেব বলেন : 'কেন' দিয়ে কী কাজ ? অসুখ হলে ঔষধ সেবনই বিধি। সুতরাং রোগ হলো কেন এই প্রশ্ন না করে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত নয় ?

: তা না হয় মানলুম ; ওষুধও না হয় খেলুম, কিন্তু রোগ হয় কেন, এই প্রশ্নটা থেকে যায় না ? ভগবানের রাজ্যে এই দুঃখ কেন ? Why at all ? দুর্ভিক্ষ দেখলুম ; উদ্বাস্তু দেখছি ; নীতি নেই, সমবেদনা নেই, আদর্শ নেই···ভারতের জীবন যেন বিরাট এক অভিশাপ ! Why at all—এই মৌলিক প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে না ?

বলতে বলতে কাতর হয়ে পড়ি। আমার কথা শুনে মাষ্টার মশায় কোথায় তলিয়ে গেলেন ! অদ্ভুত মুখের চেহারা ! সেদিনকার গোলাপফুলটির মতো আনন্দোজ্জ্বল নয়—ছাইএর মতো ফেকাসে। জীবন প্রদীপ যেন নিবে গিয়েছে, দেহের শুকনো খোলটা পড়ে আছে ; অন্তরাত্মা নির্বাণের মহাশূন্যে লীন···সহজ অবস্থায় ফিরে এসে বলেন,

: প্রশ্নটা থেকে যায় ঠিকই।

: উত্তর ?

: বৈদান্তিক সাধুরা বলেন—জগৎটা মায়িক, স্বপ্নবৎ ; এছাড়া এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। মানে, আমার জানা নেই।

: রামপ্রসাদ অনুযোগ করেছিলেন,

কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা)
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ?

স্বপ্নবৎ মেনে নিলেও সুখস্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্নের পার্থক্য কেন ?

: পার্থক্য দেখে কে ?

ঃ আমিই দেখি।

ঃ তা হলে গোটাটাই আপনার স্বপ্ন নয়?

ঃ অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন?

ঃ তা তো বটেই। নইলে স্বপ্ন ভাঙ্গে না।

ঃ দুঃস্বপ্নের কারণ কি?

ঃ অজ্ঞান।

ঃ অজ্ঞানের কারণ?

ঃ অজ্ঞানের কারণ নেই।

ঃ নেই কেন?

ঃ অনবস্থা দোষ আসে—কারণের কারণ, তস্য কারণ, তস্য কারণ, এমনভাবে কোনোদিনই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ, কারণ সাধারণতঃ দেশ-কাল-সাপেক্ষ; দেশকালের কারণ অজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে না। এজন্যই অজ্ঞানকে অনাদি বলা হয়।

ঃ যার আদি নেই তার তো অন্তও নেই?

ঃ অজ্ঞান অনাদি হলেও সান্ত। জ্ঞান দ্বারা যে অজ্ঞানের নাশ হয় তা তো সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর।

ঃ দৃষ্টান্ত?

ঃ জল সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞান কবে সুরু হয়েছিল কেউ জানে না; মানে, অনাদি। রসায়নশাস্ত্রের অধ্যয়ন দ্বারা যখন সেই অজ্ঞান নষ্ট হয় তখন তাকে সান্তই বলতে হয়। শিক্ষা, দীক্ষা, মানব সভ্যতা, ইত্যাদির মূল সূত্রই তো এই যে অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য।

ঃ একটা খটকা থেকে যায়। স্বপ্ন বলে সবটা উড়িয়ে দেওয়া escapism নয় তো? মায়াবাদ সম্বন্ধে এই শঙ্কা অনেকে তুলে থাকেন।

ঃ একজন মহাত্মাকে আমি এই প্রশ্ন করেছিলুম। তিনি জবাব দিলেন, এটা দার্শনিক শঙ্কা নয়। পরমাত্মার সত্তা ছাড়া যখন দ্বিতীয় সত্তাই নেই তখন কে পালাচ্ছে, কোথা থেকে পালাচ্ছে, কেন পালাচ্ছে, এসব অবান্তর প্রশ্ন।

ঃ জবাবটা হয় তো ঠিকই, কিন্তু খটকা থেকে যায়।

ঃ কেন?

ঃ ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো কিনা জানি না। হিস্ট্রি অব ইওরোপিয়ন ফিলসফি (History of European Philosophy)-তে রাসেল সাহেব (Bertrand

Russell) বলেছেন, হিউম্ (Hume)-এর মতবাদ অকাট্য (irrefutable) হলেও মন তাতে সায় দেয় না (unconvincing)। আমার সংশয়টা ও-জাতীয়···জীবনটা যেন ন্যায়ের একটা সিদ্ধান্তমাত্র ; ফলে বুদ্ধিচাতুর্যের অন্তরালে যে প্রাণশক্তি কাজ করে সে সাড়া দেয় না। হয়তো এজন্যই বেদান্তবাগীশ হই, কিন্তু তত্ত্ব নিশ্চয় করতে পারি না। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' ; 'বাসনাই বন্ধন, নির্বাসনতাই মুক্তি', 'হরের্নামৈব কেবলম্' ;—ইত্যাদি তত্ত্ব হিসাবে হয়তো নির্দোষ, কিন্তু জীবনের দিক থেকে প্রান্ত-স্পর্শী, প্রাণ-স্পর্শী নয়। রাসেল সাহেব সম্বন্ধে যেমন বলা হয় মানুষ তাঁর কাছে ক, খ, গ···সরল করতে তিনি ওস্তাদ ; ফল—over-simplification ; তিনি ফরমুলা তৈরী করেন, কিন্তু মানুষ আড়ালে পড়ে যায় অজ্ঞাত সংখ্যার ইন্দ্রজালে···

মাষ্টার মশায় কোনো উত্তরই করেন না। মুখ চোখ পাথরের মতো স্থির।···ঠিক ভাবে হয় তো বলতে পারি নি···হয় তো বেলাভূমিকে সাগর ও সাগরকে বেলাভূমি ভাবছি···ব্যক্তচেতনায় কতটুকুই বা ধরা যায় ?···অন্তশ্চেতনা—কূল কিনারা পাই না, অসীম অনন্ত ; সাগর ?···কিন্তু কারবার তো আমাদের ব্যক্ত নামরূপ নিয়েই···নামরূপই যদি ক, খ, গ হয় ?···তা হলেও নামরূপ যিনি অভিব্যক্ত করছেন তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ থাকবে নিশ্চয় !...মাষ্টার মশায় হয়তো বলবেন, জীবনটাই একটা ফরমুলা···আবার জিজ্ঞেস করি, আমার বক্তব্য হয় তো—

: ঠিকই বলেছেন। জীবনধর্মকে বাদ দিয়ে সাধনা হয় না, ফরমুলা কষে তত্ত্বে পৌঁছনো যায় না।

: জীবনধর্ম ও মায়াবাদ—এর সামঞ্জস্য হয় কী করে ?

: জীবনধর্ম কী চায় ?

: ভোগ, satisfaction, তৃপ্তি।

: কোনো ভোগে চিত্তের উপশান্তি হয় কি ?

: তা হয় না ; এবং হয় না বলেই নিত্যনূতন ভোগক্ষেত্র সৃষ্টি করি।

: পূর্ব পূর্ব ভোগে তা হলে বৈরাগ্য আসে স্বীকার করতে হয় ?

: তা আসে।

: অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু ভোগ উৎপাদন করেই চরিতার্থ হয় ?

: হাঁ, তাই বটে।

: ভোগের পর ভোগ্যবস্তু কি করেন ?

: ফেলে দিই—উচ্ছিষ্টবৎ।

: জগৎটা যদি তেমনি উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়?

: অভিনব ভোগক্ষেত্র সৃষ্টি করবো।

: কি ভাবে?

: তা—নূতন ভোগক্ষেত্র—কি ভাবে—ঠিক বুঝতে পারছি না।

: আমাদের শাস্ত্রে চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ধ্রুবলোক, ইত্যাদির কল্পনা আছে।

: সে তো কল্পনামাত্র। অথবা জগতেরই নামান্তর; নূতন কিছু নয়।

: ভূ-ভুব-স্ব-মহ-জন-তপ-সত্য এই সপ্তলোকও আছে।

: এগুলো কল্পনা নয়?

: অনুভবের দিক থেকে বাস্তবও বলতে হয়। শিশু-বালক-কিশোর-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ-মুমূর্ষু একই জগৎ দেখে, কিন্তু অনুভব করে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ। এগুলো জীবের নৈসর্গিক ভোগক্ষেত্র। যদি এগুলোতে বৈরাগ্য আসে?

: অচল অবস্থা, মনে হচ্ছে।

: স্বপ্নবৎ হয়ে যদি জগৎ নূতন ভোগ সৃষ্টি করে?

: সে একটা দিক বটে, কিন্তু—

: কিন্তু কি?

: তা হলে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, দ্রষ্টাভাব, সবটাই তো ভোগ?

: তাতে আর সন্দেহ কি? এজন্যই সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি ভোগাপবর্গদায়িনী।

: এ ভোগও তো উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে?

: যাবেই তো।

: ভোগ শেষ হলে?

: থাকবেন ভোক্তা নিজের স্বরূপে।

: প্রকৃতি থাকবে না?

: কী প্রয়োজনে? ভোগ এবং অপবর্গ দেওয়ার পর প্রকৃতির পারার্থ্য শেষ হয়ে যায়। কোন্ প্রয়োজনে আর থাকবে সে?

: সবটাই তা হলে ভোগ?

: দার্শনিকরা তাই বলেন। তবে প্রকারভেদ আছে।

: ভোগ এবং কুভোগ নিয়ে?

: তা নয়। বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, সবটাই ভোগ। অথবা সবটাই বাঞ্ছিত; ত্যাগে অবাঞ্ছিত হয়।

: প্রকারভেদ তা হলে কি নিয়ে ?

: নাট্যমঞ্চে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের একরকম ভোগ—সাধারণ জীবের যেমনি। অভিনয়ের দ্রষ্টা যাঁরা তাঁদের ভোগ অন্যবিধ—ব্রহ্মজ্ঞদের যেমনি। যিনি অধিনায়ক বা স্টেজ ম্যানেজার (Stage Manager) তাঁর ভোগকে ভোগ না বলে লীলাও বলা যায়—যেমন ঈশ্বরের। ঈশ্বর লীলাময়, ব্রহ্মজ্ঞ লীলাদর্শী কেবল সাক্ষী, অন্য জীব লীলার ক্রীড়নক। অভিনয় শেষ হলে সকলেরই স্বরূপে স্থিতি।

: জীবের এই অসহায় অবস্থা কেন ?

: সব অবস্থাই জীবের—যখন যে অবস্থায় থাকবার অভিরুচি হয় তখন তৎতৎ ভোগ দেখা দেয়।

: এ ভাবে দেখলে জীবনের সার্থকতা হয়তো ধরা যায়…ভোগের সঙ্গেই তা হলে বৈরাগ্য লুকিয়ে থাকে ?

: ভোগাপবর্গ সূত্রটির তাই অর্থ। ভোগ হলো স্থিতিশীল বা static ; বৈরাগ্য হলো গতিশীল বা dynamic ; চিত্ত এক ভোগ থেকে অন্য ভোগে যেতেই পারতো না যদি প্রতি ভোগ বৈরাগ্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হতো।

: অর্থাৎ প্রতিক্ষণ আমরা মরি বলেই বেঁচে আছি ?

: চিত্তধারা ওভাবেই কাজ করে। ধারা শেষ হলে চিত্ত স্বরূপে স্থিত হয়। কাল-প্রবাহের চিত্তই কালাতীতের চিৎ।

: কাল থেকে কালাতীতে পৌঁছনো যায় কী ভাবে ?

: নচিকেতাকে যমরাজ উপদেশ দিয়েছিলেন,

হৃদা, মনীষা, মনসাভিক্লৃপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।[১]

হৃদয়ের অনুরাগ, মনীষার সংকল্প, এবং মনের বিচারবুদ্ধি একত্র হলে তত্ত্বামৃত লাভ হয়। জীবনধর্মের এই ত্রিবেণীসঙ্গমই মহাতীর্থ। এই তীর্থে স্নান না করলে অমৃত ও অভয় হওয়া যায় না।

: ত্রিবেণীসঙ্গম হয় না কেন ? এই তিনের ভিতর কি বিরোধ আছে ?

: বিরোধ তো আছেই ; সেইজন্যই সাধনার প্রয়োজন। অবশ্য আলাদা সত্তা এদের নেই—তিনে এক, একে তিন। কিন্তু সংস্কারের পার্থক্যহেতু ঝোঁকের পার্থক্য থাকে।

: কি রকম পার্থক্য ?

---

(১) কঠ ২-৩-৯

ঃ আমার গুরুদেবের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তাঁর বহুমুখী সাধনা ছিল; শিষ্যদের প্রকৃতি অনুযায়ী মন্ত্র বা সাধনা দিতেন। তিনি বলতেন, 'ভক্তিমার্গে অনুরাগের প্রাবল্য, তন্ত্রমার্গে সংকল্পের, জ্ঞানমার্গে বিচারের'।

ঃ ঝোঁকের প্রাবল্যে ত্রিবেণীসঙ্গমে তো বাধাও সৃষ্টি হতে পারে?

ঃ বাধা তো আসেই।

ঃ বাধা সরাবার উপায়?

ঃ গুরুদেব সহকারী সাধনের উপর জোর দিতেন। যেমন, বৈষ্ণব ভক্তকে বলতেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ; ধ্যান ও বিচারের সাহায্যে ভাবের স্থৈর্য ও চরিত্রের দৃঢ়তা আসে'। তান্ত্রিক শিষ্যকে বলতেন, 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ[১]; শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিচার ইত্যাদি না থাকলে অনুরাগ আসে না; অনুরাগের অভাবে দিগ্‌ভ্রম হয়।' বৈদান্তিক শিষ্যকে বলতেন, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া[২]; বুদ্ধদেবের মতো দুঃখভাবনা করবে, মৈত্রীভাবনা দ্বারা সর্বজীবের কল্যাণকামনা করবে; চর্যানিষ্ঠ ও শীলভদ্র না হলে বিচার তত্ত্বাবগাহী হয় না। এইভাবে সাধনা পূর্ণাঙ্গ ও পরিশুদ্ধ করবার উপদেশ দিতেন।

ঃ আমার অভিজ্ঞতা সামান্যই। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের ভিতর দেখেছি, অনেকেই মন্ত্র নিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণতার ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ করে ভাবেন মুক্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনার গুরুভাইরা বোধ হয় এ সব অন্ধতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

ঃ মুক্ত ছিলেন ঠিক বলা যায় না। তবে গুরুদেবের শাসন ছিল খুব কড়া। একজন সন্ন্যাসী শিষ্য ঘন ঘন কীর্তনে যেতেন শুনে ধমকে দিলেন, ধ্যান-বিচার ছেড়ে যখন খোল ধরেছ তখন গেরুয়াটি আর রেখেছ কেন?...একজন শিষ্য ছিলেন গোপাল-ভক্ত; গোপালকে ক্ষীর, ননী, পেঁড়া, নাড়ু খাওয়াতেন; গোপালের অসুখ হলে ওষুধের ব্যবস্থা করতেন; গোপালের সঙ্গে কথাবার্তাও নাকি হতো। আমরা তাঁকে সমীহ করে চলতুম। গুরুদেব একদিন তাঁকে বললেন, 'কালকে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী, খুব শুভদিন; কাল গোপাল ঠাকুরকে গঙ্গাতে বিসর্জন করে আসবে; গুরুবাক্য যেন লঙ্ঘিত না হয়'।

ঃ বিসর্জনের ব্যবস্থা কেন?

ঃ নইলে মোহ কাটতো না। গুরুদেব বলতেন, এসব হচ্ছে মনের অন্ধ গলি; সাধক ভাবে খুব এগিয়ে যাচ্ছি, আসলে ঘুরপাক খাচ্ছি! অনেক সময় একটা জন্মই নষ্ট হয়ে যায় এই obsession এর চোরা বালিতে।

(১) গীতা ৬-৪৭ (২) কঠ ১-২-৯।

: রাস্তায় এতো বিঘ্ন আসে কেন ?

: হৃদয়, মনীষা ও মন এক সঙ্গে চলে না বলে। চিত্তের একটা বৃত্তি এগিয়ে আছে, আর দুটো পিছনে; পিছনে যারা আছে তারা খেয়াল মাফিক অন্য রাস্তাও ধরে। দ্বিধা-বিভক্ত এই শক্তিকে সংহত করে চালানোই সাধনা। সেজন্য সর্বদা জাগ্রত থাকা দরকার।

: বৃত্তিগুলো গোলমাল সৃষ্টি করে কেন ?

: করে যে তা জানা দরকার। কেন করে তা বলা শক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য কারণ নির্দেশ করেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।[১]

: মায়া কাটানো দেখছি দুরূহ ব্যাপার।

: গুরুদেব বলতেন, প্রায় অসম্ভব।

: অসম্ভব ?

: অসম্ভব—যদি ভগবান্ লক্ষ্য না হয়ে উপলক্ষ্য হয়ে পড়েন। মনে প্রাণে তাঁকে চাইলে তিনিই মায়া কাটিয়ে দেন—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।[১]

: 'অসম্ভব' বলাতে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

: আমিও গুরুদেবের কথায় শঙ্কিত হয়েছিলুম; জিজ্ঞেসও করেছিলুম, 'তা হলে সাধনা করে লাভ কি ?' তারপর তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'প্রকৃতির অপবর্গ না দেওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই; তবে পাঁচ ঘাটের জল না খাওয়ালে প্রকৃতির তৃপ্তিও হয় না'।

: কপালে দুঃখ তা হলে আছেই ?

: আছে যে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে দুঃখ না বলে তাকে জগৎও বলতে পারেন।

: তাতে লাভ ?

: সম্যক্ দৃষ্টির সুবিধা হয়। সেই ত্রিবেণীকে ধরুন। মন বিচার দ্বারা দেখছে যে জগৎ অনিত্য, প্রতিক্ষণ রূপ বদলাচ্ছে; হৃদয় অনুভব দ্বারা দেখছে যে জগৎ ভোগদ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়—সুতরাং বর্জনীয়; মনীষা সংকল্পদ্বারা নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে চায়। তিনের সমবেত চেষ্টায় দেখা দেয় সত্যের অখণ্ড পূর্ণ রূপ—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

(১) গীতা ৭-১৪

॥ ৩ ॥

আমার একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখে মাষ্টার মশায় বললেন,

ঃ বিশেষ কোনো প্রশ্ন আছে ?

ঃ ব্রহ্মবিদ্যালাভের কী উপায় ?

ঃ সাধুরা বলেন, শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ[১] গুরুর নিকট শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অভ্যাস করতে হয়।

ঃ আমাকে তত্ত্বাভ্যাসের রাস্তাটা দেখিয়ে দিন।

মাষ্টার মশায় বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বলেন,

ঃ আমি কি করে দেখাবো ? যাঁরা রাস্তার শেষ দেখেছেন, যাঁরা শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁরাই একাজের ভার নিতে পারেন। আমি তো পথিক মাত্র, এবং ঠিক পথে চলছি কিনা তাও জানি না।

ঃ এজীবনে আমার আর কিছু হবে না দেখছি।

ঃ না, না, তা নয় ; হবে না কেন ? নিশ্চয় হবে···আচ্ছা, কোনো মহাত্মার খোঁজ পেলে আপনাকে জানাবো।

ঃ যতদিন খোঁজ না পাওয়া যায় ততদিন যদি আপনার সঙ্গে চলি ?

ঃ সে তো ভাল কথা। এক সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ, মনন, নিদিধ্যাসন করা যাবে। পরস্পরের উপকার হবে। জ্ঞানের রাস্তায় পরস্পরের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনাও সাধনার অঙ্গীভূত।

পঞ্চদশীতে আছে—

তচ্চিন্তনং তৎকথনম্ অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদ্ একপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥

* * * * *

মাষ্টার মশায় অনেক মহাত্মার কাছে নিয়ে গেছেন, কিন্তু ওঁর চাইতে মহত্তর লোকের দর্শন আজ পর্যন্ত পাই নি ; সন্ধান নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করি না··· 'পরানবন্ধু হে সখা আমার'—এই সম্বন্ধই ভালো। গুরুগিরির চাপ নেই ; চেলা-সুলভ অন্ধতা নেই ;···অস্থি-চর্মের আশ্রিতত্ব নেই···শুধু আছে পথচলার সাহচর্য, তত্ত্বনিশ্চয়ের ঐকান্তিকতা, সত্যদর্শনের অকুতোভয়তা। আমাকে খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু ভাবনা হয় স্নেহের মর্যাদা রাখতে পারবো কিনা।···শাস্ত্র নিয়ে তর্ক কম করি নি, বেয়াড়া তর্কও করেছি। কোনো দিন নিজের মত জাহির করেন নি,

(১) মুণ্ডক ১-২-১২

আলোচনা সূত্রে এতটুকু উষ্মা প্রকাশ করেন নি···চিত্তের প্রশান্ততা, চোখের স্নিগ্ধতা, মুখের স্মিততা এতটুকু ক্লিষ্ট হয় নি।···"তাইতো, প্রশ্নটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে, কোনো মহাত্মা এলে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে"···"আচ্ছা, গীতাভাষ্যে আচার্য শঙ্কর কি লিখেছেন পড়ুন তো"···"সাধুরা বলেন, শুষ্কতা আসে কিন্তু থাকে না"···"আপনি যা বলছেন তা-ও হতে পারে; একটু ভেবে দেখবেন তো।" ···'একটু ভেবে দেখবেন' বললেই বুঝে নিতুম, ঠিক বলছি না, বিচার করলে ভুলটা ধরা পড়বে···আমাদের মহল্লায় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন; চিকিৎসক ভালো, সরল প্রকৃতি; বক্তৃতায় পঞ্চমুখ, যে জন্য খেতাব পেয়েছেন "নেতৃবিশেষের সঙ্গে ব্রাকেটে ফার্স্ট"; আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে—সজারুর কাঁটার মতো প্রতিকথায় অহংটি উঁচিয়ে থাকে। মাষ্টার মশায় ঠিক উলটো, অহং-টি আছে বলেই মনে হয় না; কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধু! আগে বৈষ্ণব সাধনা ছিল, তার জের বোধ হয়—এমন 'তৃণাদপি সুনীচ' সাধু চোখে পড়ে না··· অহমিকা জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলেছেন···খোঁচ-খাঁচ যে এক-আধটুকু নেই তা নয়। সাধুর খবর পেলেই দর্শন করতে যান; পরিচয় একটু অগ্রসর হলেই শুধান, "আচ্ছা স্বামীজী! আমার কিছু হবে?"···কেউ কেউ বলে দিয়েছেন, "হওয়া কি চারটি খানি কথা? আপনি বাঙ্গালী, তার উপর গৃহী; নাম নিয়ে পড়ে থাকুন; জ্ঞানমার্গ আপনাদের জন্য নয়।" নিরাশ হন, ধ্যানের মাত্রা চড়িয়ে দেন। কেউ কেউ বলেছেন, "আপনার হওয়ার আর বাকী কী? ব্রহ্মবিহারে রাজহংসের মতো বিচরণ করছেন···" শুনে আশ্বস্ত হন।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম,

: আপনি এসব প্রশ্ন করেন কেন? কোনো সন্দেহ হয়?

: না, তা হয় না; তবে—

: তবে কি?

: এতো দুর্লভ বস্তু! কতো কঠোর তপস্যার ফলে তত্ত্বলাভ হয়! আমি কী আর এমন তপস্যা করেছি? তাই ভাবি, ভুল হচ্ছে না তো!

: কিন্তু ভুল হচ্ছে বলে কি কোনো শঙ্কা ওঠে?

: সাংখ্যোক্ত 'তুষ্টি' যদি হয়?

: শাস্ত্র ও মহাত্মাদের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে কোনো গরমিল পেয়েছেন?

: তা পাই নি। তবে ঐ যা বললুম, তেমন কিছু তপস্যা তো করি নি; তাই যাচাই করে নিতে ইচ্ছা হয়।

মাষ্টারমশায় তপস্যা না করে থাকলে কে যে তপস্যা করেছেন জানি না, কী যে তপস্যার মানে তাও বুঝি না। আমরাও যে এক-আধটুকু তপস্যা করি নি তা নয়…খালি তক্তপোশে শোয়া, মাথায় বালিশ না দেওয়া, নিত্য গঙ্গাস্নান, নিরামিষ আহার…একাদশী—পূর্ণিমা—অমাবস্যা—শিবরাত্রির উপবাস…একবেলা খাওয়া, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করা, খালি পায়ে চলা, একবস্ত্রে থাকা…চিনি-লবণ বর্জন, শিখাধারণ, দাড়িরাখা, সাবানের বদলে গঙ্গামাটির প্রলেপ, নিমন্ত্রণবর্জন, ঔষধার্থে গঙ্গাজল পান…সব কিছু চেখে দেখেছি, দু-চার দিন বা দু-চার মাস সবাইকে ট্রায়াল (trial) দিয়েছি…কিন্তু আসন থেকে কিছুতেই শূন্যে ওঠা গেল না! ছেড়ে দিলুম পথটা। কতোবার যে এমনি ছেড়েছি আর ধরেছি… কতো হাসি, বিদ্রূপ, কটাক্ষ সহ্য করেছি…সে এক করুণ হাস্যকর ইতিহাস…

: ফিরে দেবু! মাংস খাচ্ছিস!

: হ্যাঁ মামা বাবু! ধরেছি আবার।

: তোর মতিগতির কিছু স্থিরতা নেই। তুই 'বাঙ্গাল' হতে পারলি না।

: কেন?

: যা ধরবি তা করবি—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তা না হলে বাঙ্গাল কি রে?

এই হিসাবে মাষ্টার মশায় 'বাঙ্গাল' না হয়েও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। একটানা তপস্যা চালিয়ে গেছেন সমস্ত জীবন। মন্ত্র নেওয়ার পর গুরুদেবের আদেশে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। 'মাষ্টার বাবু! ও-সব বাজে কৃচ্ছ্র সাধন ছেড়ে দাও; তত্ত্বের পিছনে লেগে থাকাই পরম তপস্যা; খাওয়া-পরা ছেড়ে শরীর-মনকে অবসন্ন করলে সাধনা হয় না'। গুরুবাক্য—অতএব বালিশ মাথায় দেওয়া, এক জোড়া ধুতি ও ক্যাম্বিসের জুতো পরা, অসুখে গঙ্গাজল সহ কুইনাইন খাওয়া ইত্যাদি সুখসম্ভোগে বড়ই ম্রিয়মাণ থাকতেন, 'বিলাসিতা পঙ্কে' ডুবে আছেন ভেবে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন…স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽ নির্বিন্ন-চেতসা…খেদহীন চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!…শুধু সাধনার দিক থেকে নয়; সাংসারিক নানা কষ্ট ও দুর্বিপাকের সঙ্গে মুখ বুজে লড়াই করেছেন; অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন…কিন্তু কোনোদিন কারু বিরুদ্ধে নালিশ করেন নি; সংসারের দুর্বহ ভারে হৃদরোগ হয়েছিল, তা সত্ত্বেও অম্লানবদনে নিজের কাজ করে গেছেন… অসীম ধৈর্য…infinite capacity to take infinite pains—with a smile…

: 'অনির্বিন্নচেতসা' মানে কি?

মাণ্ডুক্যে আছে—

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ ভবেদ্ অপরিখেদতঃ॥[১]

কুশের অগ্রভাগদ্বারা একবিন্দু একবিন্দু করে সমুদ্র শোষণ করতে যে অধ্যবসায় ও ধৈর্যের দরকার মনোনিগ্রহের জন্য তেমনি অধ্যবসায় ও ধৈর্যের দরকার।

: এতো ধৈর্যের কী প্রয়োজন? বা কেন প্রয়োজন?

: ধ্যান আরম্ভ করলে দেখা যায়, মন কেবলই এখানে ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে; যদি অধৈর্য হন তা হলে মন আরও চঞ্চল হবে, অর্থাৎ ধ্যান বসবে না। তারপর ধীরভাবে মনকে তত্ত্বাভিমুখী করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু মন এগচ্ছে না, যেন স্তব্ধীভূত হয়ে আছে; এখানেও ধৈর্যের দরকার। মন যদি এগিয়ে তত্ত্বাবগাহী হয়, তখনও চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা দেয়; চঞ্চল হলে আর অনুভূতি হবে না, মন তত্ত্ব থেকে সরে আসবে। এসব কারণে ধৈর্য বা উদাসীনতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় জিনিসটি আমার নেই। ধ্যান না বসলেই মনে হয়, দিই ছেড়ে, এসব আমার রাস্তা নয়, বাজে কাজে অনর্থক সময় নষ্ট। মাষ্টার মশায় হাসেন; বলেন 'কর পণ নর গণ'র অবস্থায় সকলকেই নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হয়।…মাষ্টার মশায়ের মতো তপস্যা! আমাকে দিয়ে হবে না। খেদ করে একদিন বলছিলেন, 'কুমারিল ভট্ট তুষানলে দেহত্যাগ করেছিলেন; সে-তুলনায় আমরা কী আর করেছি।'…ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কণ্টকাসনে বসা হলো না—এজাতীয় একটা আপসোস হয়তো মাষ্টারমশায়ের মনোগহনে লুক্কায়িত আছে… দুর্বাসাজী ঠিকই বলেন—ভারতে মহাতপাদের জন্ম এখনো হয় বলেই আমরা বেঁচে আছি; নইলে দেশটা পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো…দুর্বাসাজী—বেশ জোরালো চরিত্র; substratum of natureটুকু আছে বলে মানুষের তটভূমিতে কিছু পরিচয় সম্ভব…সজারুর কাঁটা দু-চারটে না থাকলে বোধ হয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক ফোটে না। মাষ্টার মশায়—আমাদের তটভূমি পেরিয়ে গেছেন; সাগরে ঝাঁপ দিলে, যোগাযোগের সূত্রগুলো কেটে ফেললে, হয়তো একটা 'আত্মীয়তা'র সন্ধান পাওয়া যায়—**not a character but a soul,** কায়া নয়, ব্যক্তি নয়; শুধু দীপ্তি……

: কি বলছিলেন, দেবল বাবু?

: ধৈর্যের তাত্ত্বিক রূপটি কী? মানে, **Metaphysical aspect?**

---

(১) মাণ্ডূক্য ৩-৪১

ঃ ধৈর্য মানে ব্রহ্ম। সূর্যদেব যেমন সব কিছু প্রকাশ করেন কিন্তু কোনো কিছু সম্বন্ধেই তাঁর হেয়ত্ব-উপাদেয়ত্ব বুদ্ধি নেই, ব্রহ্মও তেমনি সমভাবে, নিরপেক্ষ হয়ে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সব কিছু প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মের মতো ধীর না হলে ব্রহ্মানুভূতি হবে কি করে? সমত্বং যোগ উচ্যতে।

এমনি শাস্ত্রালোচনা প্রায়ই হয়; তর্কটা জমে ভালো যেদিন মাষ্টার মশায়ের এক পুরনো ছাত্র আলোচনায় এসে যোগ দেন। ভদ্রলোক দর্শনের ছাত্র ছিলেন; দর্শনের শিক্ষক নন, কিন্তু সত্যিকারের দার্শনিক; আপন-ভোলা লোক। আমরা নাম দিয়েছি বেদব্যাস…ব্যাসজী আমার নমস্য—শুধু যে ওঁর কাছে বিচারের সূক্ষ্মতা ও অকুতোভয়তা শিখেছি তাই নয়। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় এঁরই মাধ্যমে হয়; এ কারণেও বিশেষভাবে ইনি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। …মাষ্টার মশায়ের সান্নিধ্যে আমরা দুজনা বিচারের সূত্র ধরে কতো সমুদ্র যে পাড়ি দিয়েছি…লোকালয়ের বহুদূরে আকাশচুম্বী পর্বতের ছায়াদেশে ঝিল্লিরবের ব্যাপক স্তব্ধতায় ডুব দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলি এক চিরসুপ্তির নিঝুমতায়…বৈশাখের প্রচণ্ডতাপে দগ্ধ হয়ে যখন দিশাহারা তখন হঠাৎ দেখি উচ্চশির অসংখ্য তালগাছের ঘনচ্ছায়ায় তালপুকুরের ঘুমিয়ে-পড়া স্ফটিক জল, অবগাহন করি পরমশান্তির নিবিড় পূর্ণতায়…মাঘের হাড়কাঁপানো শীতে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে অরুণালোকের স্ফূর্ত পরশে মনের পাপড়িগুলোকে খুলে ধরি…মনসিজ অজস্র আলোর নিঝরিণীতে স্নান করে স্নিগ্ধ, তৃপ্ত, উৎফুল্ল…

দিনের পর দিন সাহচর্য না পেলে; সপ্তলোকবিচরণের চাক্ষুষ প্রমাণ না দেখলে; বন্ধুত্বের নিবিড়তা, আচরণের মধুরতা, তপস্যার একনিষ্ঠা, শীলচর্যার অক্লান্ততা—এসব যে কল্পনা নয়, মানুষের জীবনে সত্যিই মূর্ত হয়ে দেখা দেয় তা না জানলে; ব্রহ্মলোকের অস্তিত্বে কোনো দিনই হয়তো খাঁটি বিশ্বাস হতো না। বুদ্ধদেব বলেন,

সীলগন্ধ সমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্‌সতি।
যো সমং অনুবাতে চ পাটিবাতে চ বায়তি॥

বায়ুর অনুকূলেই পুষ্পগন্ধ প্রবাহিত হয়; শীলগন্ধ অনুকূল প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়। মাষ্টার মশায় শীলগন্ধ; সর্বদিক্ থেকে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছি। ভাগবতের একটি শ্লোক মনে পড়ে—

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দূরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ।

হে প্রসন্নগম্ভীর অনন্তপার অক্ষুব্ধ মহাম্বুধি! তোমাকে প্রণাম! ত্রিবেণী সঙ্গম! দুরূহ

ব্যাপার! ফেসাদেই পড়েছি! 'সে আমার নয়' বলে কেটে পড়াই সঙ্গত…কিন্তু যাবো কোথায়? সব রাস্তাই যে বন্ধ—যে রাস্তা ধরেছি সেটিও…আসন নিয়ে তোড়জোড় করে ধ্যানে বসি—বিড়ম্বনা মাত্র। ধৈর্য? তারও তো একটা সীমা আছে?…অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন?…সে আমার শক্তির বাইরে!…চেষ্টা করতে দোষ কি?…বসি আসন নিয়ে…মনটা বেশ লেগে আসছে…আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্…উঠে দাঁড়াই; ঘুমিয়ে পড়েছিলুম…বেশ আপদ তো। মন বসলেই ঘুম পায়!…আবার বসি…আগেকার স্থির ভাবটি পালিয়ে গেছে; চেষ্টা করি, আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্ সমুদ্রের কথা ভাবি…কালকে চাল কিনতে হবে…দামটাও এখন চড়া! বক্তৃতা শুনলে যদি পেট ভরতো! তবে ভারত ভূস্বর্গ!…ধেৎ! মনটাই যে কালোবাজারে ঢুকছে…কতো বক্তৃতা হলো, কিন্তু কালোবাজার আরও মিশমিশে কালো হয়…দু-হাত দিয়ে কালোবাজার সরাই…'যুক্ত আসীত মৎপর'! হে মোর অশান্ত মন! পরমাত্ম-চিন্তায় ডুবে যাও! যুক্ত আসীত মৎপরঃ…শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি…অচলপ্রতিষ্ঠ পরমাত্মাতে ডুবতে না পারলে শান্তি কৈ? শান্তিং নির্বাণপরমাম্…নির্বাণের পরম শান্তি…বুদ্ধদেবকে নিয়ে কি হুল্লোড়বাজিই না হলো!…কোথায় বুদ্ধদেবের পঞ্চশীল, আর কোথায় আমাদের পঞ্চশূল!…কামাত্মার ভোগৈশ্বর্যের দিকে গতি! কী ঢক্কানিনাদ!…ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্…আমারই মতো! অবান্তর কথায় চিত্ত বেশ অপহৃত হয়ে দোষানুসন্ধানে লেগে গেছে…এমনি পাপ-মন নিয়ে এগনো সম্ভব কি?…কেনই বা পাগলা হাওয়ার মতো এমনি ঘুরে বেড়ায় মন? কী লাভ হচ্ছে?…নিষ্ফল চিন্তা! নিষ্ফলও নয়; মনটা তো বিষিয়ে ওঠে! তবুও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি…বনের মোষ হলে তবু ছিল ভাল; তাড়াচ্ছি তো মনের মোষ! তাড়াচ্ছি কি? শুধুই পিছনে ছুটছি…গো-পালকের দশ অবস্থা দেখিয়ে চীনা শিল্পী বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন…প্রথম দশায় রাখাল গরুর পিছনে প্রাণপণ ছুটছে…ছুটে ছুটে হয়রাণ, দিশাহারা…দশম অবস্থায় গরুর পিঠে চড়ে, আরাম-সে—প্রথম দশায়ই তো আমি কাবু…নাঃ; জোর করে মন থেকে সব চিন্তা তাড়িয়ে স্থির হয়ে বসতে হবে শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ…যুঞ্জ্যাদ্ যোগম্ আত্মবিশুদ্ধয়ে…

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি নাহং
নচ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমি র্ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

…কালী ফাঁস দিয়ে মারা গেলো !…আমার ড'ন্ কুকুরটি আজ কোথায় ? কেউ হয়তো আদর করে রেখে থাকবে…মরে যায় নি তো ? ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়েছিল !…হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ…ড'ন্ হয়তো এমনি কাঁদছে !…আমারও কি কান্না কম হলো ? কালকে তো বড়কর্তা অপমানই করলেন !…কাজ ফেলে রোজ গিয়ে সেলাম করতে হবে !…**At the fag end of service** !…যা জীবনে কোনো দিন করি নি ! **My dear Boss ! you have made a mistake**…দিব্যি 'শিবোঽহম্' চালাচ্ছি !…কি করা যায় ?…

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

বেশ ; তা-ই করি। মনকে বশে আনবার চেষ্টা করি।…বশে কি আসে !… সজাগ হই ; বিচার করি ; অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ এই পঞ্চকোষ থেকে নিজেকে আলাদা করবার চেষ্টা করি…মননের যন্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করি…মন কিছুতেই বাগ মানে না—নীচের তলার এক অন্ধ কুঠরিতে গিয়ে রাগ করে বসে আছে। সাধ্যসাধনা করি ; শ্রেয়োলাভের কথা শুনাই ; যুক্তি দ্বারা মনের মনগড়া ওজর-আপত্তি কাটিয়ে ভাবি এবার বোধ হয় সাড়া দেবে…কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। চোখে ঠুলি লাগিয়ে সেই যে থাম ধরে বসে আছে ! আলো এবং আকাশ ওর অসহ্য ! কিছুতেই অন্ধ কুঠরি ছাড়বে না !…কতো আর বুঝাবো !…কি করা যায় ?…অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ…অব মৈঁ কোন উপায় করূঁ…অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ…দু চোখ বেয়ে জল পড়ে…

অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ
জনম পায় কছু ভলো ন কীন্হোঁ, তাতেঁ অধিক ডরূঁ
…অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ…
…অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ…
…অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ…
…হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ…
…অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ…
…হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ…

॥ ৫ ॥

: উপনিষদের পঞ্চকোষ বিচার এবং সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক কি একই প্রক্রিয়া ?

: পঞ্চকোষ বিচার দুভাবে হয়—নেতি নেতি করে নিষেধমুখে এবং ইতি-ইতি করে খ্যাতিমুখে। নেতি-বিচারে সব নিষিদ্ধ হলে অভাবপ্রত্যয় বা বৌদ্ধদের শূন্যানুভূতি হয়। ইতি-বিচারে পঞ্চকোষ বিবিক্ত হয়, নিষিদ্ধ হয় না, দৃশ্যকোটিতে চলে যায়; অর্থাৎ যাবতীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ জড়, এবং তার দ্রষ্টা পুরুষ চেতন সাক্ষী; এই বিবিক্ত অনুভূতিই সাংখ্যের বিবেক খ্যাতি।

: অভাব-প্রত্যয়ই কি পাতঞ্জলের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ?

: অভাব-প্রত্যয়ের পরিপক্ক অবস্থা বলতে পারেন।

: পাতঞ্জলে প্রথম বিবেক খ্যাতি কেন ?

: ওঁদের প্রক্রিয়াই অমনি—স্থূল হতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতমে পৌঁছতে হয় পূর্ব পূর্ব ভূমির দ্রষ্টা হয়ে নিজেকে আলাদা করে। শেষে আমি দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি দৃশ্য এই বিবেক খ্যাতিকেও ত্যাগ করতে হয় বৈরাগ্য ভাবনা দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাতভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য—তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ[১]। কিন্তু বেদান্তের নেতি-বিচার ও সুষুপ্তিবিচারে প্রথমে অভাব প্রত্যয় হয় এমনি শাস্ত্রকারদের ইঙ্গিত আছে। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিতে আছে—

অনুমানাদ্ অয়ং ভাবাদ্ ব্যাবৃত্তোঽভাবমাশ্রিতঃ।
ততোঽপ্যস্য নিবৃত্তিঃ স্যাদ্ বাক্যাদেব বুভুৎসতঃ॥[২]

: বেদান্ত বিচারে বিবেক খ্যাতি হয় না কেন ?

: হতেও পারে। তবে হবেই বলা যায় না; কারণ, বেদান্তমতে পুরুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা নয়; পুরুষ প্রকৃতির উপাদান কারণ এবং অধিষ্ঠান। সুতরাং নেতিবিচারের পর উপাদান কারণ বা অনুস্যূত সত্তাকে লাভ করতে হয় মহাবাক্যবিচার দ্বারা।

: কি ভাবে?

: কার্যকে উপাদান কারণে লয় করে।

: লয় করবার উপায় ?

: বিচার। ঘট-পটাদি জ্ঞানে 'ঘট' পটজ্ঞানে বাধিত হয়, 'পট' ঘটজ্ঞানে বাধিত হয়; উভয়ত্র অনুস্যূত জ্ঞানই সৎ। 'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তৎ

(১) পাতঞ্জল ১-৫১ ; (২) নৈষ্কর্ম্য ৩-১১৩

তথা'—যে আদিতেও নেই অন্তেতেও নেই সে বর্তমানেও নেই, যেমন স্বাপ্নিক রথগজাদি। সর্বানুস্যূত জ্ঞানের কোনো কালেই বাধ নেই, সুতরাং জ্ঞান-স্বরূপই এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু। আত্মা যে প্রপঞ্চে অনুস্যূত এবং প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান তা সাংখ্যবাদী মানেন না। দৃষ্টি ভেদে দর্শনও ভিন্ন হয়, অর্থাৎ দ্বৈতস্পর্শী।

: অধিষ্ঠান বিচার ও উপাদান কারণ বিচার কি আলাদা?

: একটু প্রকারভেদ আছে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি বিচার দ্বারা প্রপঞ্চের ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয়, এবং জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হয়। এই স্বপ্নের বা ভ্রমের অধিষ্ঠান কে? বৌদ্ধ মতে ভ্রমের অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয় না; সুতরাং তত্ত্ব হয় শূন্য। বৈদান্তিক বলেন, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম হয় না। সর্পের অধিষ্ঠান যেমন রজ্জু, প্রপঞ্চভ্রমের অধিষ্ঠান তেমনি আত্মা। এই আত্মাই পরমার্থ সৎ।

: বিচার অনেক সময়ই দেখি বসে না, ভাসা-ভাসা থেকে যায়। এর প্রতিকার কি?

: আবৃত্তিরসকৃদ্‌ উপদেশাৎ[১]; আসুপ্তেরামৃত্যোঃ কালং নয়েদ্‌ বেদান্তচিন্তয়া; অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ[২]—সকলেই এক কথা বলেন। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসই এক মাত্র রাস্তা; বৈরাগ্যভাবনা দ্বারাই বিচার তত্ত্বাবগাহী হয়। অর্থাৎ লেগে থাকা দরকার। তবে একটা বিষয়ে সাধুরা জাগ্রত থাকতে বলেন।

: কোন্‌ বিষয়ে?

: বেদান্তবিচার প্রথম পুরুষে বা মধ্যম পুরুষে হয় না। তত্ত্ব হচ্ছে সদা অপরোক্ষ, সুতরাং উত্তমপুরুষনিষ্ঠ। বিচার 'তুমি' বা 'তিনি'র কোঠায় গেলেই তত্ত্ব দৃশ্য কোটিতে চলে যায়। সোঽহংস্বামী বলতেন, থার্ড পার্সনে (third person) বেদান্ত হয় না। মহাবাক্যগুলোতে এজন্যই জোর দেওয়া হয়েছে 'অহম্‌'-এর উপর।

: 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যবিচারে কি প্রকারভেদ আছে?

: আছে। সাধারণতঃ ভাগ ত্যাগ লক্ষণার বিধি আছে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁরা নির্গুণে যান তাঁদের পক্ষে এই বিচার বিশেষ উপযোগী। মনের গড়ন যাঁদের বিবেকধর্মী তাঁদের প্রক্রিয়া একটু অন্য রকমের। ভাগ-ত্যাগ এখানেও আছে। আমি দ্রষ্টা, জগৎ দৃশ্য। সাংখ্যবাদী দৃশ্য থেকে দ্রষ্টাকে আলাদা করেন। বেদান্ত সাধনায় দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের উপাদান কারণকে, অর্থাৎ উভয়ের নাম-রূপ ভাগ ত্যাগ করে উভয়ানুস্যূত দৃক্‌স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে, গ্রহণ করাই বিধি।

: তার মানে সগুণ ঈশ্বরের জায়গায় বিচারের বিষয় হবে দৃশ্যপ্রপঞ্চ?

(১) বেদান্তসূত্র ৪-১-১; (২) পাতঞ্জল ১-১২

: সাধুরা তাই বলেন।

: এটাই কি মুখ্য প্রক্রিয়া ?

: বেদান্ত মতে হয়তো এটাও মুখ্য নয়। সাংখ্য থেকে বেদান্তে পৌঁছবার রাস্তা এটা।

: মুখ্য বিচারটি কি ?

: বিচারের কোঠা পেরিয়ে এলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্য থেকেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয়—

সদেবেত্যাদিবাক্যেভ্যঃ প্রমা স্ফুটতরা ভবেৎ।
দশমস্তমসীত্যস্মাদ্ যথৈবং প্রত্যগাত্মনি ॥[১]

'তুমি দশম' এই উপদেশ থেকে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তির 'আমি দশম' এই জ্ঞান হয়, তেমনি 'তুমি ব্রহ্ম' এই উপদেশ থেকেই 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

: কিন্তু হয় না কেন ? কতোবার তো 'অহং ব্রহ্মাস্মি' করলুম—

: প্রথমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত করা দরকার। বিচার দ্বারা অসম্ভাবনা ও ধ্যান দ্বারা বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হলে চিত্ত স্থির ও নির্মল হয়; তখন বাক্য থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

: দুটো শব্দ থেকে কি করে ব্রহ্মজ্ঞান হবে ঠিক বুঝতে পারি না।

: নিদ্রিত অবস্থায় কেউ যদি আপনার নাম ধরে ডাকে তবে জেগে ওঠেন তো ?

: তা উঠি।

: জাগ্রত অবস্থাও ঘুমিয়ে থাকার মতো—তত্ত্বের দিক থেকে। সচ্চিদানন্দই আপনার আসল নাম। সুতরাং সেই নাম ধরে ডাকলে ঘুম ভেঙ্গে যায় ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। মহাবাক্যলক্ষিত নামই জীবের সত্যিকার নাম।

: মহাবাক্যের তা হলে বিশেষ শক্তি আছে ?

: তা আছে, মানে প্রমাণনিষ্ঠ শক্তি; যেমন ঘটদর্শনে চক্ষুর বিশেষ শক্তি আছে। এসম্বন্ধে বার্ত্তিককার বলেন—

দুর্বচত্বাদ্ অবিদ্যায়া আত্মত্বাদ্ বোধরূপিণঃ।
শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাদ্ বিদ্মস্তং মোহহানতঃ ॥
অগৃহীত্বৈব সম্বন্ধম্ অভিধানাভিধেয়য়োঃ।
হিত্বা নিদ্রাং প্রবুধ্যন্তে সুষুপ্তে বোধিতাঃ পরৈঃ ॥

---

(১) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪-৩৩

বোধরূপ আত্মার নিকট অবিদ্যা দুর্বল, ন্যূনসত্তাক ; শব্দের অচিন্ত্য শক্তি হেতু মোহ নাশ হলে আত্মতত্ত্বের অবগতি হয়, যেমন সুপ্ত ব্যক্তি অন্য দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে নিদ্রা ত্যাগ করে।

: এক মহাবাক্যের বিচারই দেখছি নানা প্রকারের ; মতবাদও নানাবিধ—বিম্ববাদ, প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ, বহুজীববাদ, একজীববাদ, অজাতিবাদ···সিদ্ধান্ত এক কিন্তু মতবাদ অনেক—এর তাৎপর্য কি ?

: বাদগুলো সবই প্রক্রিয়া—রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী যার যেটা ভালো লাগে। সুরেশ্বরাচার্যের একটি সমাধান আছে এসম্বন্ধে—যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ স্বাধ্বী ; অর্থাৎ যার যে বিচার বসে ভালো। সকলেরই লক্ষ্য তত্ত্বলাভ। আপনার কোন্ বিচার ভালো লাগে ?

: নেতিমুখে সুষুপ্তিবিচার, ইতিমুখে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'।

: খুব ভালো প্রক্রিয়া। 'নেতি' না থাকলে 'ইতি'কে ধরা যায় না, 'ইতি' না থাকলে ব্রহ্মসিদ্ধি হয় না। 'নেতি' এবং 'ইতি' পরস্পরের পরিপোষক। গীতার একটি শ্লোকে দুটো দিক্ই এক সঙ্গে আছে—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ স্তদোচ্যতে ॥[১]

নেতিমুখে সব ত্যাগ করে ইতিমুখে আত্মাতে স্থিতি। এভাবেও অভ্যাস করতে পারেন—বিচার আত্মনিষ্ঠ করে।

: 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এই বাক্যের বিচার আত্মনিষ্ঠ কি ভাবে করা যায় ? এই মহাবাক্যটিতে "অহম্" এর উল্লেখ নেই !

: আমি এক মহাত্মাকে এই প্রশ্ন করেছিলুম ; তিনি মাণ্ডুক্যের অলাতশান্তি-প্রকরণ পড়তে বললেন। ইঙ্গিতটি স্পষ্ট করবার অনুরোধ করতে, বললেন—একরস অখণ্ড বিজ্ঞানস্বরূপকে বুঝতে হলে প্রথমে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদকে ধরতে হয়—অর্থাৎ বাহ্য বস্তু কিছুই নেই, শুধু চিত্তধর্ম ও চিত্তপরিণাম, সুতরাং অহংনিষ্ঠ। ঘটপটাদিকে নিজের চিত্তপরিণামরূপে বিচার করে বুঝতে হয় ; তারপর সন্ধান করতে হয় পরিণামসমূহের উপাদান কারণ বা অনুস্যূত সত্তার। সন্ধানের ফল 'অহম্'-এর জ্ঞানস্বরূপত্ব সিদ্ধি।

: 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ দুটো আলাদা অনুভূতি তো ?

: সাধুরা তো তাই বলেন।

---

(১) গীতা ২-৫৫

: এদুটোর পার্থক্য কি ?

: সোঽহং স্বামীর গ্রন্থে বোধ হয় এই প্রশ্নের একটি সুন্দর আলোচনা আছে। তিনি বলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তিন ভাবে থাকেন। প্রথম ব্রহ্মভাব বা transcendent realityর ভূমি মানে প্রপঞ্চোপশম প্রজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতি ; দ্বিতীয় ঈশ্বরভাব বা immanent realityর ভূমি, মানে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা সর্বানুস্যূত সর্বাত্মভাবে স্থিতি।

: ঈশ্বর ভাবে কি সবকিছু, মানে জগৎ-প্রপঞ্চ, থাকে ?

: সব কিছু থাকে না, শুধু 'সব'টুকু থাকে। জগতের যদি 'তন্মাত্র' স্বীকার করা যায় তবে সেই তন্মাত্ররূপ উপাধিটি ভাসে—প্লাতোর Idea গোছের। ব্রহ্মানুভূতিতে উপাধি হচ্ছে 'অহম্,' আর ঈশ্বরানুভূতিতে উপাধি হচ্ছে 'সর্বানুস্যূত অহম্'। প্রথমটি স্বরূপানুভূতি, দ্বিতীয়টি উপাদান কারণ ও অধিষ্ঠানের অনুভূতি। কারণ সত্তা মৃত্তিকার জ্ঞান না হলে যেমন ঘটের উপাদান কারণ ও অধিষ্ঠান যে মৃত্তিকা এই জ্ঞান সম্ভব হয় না, তেমনি ব্রহ্মানুভূতি না হলে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-রূপ উপাদান-ও-অধিষ্ঠান জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি পূর্বভাবী ; ঈশ্বরানুভূতি পরভাবী, এবং ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে অবিনাভাবী।

: ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের তৃতীয় ভাবটি কি ?

: জীবভাব ; জীবত্বই এখানে উপাধি।

: অবিদ্যা তা হলে থেকে যায় ?

: পুরোপুরি নয়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবিদ্যার আবরণী শক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধবশতঃ বিক্ষেপ শক্তি থাকে।

: অর্থাৎ অবিদ্যালেশ থাকে ?

: শাস্ত্রকারগণ অবিদ্যালেশ স্বীকার করেছেন। মায়া আর অবিদ্যার ঐটুকু পার্থক্য। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই অনুভূতির 'সর্বংটুকু' হচ্ছে মায়ারূপ ঈশ্বরোপাধি। মায়া অবিদ্যক নয়। ঐন্দ্রজালিক যেমন নিজের ইন্দ্রজাল দ্বারা নিজে আবদ্ধ হন না, ঈশ্বরও তেমনি ঐশী মায়াদ্বারা নিজে আবদ্ধ হন না ; অর্থাৎ মায়া তাঁর লীলা-বিলাস। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ঈশ্বরানুভূতির অবস্থায় ঐশী লীলা দর্শন করেন ; কিন্তু জীবভূমিতে যখন ব্যুত্থিত হন তখন অবিদ্যক বিক্ষেপ শক্তির আওতায় এসে পড়েন, নচেৎ আহারাদি কোনো কাজই সম্ভব হতো না। মাণ্ডূক্যের ভাষায় ব্রহ্মজ্ঞ হচ্ছেন "চলাচলনিকেতঃ"।[১] ঐশী ও ব্রাহ্মী স্থিতির দৃঢ়তার উপর তত্ত্বজ্ঞদের

(১) মাণ্ডূক্য ২-৩৭

ভূমিনির্দেশ হয়। চতুর্থ ভূমিতে সত্ত্বাপত্তি বা তত্ত্বজ্ঞান; পঞ্চম ভূমিতে অসংসক্তি বা জীবন্মুক্তি। ষষ্ঠ পদার্থাভাবনী ও সপ্তম তুর্যগা ভূমিতে জীবন্মুক্তির গাঢ়তর ও গাঢ়তম অবস্থা।

: লোকমুখে যে সর্বত্র নারায়ণ দর্শনের কথা শোনা যায়, মানে যেখানে চোখ যায় সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ মুরলী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,—গাছে, মাঠে, রাস্তার বাঁকে···

: ও কিছু নয়। ভাবের আতিশয্যে অমনি হয়—কাল্পনিক দর্শন, তাত্ত্বিক নয়।

: আপনার তো বৈষ্ণব সাধনা ছিল, আপনার ঐজাতীয় দর্শন—

: হতো।···বিকেল বেলা বেড়াবার সময় প্রায়ই ওরূপ দর্শন হতো···ধ্যানেতে মন স্থির হয়ে যেতো, কিন্তু জোর করে শ্রীকৃষ্ণকে এনে সেখানে বসাতুম। গুরুদেব একদিন ভুলটা ধরিয়ে দিলেন; বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটিই বিঘ্ন হচ্ছে; মূর্তি লয় করে মনকে চিন্তাশূন্য করবে—ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ।'

: ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে যাঁদের তেমন আকর্ষণ নেই তাঁদের কি ঈশ্বরানুরাগ নেই বুঝতে হবে?

: তা বলা যায় না। রূপ এবং শব্দকে ব্রহ্মের দ্বারপাল বলা হয়েছে। কারু রূপসংস্কার প্রবল থাকে, কারু শব্দ-বা নাদ-সংস্কার প্রবল থাকে। রূপের মাধ্যমে যাঁরা এগোন তাঁদের পথ ভক্তি ও প্রেমের। নাদ বা প্রণবের মাধ্যমে যাঁরা এগোন তাঁদের পথ যোগের বা জ্ঞানের।

: নাদ-সংস্কারে জ্ঞানের পথ উপযোগী হয় কেন?

: রূপকে ধরে রাখা যায়, সুতরাং ভক্তি ও প্রেম দিয়ে তাঁর পূজো সম্ভব। শব্দ বা নাদের স্বভাবই হচ্ছে লয়াত্মক।

: বুঝেছি। যেমন তানপুরার সুরে গান-বাদ্য ইত্যাদি সব লয় পায়; সানাইর একটানা সুরটিরও বোধ হয় ঐ তাৎপর্য···কিন্তু তার সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কি?

: জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেতে সব কিছু লয় পায়। এইজন্য নাদসংস্কারের ঝোঁক থাকে লয়-যোগ বা জ্ঞান-যোগের দিকে। রূপতত্ত্ব থেকে নাদতত্ত্ব সূক্ষ্মতরও বটে।

: জ্ঞানের রাস্তায় কি প্রেম হয় না?

: জ্ঞান না হলে প্রেম হয় না; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পূর্বভাবী, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান পরভাবী। তাত্ত্বিক প্রেম মানে 'সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্' 'সর্বভূতানি চাত্মনি'—এক পরমাত্মা সর্বভূতে অনুস্যূত, সর্বভূত এক পরমাত্মাতে অবস্থিত, এই জ্ঞানই প্রেম।

: এই জ্ঞানই প্রেম?

: কাশীতে হরিহরবাবাকে দর্শন করতে গিয়েছিলুম। সর্বদা ব্রাহ্মী স্থিতিতে

থাকতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'জ্ঞানে আর প্রেমে পার্থক্য কি?' জবাব দিলেন,—

"জো জ্ঞান হৈ সো হি প্রেম হৈ।"

॥ ৬ ॥

সংসার মরুভূমি পেরিয়ে চিত্তমরুভূমিতে ঢুকেছি…বড় বন্ধুর পথ…নিঃসন্দেহ। চলছি…এগচ্ছি কিনা জানিনা…তৃষ্ণায় ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে…এক ফোঁটা জলও নেই…শুধুই মরুভূমি…বালু ও কাঁকর,…কোথাও জল নেই…দিগন্তরাল-ব্যাপী শুষ্কতা…ফিরে যাবো?…রাস্তা কোথায়? চারদিকেই তো বালু আর বালু…কোন্ আশায় ফিরবো?…অন্ততঃ কাঁটাগাছ—এখানে তো কিছুই নেই!… জলাশয়? তেমনিই তো দেখাচ্ছে! মরীচিকা নয় তো?…তার চাইতে কাঁটাগাছ ভালো নয়?…মরীচিকা?…মাষ্টার মশায় কি মরীচিকা? অসম্ভব। …আছে, অজস্র আলোর রাজ্য আছে; যেতেই হবে এগিয়ে।…অনেকবারই তো থেমেছি—সেই কাঁটাগাছ…বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্—এ মিথ্যা হতে পারে না…মাষ্টার মশায় কখনো মিথ্যা হতে পারেন না…এগিয়ে চলি, দেখাই যাক কিছু আছে কি না…চরন্ বৈ মধু বিন্দতি…মধু পাবো কিনা জানি না, কিন্তু ছাইপাঁশ মুখে গুঁজে আর পড়ে থাকা যায় না…সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্…চলি সূর্যের মতো…অতন্দ্রিত হয়ে……

হৃদিকন্দরতামসভাস্কর হে, রিপুসূদন মঙ্গলগায়ক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্রি দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

ওঁ তৎ সৎ…ওঁ তৎ সৎ…ওঁ তৎ সৎ…ওঁ তৎ সৎ…মরুভূমি পেরিয়ে এসেছি… কিন্তু বিরাট এক পাহাড়!…পাহাড় নয়, পাহাড়ের উপর পাহাড়…পিচ্ছিল রাস্তা, ভয়ঙ্কর খাড়াই…যাই কি ভাবে?…বসি।

ঃ হে যাত্রী! এটাকেও ডিঙিয়ে যেতে হবে।

ঃ পরাণবন্ধু হে সখা আমার! আমি কি পারবো?

ঃ ভয় কি? সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। পরম পুরুষ আমাদের উভয়কে বিদ্যাসামর্থ্য দিয়ে পোষণ করছেন…এপথ ভয়ের নয়, পরম কল্যাণের।

ঃ পথ যদি ভুল করি ?

ঃ অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্,
স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ।[১]

পথিকৃৎ ঋষিগণ রাস্তা করে গেছেন ; এপথ নির্ভুল।

*　　*　　*

তমসো মা জ্যোতির্গময়…এ যে ভয়ানক খাড়াই ! পেরুবো কি করে ?

ঃ এতম্হি তুম্হে পটিপন্না দুক্খস্সন্তং করিস্সথ।[২]

এ রাস্তায় না চললে দুঃখের শেষ নেই। ধৈর্য ধরে পর্বত উল্লঙ্ঘন করতে হবে

ঃ ধৈর্যে আর কুলচ্ছে না।

ঃ খন্তী পরমংতপো, তিতিক্খা নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।[৩]

বুদ্ধগণ বলেন, সহিষ্ণুতাই পরম তপস্যা, তিতিক্ষাই পরম নির্বাণ।

*　　*　　*

রাস্তার দুর্ভোগ বোধ হয় কাটলো এবারে…সমতল ভূমি দেখা যাচ্ছে…এবারে প্রসন্নচিত্তে এগনো যাবে…আরামের নিঃশ্বাস ফেলি…'প্রসাদমধিগচ্ছতি' ?

ঃ দেরী আছে। তুষ্টিতে মুগ্ধ হতে নেই। তুষ্টি রাস্তার পরম বিঘ্ন।

ঃ আবার যে পর্বতমালা ! জিরিয়ে নিই একটু।

ঃ গতাদ্ধনো বিসোকস্স বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।[৪]

রাস্তা শেষ না হলে বিশোক ও বিমুক্ত হওয়া যায় না।

ঃ একটু জিরিয়ে নিচ্ছি মাত্র।

ঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা। যে থামে তার যে ভাগ্যও থেমে থাকে। ইন্দ্র সখ্য স্থাপন করেন তারই সঙ্গে যিনি চলেন।

ঃ এই চড়াই-উৎরাইর কি শেষ নেই ?

ঃ শেষ আছে বৈ কি।

(১) ঋগ্বেদ ১০-৩২-৭ (২) ধম্মপদ—২৭৫ ; (৩) ধম্মপদ—১৮৪ ; (৪) ধম্মপদ—৯০ ;

: কোথায় শেষ ? এযে অফুরন্ত—

: একটু আগে রমণীয় অরণ্য আছে—

রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি যত্থ ন রমতী জনো।
বীতরাগী রমিস্‌সন্তি ন তে কামগবেসিনো ॥[১]

বীতরাগ, অকামহত যতিগণ সেই অরণ্যে বিহার করেন।

*　　*　　*

বিশ্রামপুরী ! দুঃখের কুয়াশা কাটলো তা হলে।

: আরও আগে।

: তাইতো ! আবার কাঁটা গাছ ! কাঁটার বন !

: বনং ছিন্দথ মা রুক্‌খং বনতো জায়তী ভয়ং।
ছেত্বা বনঞ্চ বনথঞ্চ নিব্বনা হোথ ভিক্‌খবো ॥[২]

বনের প্রত্যেকটি গাছ ও ঝোপঝাড় কেটে ফেলতে হবে। সমগ্র বন পরিষ্কার না হলে এই বন থেকে বেরুনো সম্ভব নয়।

: থকে যাচ্ছি। শত্রুর কি শেষ নেই ?

: নিশ্চয় শেষ আছে ! এখান দিয়ে রাস্তা, এই গুহার পাশ দিয়ে—

: গুহার ভিতরটা তো বেশ ঠাণ্ডা ; একটু চোখ বুজে নিই।

: নেতং সরণমাগম্ম সব্‌বদুক্‌খা পমুচ্চতি।[৩]

আরামের জায়গা এটাও নয়। এখানে ঘুমলে সকল দুঃখের উপশান্তি হয় না।

: শরীরে যে আর কুলচ্ছে না !

: শরীর তো যাবেই একদিন।

*　　*　　*

খরস্রোতা কৃষ্ণতোয়া ! এ আবার কোন্ নদী ? ওপারে যাব কি করে ? খেয়ার নৌকোই বা কোথায় !

(১) ধম্মপদ ৯৯। (২) ধম্মপদ ২৮৩ ; (৩) ধম্মপদ ১৮৯ ;

: সিঞ্চ ভিক্ষু ! ইমং নাবং সিত্তাতে লহুমেস্সতি ।[১]

এই দেহনৌকো থেকে সব কিছু ফেলে দিতে হবে ; নৌকো খালি হলে এমনিই চলে যাবে।

: সব কিছু মানে ?

: স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর—তিনটাই।

: আমার হাত ধরে কেউ নিয়ে যাবে না ?

: তুম্হে হি কিচ্চমাতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা ।[২]

বুদ্ধগণ শুধু রাস্তা দেখাতে পারেন, চেষ্টা যাত্রীকেই করতে হবে ।

: আমি বসলুম নদীর পাড়ে।

: এখানে বসলে তো চলবে না।

সম্পয়াতোসি যমস্স সন্তিকে।
বাসো পি চ তে নত্থি অন্তরা ॥[৩]

এযে যম দুয়ার ! এখানে চটি নেই।

: তা হোক গে। আমি আর পারি না।

: কিচ্ছো বুদ্ধানমুপ্পাদো—বুদ্ধত্ব লাভ সহজে হয় না।

: এই অন্ধকারে যাবো কি করে ? আর রাস্তা নেই ?

: নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়[৪]—দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

: কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না!

: ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কম্[৫]—রাস্তা দেখাবার আলো রয়েছে তো।

: কোথায় ? এ যে অন্তহীন দুস্তর রাত্রি ! নৌকো আর চলে না।

: নৌকোর প্রয়োজন নেই। সেতু আছে—গম্ভীরে চিদ্ ভবতি গাধম্ অস্মে[৬], গহন রাত্রির বুক চিরে বানানো এই সেতু। তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্[৭], দেবগণ এই সেতু পেরিয়ে অমৃত ও অভয়পদ লাভ করেছেন।

: সেতু ? কোথায় সেতু ? অতলস্পর্শী শূন্যতা ! বুক দুড়দুড় করে। ফিরি আমি।

: তার মানে তো মৃত্যু।

: তবে মরি।

: ন চেদ্ ইহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ ।[৮]

---

(১) ধম্মপদ ৩৬৯ (২) ধম্মপদ ২৭৬ ; (৩) ধম্মপদ ২৩৭ ; (৪) শ্বেতাশ্বতর ৩-৮ ; (৫) ঋগ্বেদ ৬-৯-৫ ; (৬) ঋগ্বেদ ৬-২৪-৮ ; (৭) ছান্দোগ্য ১-৪-৪ ; (৮) কেন ২-৫ ;

ঃ হে পরাণসখা বন্ধু আমার! তুমি এগিয়ে যাও; তোমার জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলে ঘুমিয়ে পড়ি…

ঃ সে তো ঘুম নয়, তামিস্র। উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।[১]

*　　　*　　　*

বান ডেকেছে…বিশ্বগ্রাসী প্লাবন…বিরাট মুখব্যাদান করে ঐ আসে ত্রিভুবনসংপ্লাবী প্রলয়পয়োধিজল…

---

(১) কঠ ১-৩-১৪।

তৃতীয় অধ্যায়

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

(খ)

পুরীধাম

(খ)

পুরীধাম

॥ ১ ॥

বিশু মানে বিশ্বনাথ মহান্তী, আমার প্রতিবেশী। পাশের বাড়ীতে থাকে, অনেক কালের পরিচয়, পরিচয় সূত্রে কাকা-ভাইপো। রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস্‌সি পাশ করে স্থানীয় একটি কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত আছে। যুদ্ধে গিয়েছিল, যদিও প্রয়োজন ছিল না; ভিতরে একটা অশান্তপনা আছে···বেপরোয়া ভাব, তোয়াক্কা রাখে না কারু···ওকে ঘাঁটাতেও কেউ সাহস পায়না···আমার সঙ্গে বনে বেশ···ওরই আগ্রহে পুরী আসা। বিশুর বাবা পেনশন নিয়ে আবার চাকরিতে ঢুকেছেন—আছেন ময়ূরভঞ্জে। আজকাল কর্মরত অবস্থায় হৃদশূলে বা রক্তপ্রেসে প্রাণত্যাগ করাই সকলের কাম্য···পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ হচ্ছে সেকেলে আদর্শ; আধুনিকদের মন্ত্র হচ্ছে die in harness···কিমর্থং কস্য কামায়? বাজে প্রশ্ন। ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? ধ্বনি অতি ক্ষীণ···the still small voice—অতিমৃদু, শোনাই যায় না···যা ঢক্কানিনাদ চলছে! শোনবার উপায় নেই···তাঁর ইচ্ছা? যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি?···মনে পড়ে আমার এক অধ্যাপকের কথা···কলকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইংরিজির শিক্ষক ছিলেন; পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে গিয়েছিলুম···অনেক কালের কথা ···গ্যাংগ্রীণের জন্য ফাদার-এর একটি পা কেটে ফেলা হয়েছিল; জ্বর ছিল, যন্ত্রণাও ছিল; তা সত্ত্বেও এম্-এর ছাত্রদের খাতা দেখছিলেন। এ অবস্থায় আর খাতা দেখার হেঙ্গাম পোয়াচ্ছেন কেন, জিজ্ঞেস করলুম; জবাব দিলেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরম পিতার সেবা করে যেতে চাই;···God's will be done! মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠলো···সেদিনই মারা গেলেন···আমাদের কর্মযোগ 'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্'···যাক গে, মরুক গে···বাংলা ভাষার এই ইডিয়মটি কিন্তু চমৎকার। Let be, Hang it জানে দো, মারিয়ে গুলি, ইত্যাদি আছে, কিন্তু 'যাক গে মরুক গে'র ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধি নেই···এক তুড়িতে সব লেঠা চুকিয়ে দেওয়ার অমোঘ অস্ত্র···কোনো অস্ত্রই দেখছি অমোঘ নয়···শত্রু আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়···আবার অস্ত্রপ্রয়োগ···শত্রুবলির আর শেষ নেই?··· যাক গে, মরুক গে! বিশু স্টেশনে ছিল। বিশুদের বাড়ীটি দোতালা, মন্দিরের

কাছে। একজন ঠাকুর ও চাকর তত্ত্বাবধায়ক আছে; নীচেটা ভাড়ায় খাটে, উপরটা নিজেদের জন্য রাখা। বেশ নিরিবিলি। আরামে থাকা যাবে।

* * * *

বঙ্গভূমি নদীমাতৃক দেশ; নদীর সঙ্গে আমাদের আজন্ম পরিচয়। ওপারের গ্রামখানি ঘনমেঘে ঢাকা, এপারে আমি একেলা, গান গেয়ে পাল তুলে তরী বেয়ে মাঝি চলে—চেতনার আনাচে কানাচে এই জল-ছবির রেখাঙ্কন চোখে পড়ে। তবুও মেঘনা দেখে ভয় হতো—মৃত্যুর কালো চোখের অন্তহীন গহন। ভয় হয়, বিস্ময় জাগে না। সমুদ্র ভয়মিশ্র বিস্ময়, mysterium tremendum; মৃত্যু নয় মৃত্যুর পরপার; ব্যক্তরূপে ভয়ঙ্কর, অব্যক্তরূপে বিস্ময়মণ্ডিত। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে একটা পার্থক্য দেখেছি—শুধু পুরীর সাগরকূলে নয়, অন্যত্রও। কল্পনার সমুদ্র অসীম, অক্ষুব্ধ, শান্তির পারাবার; বাস্তব সমুদ্র অপার হলেও ক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী, অশান্ত···স্বর্গদ্বারে বসে ঢেউ গুনছি···প্রলয়ের সমুদ্র! ওতশ্চ প্রোতশ্চ! এই সমুদ্র তার কাছে প্রতীকমাত্র···প্রলয়পয়োধিজলের ভয়টা কিছু কেটেছে···দুর্বাসাজী বলেছিলেন ঠিক···বুদ্বুদের মতো কতো বিশ্ব উঠছে, লয় পাচ্ছে···তাতে আপনার কী?···প্রলয় সমুদ্রে বুদ্বুদ! কে তার খবর রাখে!···মহাশূন্যে স্ফুলিঙ্গ··· ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে···তবুও বেলাভূমির দৃশ্যে চিত্ত ব্যথিত হয়। কেষ্টদাকে দেখতে গিয়েছিলুম; ট্রাম থেকে পড়ে একটা পা কাটা যায়; হাসপাতালে ছিল রাতটা; ঔষধাদির ব্যবস্থা তেমন কিছুই হয় নি···দিল্লী থেকে এক বড় কর্তার নাকি সেদিন আবির্ভাব হয়েছিল···মিটিং, কনফারেন্স, বক্তৃতা, টি-পার্টি, ডিনার, হুজ্জুত···মুমূর্ষু পথচারীকে দেখবার লোক কোথায়?···সকাল বেলা গিয়ে দেখি, ফেকাশে, বিবর্ণ চেহারা···সব রক্তই বোধ হয় বেরিয়ে গেছে··· ছিলই বা কতটুকু?···ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো···চিনতে পেরে থাকবে, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল···তারপর চোখ স্থির···সব শেষ···শেকভের গল্প যেন··· ছেলের অসুখ করেছে··ডাক্তারবাবু এলেন; ইহুদী। রোগীর গায়ে জোঁক লাগানো হলো··"ডাক্তারবাবু! ছেলে যে আর কথা বলছে না?"···আরও জোঁক লাগানো হলো···"ছেলের যে সাড়া শব্দ নেই, ডাক্তারবাবু?" "ঘুমচ্ছে"··· জোঁকগুলো রক্ত খেয়ে ঠোস হয়ে একটার পর একটা গা থেকে পড়ে গেল। ফী ও জোঁক নিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নেন···ছেলের আর ঘুম ভাঙ্গলো না···বাপ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাস্তায় কাঁদেন—Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors···for thine

is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen... আকাশে একখণ্ড সাদা মেঘ...ধীর, মন্থরগতি...রূপ বদলাচ্ছে মেঘটির...উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের মতো সুন্দর পালঙ্ক; সাদা ধবধবে চাদর বিছানো... কেষ্টদা শুয়ে আছে। স্বপ্ন দেখছে? কিসের স্বপ্ন?...পুকুর পাড়, খেলার মাঠ, ধানের ক্ষেত, কদম গাছে শ্রীকৃষ্ণের লাল টুকটুকে পা দু-খানি?...আমাদের কথা হয়তো মনেই নেই...পালঙ্কটা আর দেখা যাচ্ছে না...সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হয়তো চলে গেলো অন্য কোথা আর...সর্বং শূন্যং শূন্যম্...তবুও দুঃখ আসে; বুদ্ধদেবেরও এসেছিল। দুঃখের তাড়নায় ঘর ছাড়লেন, বুদ্ধ হলেন; কিন্তু বাকী জীবনটা আর পাঁচজনকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচাবার কী চেষ্টাই না করলেন!...কার কি হলো জানি না, কিন্তু জীবের দুঃখ সম্বন্ধে দুঃখ-বোধ অমিতাভের ছিলই...সৈকতশয্যার বালি গায়ে না লেগে যায় না...কেষ্টদা আর নেই, কিন্তু 'নেই'র দুঃখটুকু রেখে গিয়েছে আমাদের জন্য...দেখলেই দুঃখ জানলেই দুঃখ ভাবলেই দুঃখ; ঘুমিয়ে পড়লে কোথায় দুঃখ?...সমুদ্রের ঢেউগুলো হয়তো কতো বেদনা নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে, কিন্তু আমাকে তো স্পর্শ করে না!... কেষ্টদার পাশেই আর একজন রোগী মারা গেল; তার কথা তো ভাবছি না...দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছি বলেই দুঃখ...যদি আলাদা থাকি?...যেমন বেলাভূমি থেকে, ঢেউগুলো থেকে, পথচারীদের থেকে আলাদা হয়ে আছি?...এই শরীরটাই বা কি?...বাল্যের সুকুমার দেহ এখন কোথায়? যেটিকে নিয়ে কাজ চালাচ্ছি এখন, সেটিই বা আর ক'দিন?...কেষ্টদার মতোই তো ছেড়ে যেতে হবে! মন? প্রতিমুহূর্তেই বদলাচ্ছে...ভাতের হাঁড়ির ভুড়ভুড়ির মতো, যতক্ষণ আগুন ততক্ষণ আছে...আগুন নিবলেই চুপ!...ঘুমিয়ে যখন পড়ি তখন কে কোথায় থাকে? সব সম্পর্কই ডুবে যায়!...কিছুই থাকে না... কিন্তু আমি থাকি...দৃশ্যকে ডুবিয়ে দিয়ে আমি একেলা...দ্রষ্টা...দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ...

*   *   *   *

মৃত এ জগৎ!...জড় এ দৃশ্যপ্রপঞ্চ...সত্ত্ব থেকে পুরুষ অন্য...দ্রষ্টা...দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ...সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ...

॥ ২ ॥

Infinity in the palm of your hand...ব্লেইক (**Blake**) মিস্টিক ছিলেন.. বিবেকখ্যাতি হয়েছিল ওঁর?...সত্ত্বং বুদ্ধিঃ, পুরুষঃ আত্মা, অন্যতা ভেদঃ,

খ্যাতির্জ্ঞানম্‌···প্রকৃতি থেকে পুরুষ আলাদা এই জ্ঞানে প্রকৃতির উপর পুরুষের স্বামিত্ব সিদ্ধ হয়···প্রকৃতি প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক; প্রকৃতি জড়, দৃশ্য··· পুরুষ চেতন, দ্রষ্টা···পুরুষ প্রভু, বিভু···প্রকৃতি পরার্থা, পরবশ্যা···Infinity in the palm of your hand···বিশ্বজগৎ হাতের মুঠায়···প্রপঞ্চ করামলকবৎ আত্মাধীন···সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ···Infinity in the palm of your hand···স্বামিত্ব সিদ্ধ হয়···দ্বৈত থেকে যায়···কিন্তু বহুপুরুষবাদ তো প্রমাণিত হয় না···যাবতীয় জগৎপ্রপঞ্চ যখন দৃশ্য কোটিতে চলে যায় তখন বহুপুরুষও দৃশ্যে অন্তর্ভুক্ত···সাক্ষী চেতা কেবলো—এক দ্রষ্টা ··দ্রষ্টার নিকট তো সবটাই দৃশ্য··· ব্যবহারে বহু পুরুষ আছেন, কিন্তু সমগ্র ব্যবহারই তো প্রকৃতিনিষ্ঠ···ব্যবহারিক বহু পুরুষ তো অবিবেকজন্য, সুতরাং তাঁদের "পুরুষ" বলা চলে না—প্রকৃতির লীলা-চাতুর্য মাত্র···সাংখ্যের বিবেক দ্বারা একজীবত্ব সিদ্ধ হয়, কেবলত্ব সিদ্ধ হয়; বহুপুরুষত্ব দাঁড়ায় কি করে?···দেখি, মাষ্টারমশায় চিঠির উত্তরে কি লেখেন। ···বিবেকখ্যাতি হচ্ছে নির্বিকল্পক[১] জ্ঞান—প্রকৃতি পৃথক্‌বৎ দৃষ্ট হয়, পৃথক্ হয় না। ঘট যেমন পট হতে ভিন্ন, প্রকৃতি তেমনি দ্রষ্টা থেকে ভিন্ন হয় কৈ? ভিন্ন হলে প্রকৃতির প্রকাশই হতো না। ভিন্নবৎ আর ভিন্ন এক জিনিস নয়। 'বৎ'-টুকু থাকে বলেই কি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রয়োজন? ···মাষ্টার মশায় বড্ড চাপা, লোকে···প্রশ্ন না করলে—

: কাকা বাবু! কাল ভুবনেশ্বর যাওয়ার ব্যবস্থা করে এলুম। মিশনে থাকবো; চেনা আছে; অসুবিধা হবে না।

: হলোই বা একটু অসুবিধা···এক-আধ রাত্তিরের ব্যাপার তো!···কী আর এমন অসুবিধা হবে!

: পুরী কেমন লাগছে?

: ভালোই তো।

: ক'দিন আপনাকে একটু আনমনা দেখছি!

: তীর্থে এসে ভগবানের নাম নিয়ে থাকতে হয়।

: ভগবান সত্যিই আছেন?

: কি জানি!

: তবে কাঁর নাম নিয়ে আছেন?

---

(১) নির্বিকল্পকংতু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্ (বেদান্ত পরিভাষা ১-২২

ঃ আরও শক্ত প্রশ্ন।

ঃ জবাব দিচ্ছেন না ; পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন।

ঃ ঈশ্বর থাকলেই বা তোমার লাভ কি, আর না থাকলেই বা ক্ষতি কি ?

ঃ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন নয়।

ঃ সোক্রাতেস ও ভাবেই উত্তর দিতেন—প্রশ্ন করে।

ঃ আচ্ছা, উত্তর দিচ্ছি আপনার প্রশ্নের। বর্তমান শিক্ষায় অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয় শুধু গুদামজাত করবার জন্য—যেমন কোন্ নদী সব চাইতে বড়, কোন্ পর্বত সব চাইতে উঁচু, কোন খেলোয়াড় সব চাইতে বেশী 'রান্' করেছে, বিশ্ববক্তাদের ভিতর কে শ্রেষ্ঠ চ্যাটারবক্স্ (chatter-box), কালো ব্যাপারীদের ভিতর কোন্ শ্রেষ্ঠীর বেশী টাকা···এসব জেনে লাভও নেই ক্ষতিও নেই ; লাভ-ক্ষতি নিরপেক্ষ হয়ে জ্ঞানার্জনের নামই তো liberal education (লিবারেল এডুকেশন) ?

ঃ একটু পার্থক্য আছে। যে সব তথ্যের উল্লেখ করলে সেগুলো সাধারণ প্রমাণের আওতায় আসে। ঈশ্বরীয় তথ্য আসে না, অর্থাৎ সাধারণ categories of knowledge এর বাইরে। কাজেই ঈশ্বরের খবরাখবর ও ভাবে সংগ্রহ করা যায় না।

ঃ কি ভাবে যায় সংগ্রহ করা ?

ঃ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—মহাজনরা বলতে পারেন।

ঃ এখানেও মহাজন ?

ঃ যাঁদের কাছে যে বেসাত আছে তাঁদের কাছে সেই বেসাতের জন্য যেতে হবে বৈ কি ? বিজ্ঞানের মহাজন যেমন নিউটন, আইন্স্টাইন্ প্লাঙ্ক, ইত্যাদি, তেমনি এ জিনিসের মহাজন বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য—

ঃ উড়িষ্যার ক্ষাত্রধর্মের অবনতির জন্য অনেকে মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মকে দায়ী করেন।

ঃ আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। যেমন ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির পতনের জন্য বুদ্ধদেবকে দায়ী করা হয় ; ইওরোপে তামসিক যুগ (Dark Age) এসেছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের জন্য। বর্তমান কালে গান্ধিবাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে তার জন্য দায়ী আমরা, কিন্তু উত্তরকালে দোষী করা হবে হয়তো মহাত্মাজীকেই।

ইতিহাসের গতিচ্ছন্দ অত্যন্ত রহস্যময়[১]...জুলিয়স সীজারকে হত্যা করা হলো সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য, ফল হলো সাধারণতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া... ইওরোপবাসীদের গৃহযুদ্ধ ছিল এশিয়া-আফ্রিকা-রূপ আপেলের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে, কিন্তু পরিণাম হলো এশিয়ার স্বাধীনতা। আফ্রিকার ভাগ্যোদয় হয়তো হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যদিও কার্যকারণ নির্দেশের দিক্ থেকে কোনোই অবশ্যম্ভাবিতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের হেতুস্থাপনে থাকে হেত্বাভাস। কার্যকারণের সিঁড়ি ভেঙ্গে একটু এগলেই দেখা দেয় অনবস্থা দোষ, অর্থাৎ ১৯৪৭এর কারণ ১৯৪৬, ১৯৪৬এর কারণ ১৯৪৫, ১৯৪৫এর কারণ ১৯৪৪...; অথবা আসে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ, মানে এশিয়ার স্বাধীনতার কারণ হিটলার-তজো; হিটলার-তজোর আবির্ভাবের কারণ এশিয়ার পরাধীনতা[২]। আসলে ইতিহাস হচ্ছে পুরাণস্থানীয়—বিজ্ঞাতের জ্ঞাপন আছে; তত্ত্বনিশ্চয় নেই। ইতিহাস শাস্ত্র নয়।

: শাস্ত্র মানে?

: যে তত্ত্বনির্দেশ করে এবং তত্ত্বলাভের উপায় বলে দেয়—যেমন বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা truth এবং সেই তত্ত্বে পৌঁছবার প্রক্রিয়া বা technique; অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে যেমন মায়াবাদ একটি তত্ত্ব—

: অনেকে তো বলেন মায়াবাদই ভারতের সর্বনাশ করেছে।

: তা বলেন ঠিকই। বৈষ্ণবরা আবার বলেন, বৈকুণ্ঠে মুক্তদের জমায়ত দেখে শ্রীহরি আচার্য শঙ্করকে পাঠিয়েছিলেন দুষ্ট মায়াবাদের প্রচারের জন্য, যার ফলে লোক নিরয়গামী হচ্ছে এবং বৈকুণ্ঠের খাদ্যসমস্যা তিরোহিত হয়েছে। এসব শুধু লৌকিক কল্পনা, বুদ্ধকথিত সম্মাদিট্‌ঠি বা সম্যক্ দৃষ্টি নয়।

: বুঝি না। বুঝি এই যে আমরা দুঃখ পাচ্ছি। আর ঈশ্বর যদি আছেন তবে তিনি দেখেও দেখেন না; অর্থাৎ নির্দয়।

: তোমার আবার দুঃখটা কিসের? বৃদ্ধের মতো—

(১) 'ইওরোপের ইতিহাস' এর ভূমিকায় ফিশার লিখেছেন—"I can see only one emergency following upon another as wave follows wave, only one great fact with respect to which, since it is unique, there can be no generalisations, only one safe rule for the historian: that he should recognize in the development of human destinies the play of the contingent and the unforeseen."

(২) ঐতিহাসিক টয়নবি বলেন—স্বখাত সলিল; "We are betrayed by what is false within" (A Study of History)। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়।

ঃ আছে দুঃখ, কাকাবাবু। বলবো একদিন। সেজন্যই ভাবি—জীবন, মৃত্যু, ঈশ্বর, আত্মা, এসব কথার সত্যিই কোনো মানে আছে, না গোটাটাই ধাপ্পাবাজি ?

ঃ মহাজনদের কথায় শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসে না ?

ঃ কী যে বলেন তাঁরা—বোঝাই মুস্কিল।

ঃ মৌলিক একটি তত্ত্ব আছে। শাস্ত্রাদিতে এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা হয়েছে—যুক্তি, রূপক, গল্প, ইত্যাদির মাধ্যমে বাক্য ও মনের যিনি অতীত তাঁকে উপলব্ধির গোচরে আনবার কতো যে প্রয়াস হয়েছে। ধর জগন্নাথদেবের মন্দির। মন্দির গাত্রটি জগতের রূপক ; বিভিন্ন স্তরে জগতের বিভিন্ন রূপায়ণ ; শীর্ষদেশে অমৃতকলস ; গুহার অভ্যন্তরে অন্তর্যামী জগন্নাথ।

ঃ কামচিত্র কেন ?

ঃ জগন্নাথের গাত্রে আছে বলে। অলঙ্কারশাস্ত্রের আদি রস, যে রস থেকে জগতের উৎপত্তি···প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাম্।

ঃ ওটাকে বাদ দেওয়া যেত না ?

ঃ মন্দিরগাত্রের অঙ্গহানি হতো। ঐতিহাসিক অন্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আর্ট-এরও একটা দিক আছে।

ঃ বুঝি না। হেঁয়ালি মনে হয়।···বিশেষতঃ ধর্মকথা···সেদিন সহকর্মীদের ভিতর তর্ক হচ্ছিল সারেণ্ডার (Surrender) নিয়ে। আজকাল নাকি একথাটি খুব চালু। দর্শনের অধ্যাপক বলছিলেন, অনেককাল দাসত্ব করেছি আমরা—দাস মনোভাবের উদ্গার। সংস্কৃতের অধ্যাপক বলছিলেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ; দুর্বোধ্য। একজন রোগা মতো ক্ষ্যাপাটে গোছের নূতন সহকর্মী এসেছেন আমাদেরই বিভাগে ; তিনি বলছিলেন, 'Supermind ; descent of God ; subliminal' কী-যেন ; অত্যন্ত দুর্বোধ্য। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কে সারেণ্ডার করবে, কি জিনিস সারেণ্ডার করবে, কার নিকট সারেণ্ডার করবে, ঐ প্রশ্ন কটির উত্তর দিন তো। তুমুল তর্ক ; ভাষা দুর্বোধ্য ; অর্থ ততোধিক ; তারপর ঘণ্টা পড়লো ; যে যার ক্লাসে চলে গেলেন···আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল কথার আড়ালে বিরাট এক প্রবঞ্চনা চলছে।

ঃ তোমার প্রশ্ন কিন্তু চমৎকার হয়েছিল—সারেণ্ডারের সমস্যা সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

: তা না হয় হলো ; কিন্তু উত্তর কোথায় ?

: এসব প্রশ্নের ঠিক রেডি-মেড্ উত্তর নেই। নিজে ভেবে নিজের উত্তর বার করতে হয়।

আপনি ভেবে কী উত্তর পেয়েছেন ?

সে-তো আমার উত্তর—তোমার পক্ষে সেটি উত্তর না-ও হতে পারে।

তবুও শোনা যাক না ! বুঝিয়ে বলুন।

সরকারী টাকা সারেণ্ডার করতে হয় জানতো ?

খুব জানি। মার্চ মাস এলেই বাবা সারেণ্ডার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সারেণ্ডার মানে স্বত্বত্যাগ। রাজপুরুষ টাকার উপর স্বত্ব ত্যাগ করে সরকারকে টাকা ফিরিয়ে দেন। তেমনি ধর, তোমার মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভৌতিক দেহ, সবকিছুই ঈশ্বরের ; তুমি শুধু এদের ক্রিয়াকৌশলের দ্রষ্টা, যদিও ভাবছ দেহেন্দ্রিয়াদি সব কিছু তোমারই। মহাজনরা বলেন, দেহেন্দ্রিয়াদি আমার—এই অভিমান থেকেই আমাদের সব কিছু দুঃখ। সুতরাং সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে ঈশ্বরের জিনিস ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দাও ; তুমি থাকবে এই দানক্রিয়ার দ্রষ্টা বা সাক্ষী হয়ে ; এর নামই সারেণ্ডার, যার ফলে আসে পরম শান্তি। অর্থাৎ জগন্নাথ দেবই মালিক ; দেহমন্দিরটি তাঁরই ; সম্প্রদান পূর্ণ হলে জগৎ সংসার জগন্নাথ দেবের মন্দিররূপে প্রতিভাত হবে, আর যিনি সম্প্রদান করেন তিনি দ্রষ্টা হয়ে শ্রীভগবানের লীলা দর্শনে সমর্থ হন। আমরা স্বত্বত্যাগ করতে পারি না বলেই দুঃখ পাই। অথচ মৃত্যুতে সব কিছু ত্যাগ করতেই হয়।

: ঠিক বুঝলুম বলতে পারি না। কোথায় ঈশ্বর, তাঁকে দেবোই বা কি করে, দেহ-মন-বুদ্ধি এসব আলাদাই বা কি ভাবে করি—

: কী দরকার এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ?

: আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?

: শেলী (Shelley)র নিকট জগৎটা ছিল নানা রংএর ফানুস। জীবনের তাগিদ অনুযায়ী এর রং বদলায়—এক রং ডুবে যায়, আর এক রং ভেসে ওঠে। Sufficient for the day is the "colour" thereof—রামধনুর কোন্ রংটা সমূহ দরকার এটাই হচ্ছে জীবনের ও জীবনশিল্পীর আসল প্রশ্ন। যখন কোনো রং-এরই আর প্রয়োজন থাকবে না তখন হয় তো বা দেখা দেয় নির্মল নিরঞ্জন আকাশ বা শ্যামসুন্দর। তোমার যেটা সমস্যা তার সমাধানেই জীবনের সার্থকতা।

: তাই বা জানি কোথায় ? কজনাই বা জানে তার জীবনের সত্যিকার প্রশ্ন কী ?

: অন্ধভাবে জানে, এবং সেভাবেই হাতড়ে হাতড়ে চলে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্যাটিকে পরিস্ফুট করে তোলা। স্পীয়ারম্যান সাহেব (Faculty Psychologyর ব্যাখ্যাতা Spearman) বলেন প্রত্যেক জীবনেরই একটি স্বধর্ম আছে, যেখানে সে অদ্ভুতকর্মা হতে পারে ; কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করলে সে হয় গোবরগণেশ।

: বর্তমান শিক্ষায় কি স্বধর্ম ধরিয়ে দেওয়া হয় ?

: অন্ততঃ আমাদের দেশে নয়।

: তা হলে উপায় ?

: বলা শক্ত…হয় তো এই অন্ধকারেও বিদ্যুৎপ্রভার মতো কতকগুলি সংস্কার দেখা দেয়, যদিও সংসারের ঝড়বাদলে শেষ পর্যন্ত সেগুলো অদৃশ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু স্থিরচিত্তে এই ক্ষণপ্রভাকে ধরে এগলে দৃষ্টি হয় তো খুলে যেতে পারে।

: আমার দুঃখ কিসের—বলছিলেন না ? সেকথাটাই বলবো। ছোটবেলা মাকে হারিয়েছি…একান্তে আকাশের দিকে অনেক সময় তাকিয়ে থাকি…মনে হয় তারার দেশে তারার মত পলকহীন চোখে আমার দিকে মা চেয়ে আছেন, তাঁর স্নেহ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে চলেছেন, আশীর্বাদ দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন।

: খুব শুদ্ধ ভাবনা ; এ ভাবনাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।

: মাকে হারানো জীবনের একটা বড় অভিশাপ নয় ?

: মাকে হারিয়ে যে ভাবনাটি পেয়েছ সেটিই তো পরম আশীর্বাদ। ওটি তোমার জীবনের ক্ষণপ্রভা, কোনো অবস্থাতেই এর নির্দেশ অমান্য করবে না।

: কী আর এমন সার্থকতা এর ?

: আছে সার্থকতা। জীবনের সব ঝড় ঝাপটা থেকে এই ভাবনাই তোমাকে রক্ষা করবে…এবং ভাবনা পরিশুদ্ধ হলে তোমার মা-ই বিশ্বজননীর কল্যাণ মূর্তিতে দেখা দেবেন।…ভাবনার এই নক্ষত্রপথে চল ; দেখবে মনের অশান্তপনা কেটে গেছে, জীবনে নেবে আসছে জননীর শান্তিময় আশীর্বাদ…

॥ ৩ ॥

বিশু একটি মোটর গাড়ী যোগাড় করেছে—আমারই মতো ; কবে যে যাত্রা সুরু করেছে বলা কঠিন, তবে হঠাৎ যে হৃৎশূলে যাত্রা সাঙ্গ হতে পারে

তা সহজেই অনুমান করা যায়।···সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া, আকাশে মেঘ, কায়ক্লেশে গাড়ীর এগিয়ে চলা···বেশ লাগছে···মনে হচ্ছে আবার যেন হরিদ্বার যাচ্ছি···বিশু ড্রাইভ্ করছে, যুদ্ধের সময় এ বিদ্যায় হাত পাকিয়েছিল···

: কাকাবাবু আজকাল খুব তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন, না ?

: খুব আর কোথায় ?···তবে হ্যাঁ, ঝোঁক আছে।

: কী আর আছে তীর্থে ? কতকগুলো ভাঙ্গা, জীর্ণ মন্দির। ভিখিরী আর পাণ্ডা বাদ দিলে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

: সে জন্যই তো ভালো লাগে।

: বাস্তব জীবনকে এড়িয়ে চলতে ?

: চিত্তরাগ আসে বয়োধর্মের খাতিরে। আজকে যাকে ধরে চলি কালকে তাকে ছাড়তে হয়—জীবনেরই তাগিদে। এই গাড়ীটাই ধর—

গাড়ীটাকে না ধরাই উচিত ছিল···বেখাপ্পা একটা আওয়াজ করে গাড়ীটা থেমে গেলো।

: ঐ চায়ের দোকানটায় বসুন কাকাবাবু। গাড়ীটা ঠিক করে নিই···বিশেষ কছু হয়নি···

: কালকের ডাকে কোনো চিঠি এসেছিল ?

: তাইতো ! ভুলেই গিয়েছিলুম। আছে আপনার একখানা চিঠি।

: রাস্তার ধারের চা সব সময়ই ভালো লাগে। চা খেতে খেতে মাষ্টার মশায়ের চিঠি খানা পড়ি।

"···চিত্তনদী অবিবেকবিষয়নিম্না হলে সংসারের দিকে প্রবাহিত হয়, বিবেকনিম্না হলে কৈবল্যের দিকে প্রবাহিত হয়···'চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী··· যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা···সংসার প্রাগ্‌ভারা অবিবেক বিষয়নিম্না পাপবহা'।[১] বিবেকনিষ্ঠ চিত্তের প্রান্তভূমি কৈবল্য— 'তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্'।[২] কৈবল্যের পথে বিবেক পরিপাক হেতু ধর্মমেঘ নামক সমাধি দেখা দেয়; সামর্থ্য বিশেষ অর্থে 'ধর্ম', কৈবল্যফলবর্ষী অর্থে 'মেঘ', একত্রে ধর্মমেঘ। ধর্মমেঘের সুশীতল ছায়া সেবন করলে পরবৈরাগ্য সিদ্ধ হয়। পরবৈরাগ্য এবং কৈবল্য অবিনাভাবী। সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে ইহাই পরম অবস্থা···বৈদান্তিক

(১) পাতঞ্জল ১-১২ (ব্যাসভাষ্য), (২) পাতঞ্জল ৪-২৬

আচার্যগণ বলেন, পূর্বোক্ত রাস্তায় প্রকৃতি সুপ্ত হয়, নষ্ট হয় না। কিন্তু মুক্তির জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির প্রধ্বংসাভাব। প্রকৃতি যদি নিত্যবস্তু হয় (সাংখ্য মতে নিত্যবস্তু) তবে তার প্রধ্বংসাভাব কোনো কালেই সম্ভব নয়; প্রকৃতি যদি অবিদ্যক হয় তবে জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার নাশে প্রকৃতিরও নাশ হয়। জ্ঞান মানে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই স্বরূপানুভূতি·· সুতরাং মহাবাক্য বিচারের উপরই জোর দেওয়া উচিত…তত্ত্বনিশ্চয়ের ফল দেহান্তে মুক্তি, তত্ত্বনিষ্ঠা বা স্থিতপ্রজ্ঞত্বের ফল জীবন্মুক্তির প্রশান্তবাহিতা বা ধর্মমেঘ। ইহাই বেদান্তাচার্যগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রথমে তত্ত্বনিশ্চয়, পরে তত্ত্বাবগাহিতা—এই হলো পুরুষার্থ।…তত্ত্বে স্থিতিলাভ বা দৃঢ়ভূমিত্ব দীর্ঘকাল এবং নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা সম্পন্ন হয়।'…

আপনার যুক্তি ঠিকই; সাধুরাও বলেন, বিবেকখ্যাতি দ্বারা একজীববাদই দাঁড়ায়…আর একটা দিক আছে; ভগবৎলীলাদর্শনের ক্ষেত্রে বহুজীববাদের সার্থকতা আছে…

কিছুদিন আগে একজন মহাত্মা আমাকে একটি বেদমন্ত্রদ্বারা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সেই আশীর্বাদ আপনাকে পাঠাচ্ছি—

তুভ্যম্ উষাসঃ শুচয়ঃ পরাবতি—আপনার অর্চিপথে উদ্ভাসিত হক শুভ্র হতে শুভ্রতর নব নব উষা।"

ইতি—

* * *

মিশনে জিনিসপত্র রেখে, মোহন্তজীর সঙ্গে সৌজন্য সম্ভাষণ সেরে প্রণাম করে ও আশীর্বাদ নিয়ে গাড়ীতে এসে বসেছি। মন্দির দর্শনে যাবো, কিন্তু গাড়ী স্টার্ট কিছুতেই নেয় না। হৃদ্‌যন্ত্র আর সক্রিয় হবে কিনা ভুবনেশ্বর জানেন। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি দেখবার সুবিধা হবে বলেই গাড়ীটাকে যোগাড় করা হয়েছিল…কিন্তু যা অবস্থা দেখছি তাতে কাল পর্যন্ত গাড়ীটি চালু হবে কিনা সন্দেহ…ভালোই হলো। পায়ে হেঁটে না বেড়ালে তীর্থযাত্রা নিষ্ফল হয়। মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে যাতায়াতের কাজটা সম্পন্ন হয় তীব্র বেগে, অস্থির গতিতে;

(১) পাতঞ্জল ১।১৪ ; সেতু দীর্ঘকাল নিরন্তর্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।

কাজের তাগিদ ও সময়ের অভাব থাকলে এর প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তীর্থে এসে আর পাগলামি কেন? আগেকার দিনে বাধ্য হয়েই তীর্থ করতে হতো পদব্রজে। ধীরে আস্তে পথ চললে মনের নিত্যনৈমিত্তিক কুয়াশাটা ধীরে-আস্তে কাটে, এবং চিত্ত অনিমিত্ত রসে নিষিক্ত হওয়ার খানিকটা সময় পায়। বর্তমানকালে দেখি শুধুই বেগের তাড়না, ক্ষ্যাপামিকে এড়াবার জন্য আরও ক্ষ্যাপামি…ঝড়ো হাওয়ার মতো যাতায়াত শেষ করে, মনের যে খোলসটি নিয়ে বেরুই সেটিকে নিয়েই তীর্থ করে বাড়ী ফিরি। গোগ্রাসে ভক্ষণ ও "ধনক্ষয়ঃ" —পিছনকে আর পিছনে ফেলা সম্ভব হয় না…বিশু গাড়ী নিয়ে লেগে গেছে… একাই চলছি মন্দিরের দিকে। রাস্তা নির্জন…চারদিকে বনানীর শ্যামল স্নিগ্ধতা…হাওয়াতে মাঝে মাঝে ধুলো ওড়ে…দু-চারটে পাখীর ডাক শোনা যায়…স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি…পুরীর আবহাওয়ায় ব্যস্ততা লেগেই আছে— সমুদ্রের গর্জন, যাত্রীর আনাগোনা, মন্দিরের কোলাহল, হাটবাজার, বেচা-কেনা হই-চই…তবুও নিত্যিকার জগৎ নয়; রেলস্টেশনের মতো—লোক আসে, লোক যায়…সাগর কুলের ঢেউ, অনবরত আসে আবার কোথায় তলিয়ে যায়…যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ…গতির ছন্দ—অনিত্য, শূন্যাধিষ্ঠিত। পুরীর ছবিতে কালের গভীরতা নেই, আছে দেশের পটভূমিকায় গতাগতির স্বাপ্নিক মন্দাক্রান্তা—আকাশের গায়ে যেমন মেঘ জমে, মিলিয়ে যায়, আবার ঘনঘটা আবার নীলিমা। ভুবনেশ্বর নিমজ্জিত হয়ে আছে কালের অথৈ জলে·· বাঁ পাশ দিয়ে একটা রাস্তা বাউল সুরের তান ধরে এঁকে বেঁকে কোথায় চলে গেছে… পুরনো একটা মেটে বাড়ী, নূতন চুনকাম হয়েছে—জন্মজন্মান্তরের তীর্থাবাস!… সেকেলে ঐ আশ্চর্য গাছটির নীচে বিশ্রান্তি ঘুরিয়ে পড়েছে টোড়িরাগের আবেগে… দূরের ভাঙ্গা মন্দিরটি হারানো মেঘমল্লারের স্বপ্নে বিরহবিধুর…পাশে একটি পান্থশালা—'পার উতর গয়ে সন্ত জনা'র চিরন্তন সাক্ষী…পথের এই ধুলোতে আছে কতো পূরবী…ইমন…ছায়ানট…আড়ানা…জয়জয়ন্তী…শঙ্করা…বেহাগ …একটা মঠ; এ-পাশে ও-পাশে এককালে দালান ছিল, এখন ভাঙ্গা ইটের স্তূপ। মেঘের ছায়া পড়েছে মাঠটার উপর—নিত্যকালের ছায়া…ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে যায় অচেনা একটা পাখী…আধঘুম আধজাগরণের চেনা অচেনা সুর হাওয়ার মতো পরশ দিয়ে মিশিয়ে যায়…ভাঙ্গামন্দির…মেটে বাড়ী…অশথ গাছ …ঘুমন্ত মাঠ…পথের ধুলো…পান্থশালা…পাখীর অলস রব…ডুবে আছে সব কালের নিস্তব্ধ সুরসাগারে…

ভুবনেশ্বরের মন্দির! অতীতের ন্যায় ধূসর, নির্জন, সমাহিত। মন্দিরগাত্রে অতীতের পাষাণবদ্ধ কাহিনী···মানুষের সুখদুঃখ ও যুদ্ধবিগ্রহ জন্মমৃত্যুর নানা ছন্দে গাঁথা·· এখানে ওখানে প্ররূঢ় বটশিশুর দৌরাত্ম্য· ·কাকের নিঃসঙ্গ রব। মহাকালের স্বপ্নমণ্ডিত সুপ্তপুরী···বোঁ বোঁ বোঁ···একটা ভোমরা সানাইর একটানা সুর বাজিয়ে চলছে···বোঁ বোঁ বোঁ···সিঁড়ি ভেঙ্গে চলছি···বোঁ বোঁ বোঁ ···অথৈ সমুদ্র···

* * *

: কি বলছেন ?

: বোঁ···বোঁ···বোঁ

: এঁ্যা ?

: বোঁ···বোঁ···বোঁ

: হুঁ—

: কানে কম শোনেন নাকি মশায় ? দেয়াশলাই আছে তো দিন ; হুঁ করে—

: নেই তো দেয়াশলাই !

: রসিকতা হচ্ছিল ? লোকটা···তাইতো ! ঐযে এক ভদ্রলোক সিগরেট খাচ্ছেন ; দেখি—

* * *

···বাজার থেকে তেল কিনে, ভালো করে গা-হাত-পায় তেল মেখে স্নান করলুম। কানে তালা লেগে গেছে···ভোমরাটা হঠাৎ থেমে গেলো আর ঝুপ করে পড়ে গেলুম···ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের গানে এজাতীয় অবরোহণ আছে···সুরটা খুব উঁচুতে চড়িয়ে আদিম যুগে নিয়ে যায়, তারপর আচমকা ছেড়ে দেয় খাদে··· কানে তেল দিয়ে খুব নাইলুম। প্রাণটা বেঁচে গেলো। পুরীতে তো স্নান নয়, লড়াই ; আর নাকে, কানে, মুখে নুন ও বালি। এখানে আরাম করে, সাঁতার কেটে, নিশ্চিন্তে ডুব দিয়ে, স্নান সেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিশনে যখন ফিরলুম তখন বেলা প্রায় দুটো। মিহি চালের ভাত, ঘি, ভাজা, সোনা মুগের ডাল, চিংড়িমাছ, আলুপটলের ডালনা, দই, আম, পায়েস···সাধুরা খান ভালো। বিবেকানন্দ স্বামী এক গুরুভাইকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "তুই সাধন ভজন কী

করবি ? না খেয়ে না খেয়ে তো মগজটা শুকিয়ে গেছে ! রোজ দু বেলা মাংস খাবি, আর পারিস তো রুই মাছের মাথা। মগজটার আগে পোষ্টাই হক, তারপর ধ্যান ধারণা করবি।"

॥ ৪ ॥

আহারের পর একটু গড়াগড়ি না দিয়ে আর পারি না আজ কাল ; বিশেষতঃ গুরুভোজনের পর। বারান্দায় শুয়ে শুয়ে মেঘ দেখছি। মন্দ মধুর হাওয়া-টুকুও নেই, শুধু মলিন ধূসর মেঘ আর গুমট ভাব ; গাড়ীটা না আনলেই হতো···সর্বক্ষণ ওটার পিছনেই লেগে আছে বিশু···কিছু সুরাহা হবে বলে মনে হচ্ছে না···দেয়াশলাই দিতে পারলুম না, ভদ্রলোক বেশ চটেছেন··· কী আর করা···মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অসীম নীল, অপার সমুদ্র···ঐ মেঘটুকুতো বেশ দেখাচ্ছে। যেন একটি দ্রাক্ষা স্তবক···পেশোয়ারীদের দোকানে আগে আঙ্গুর পাওয়া যেতো ছোট্ট কাঠের বাক্সে—ভিতরে তুলো, তার ভিতরে নরম, মিষ্টি, গরম আঙ্গুর···মাষ্টার মশায়ের মতো···বড্ড নরম···আঙ্গুর নয় অমৃত ফল···জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মতো মাঝখানের ঐ মেঘটি···দার্জিলিং-এর মেঘ-বৃষ্টি, আলো-ছায়া, পর্বতের অন্তহীন বিস্তার প্রাণে জাগায় পথ চলার আদিম সুর···পুরীর আকাশ, মেঘ, যাত্রী, সমুদ্র, মন্দিরের বিপুল কম্পন—সব কিছুতে বাজে দরবারী কানাড়ার আবেদন : 'অন্ত দেত সুখধামকে'।··· পুরী ও ভুবনেশ্বর ! পার্থক্য আছে—বিষ্ণু ও শিবের পরিকল্পনায় যে পার্থক্য। পুরীতে জগন্নাথদেবের রাজ-ঐশ্বর্য, রাজকীয় সাজসজ্জা, যাত্রীদের অবিশ্রান্ত গতি, কীর্তনের উদ্বেলতা, সমুদ্রের তাল দিয়ে চলা। শিব যোগীশ্বর, সর্বত্যাগী, ধ্যানমগ্ন, প্রশান্ত। পুরীতে আকাশের অসীমতা, ভুবনেশ্বরে কালের অতলতা। আকাশের অসীমতা বুঝি এই জন্য যে আকাশে, সমুদ্রে তার ব্যক্ত রূপায়ণ দেখি। কালের আনন্ত্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—ব্যক্ত রূপায়ণ নেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল রেশ ধরে এগলে চেতনায় একটা অব্যক্ত সাড়া জাগে··· অশব্দম্ অস্পর্শম্···উপশান্তি···

মেঘ ? না, জগন্নাথদেবের মন্দির ! আলোতে ঝক ঝক করছে ! বিরাট জগৎ-জোড়া মন্দির ! কী ভিড় ! রথযাত্রা ! রাজ্যের লোক এসে জড় হয়েছে ;··· গাড়ী, ঘোড়া, সিপাই, লস্কর, হাতী, চামর,···ঢাক ঢোল···ভেঁপু···জগঝম্প··· খোল করতাল··কেষ্টদা খোল বাজিয়ে কীর্তন করছে 'যাদের হরি বলতে নয়ন

ঝরে তারা দুভাই এসেছে রে'···ভিড়ের মাঝখানটায় ভজন চলছে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'···মহাত্মাজী !···নিত্যকালীও এসেছে—রাফেইয়লের মাতৃমূর্তি ···চোখে অসীম করুণা ; কোলে পরমতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে ছেলেটি···জগাদা হুইসল্ দিচ্ছে···ফাউল শট···এই ভিড়ে কি খেলা যাবে ?

: এই যে মণিদা !

: বসো। Prometheus Unbound-এর একটু বাকী আছে—

To suffer woes which Hope thinks infinite ;
To forgive wrongs darker than death or night ;
To love, and bear : to hope till Hope creates
From its own wreck the thing it contemplates.

: দয়ালদা নৌকো নিয়ে এসে গেছেন। চলুন···আজকে মল্লার, মণিদা···

: যে গরজে গগন মেঁ ঘোর বাদল ঘিরি আয়ে। মেহা কী ঝরিয়াঁ লাগী রিমঝিম ঘন মাঁহি, চপলা চমকায়ে ॥

···এবারকার বর্ষায় কী জলই না হয়েছে···বাড়ীগুলো সব জলে ভাসছে··· ভোলাদা ডালে বসে পা ঝুলিয়ে গাইছে 'পাখী ঐ যে গাহিল গাছে'···গাছগুলোর আজ কী তৃপ্তি···জলে ডুব দিয়ে আরামে ঘুমচ্ছে···সেরেছে !···ভোলাদা জলে ডাইভ্ করলো···গেল কাপড়-চোপড় ভিজে···শীত শীত করছে···জেগে গেলুম। বৃষ্টির ছাট আসছে। পায়ের দিকটা ভিজেছে। বিছানা গুটিয়ে উঠে পড়ি।

॥ ৫ ॥

মেঘ অনেকটা কেটেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ ; তারাও উঠেছে···অন্ধকার নেই ; আছে আলোর আভাস···একাকার হয়ে আছে সব কিছু···নেশার আমেজে কায়াহীন জগৎকে দেখার মতো ··স্বপ্নালোকের ছোপ লাগিয়ে নিজেকে ভুলে গেছে জগৎ, গালে হাত দিয়ে ভাবছে—কী ভাবছে, কবে থেকে ভাবছে, তা মনে নেই···

: ঘুমলেন নাকি কাকাবাবু ?

: না তো। ঘুম আসছে কৈ ? তোমার বোধ হয় গাড়ীর চিন্তায়—

: হ্যাঁ, তাই বটে। কাল সকালে আর একবার চেষ্টা করে দেখবো।

: হেঁটেই যাবো। কতটুকু আর রাস্তা ?

: গাড়ীটা—

: না আনলেই পারতে।

: আপনার একটা দিন দেরি হয়ে গেলো, না?

: কিসের দেরি? আমার তো এখন অফুরন্ত সময়।

: পেনশনের পর একটা চাকরি নাকি পেয়েছিলেন?

: হুঁ।

: গেলেন না কেন?

: আর ভালো লাগে না।

: অনেকেই তো আবার চাকরি নিচ্ছে?

: তাদের ভালো লাগে।

: আপনার লাগে না কেন? শরীর তো ঠিকই আছে।

: শুধু জল।

: জল মানে?

: রাজহাঁস যেমন দুধের সারটুকু খেয়ে জলটুকু রেখে দেয়, রাজকলও তেমনি চাকরেদের সারটুকু শুষে নিয়ে জলটুকু পেনশন দিয়ে ফেলে দেয়।

: আজকাল তো রাজসরকারের চাকরেরাই শাঁসটুকু খেয়ে, খোসাটুকু ফেলে দেয় পাবলিকের মুখ বন্ধ করবার উদ্দেশে।

: শুনি। তবে আবহাওয়া বদলে গেছে ঠিকই। এককালে ভাবতুম কর্মই ঈশ্বরসেবা। যথাশক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি; আনন্দও পেয়েছি। এখন নিষ্ঠাই অপরাধ। যা কিছু গুণ বলে জানতুম তা এখন দোষ; এবং যেগুলোকে দোষ ভেবে চিরদিন বর্জন করে এসেছি সেগুলোই গুণ। নিজেকে আর খাপ খাওয়াতে পারছিলুম না, কেবলই মনে হতো মলেম ভূতের বেগার খেটে। আনন্দ না থাকলে কি কাজ করা যায়?

: সময় কাটান কি ভাবে?

: একভাবে কেটেই যায়।

: তবুও।

: হৈমন্তিক মেঘাবরণে

..............................when his wings
He furleth close contented so to look
On mists in idleness.

ঃ কীটস্ (Keats)-এর না? পড়েছিলুম ইন্টারমিডিয়েট এ।

ঃ হুঁ। কীটস্-এরই।

ঃ কিন্তু বুঝলুম না ঠিক।

ঃ হেমন্ত আসুক। সংসারী হও, জীবনকে দেখো, সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচয় হক…তারপর Grow old along with me…এখনো অনেক দেরি।

ঃ Looking before and after—কল্পনায় আসে তো! একটু বুঝিয়ে বলুন।

ঃ বুঝানো শক্ত…একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জর্জ সান্তায়ন (George Santayana)-এর নাম শুনেছ তো?

ঃ শুধু নামই শুনেছি। দার্শনিক ছিলেন না?

ঃ হুঁ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়াতেন। অবসর গ্রহণের পর আমেরিকা ছেড়ে ইওরোপে আসেন—মনের দিক থেকেও এক রাজার রাজ্যি ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে। মননের বিহারভূমিতে সঙ্গী ছিলেন সোক্রাতেস, প্লাতো, আরিস্ততল্, দীমক্রিতস্, লুক্রীসিয়স্… আথেন্স্ গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন …পুরনো সুরগুলো সব স্তব্ধ হয়ে গেছে সেখানে, অতীতের মূর্ছনা আর জাগে না—যেমন ভুবনেশ্বরের দশা হবে অদূর ভবিষ্যতে। রোম দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, রোমের ধ্বংসাবশেষে নিজের স্বপ্নকে খুঁজে পেলেন। বাকী জীবনটা রোমের একটি হোটেলে কাটিয়ে দিলেন। বন্ধুরা বলতেন, বাড়ী করে ফেলো; উত্তর দিতেন, "সম্পদ মাত্রই বন্ধন।"…সোক্রাতেসের প্রিয় দেবতা ছিলেন এস্কলাপিয়স (Esculapius); এই আরোগ্য দেবতার ভাঙ্গা মন্দিরের নিকট একটি বেঞ্চি আছে। সান্তায়ন অনেক সময় এই বেঞ্চিতে বসে অতীতের মানস রাজ্যে বিচরণ করতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন "to dream with one eye open, to be detached from the world without being hostile to it; to welcome fugitive beauties and pity fugitive sufferings, without forgetting for a moment how fugitive they are"…অসঙ্গ হয়ে দ্রষ্টাভাবে জীবনের বোধঘন পটভূমিকায় অনিত্য সুখদুঃখের রোমন্থন…অনুভূতির গূঢ় সংবেদনটুকু জানিয়েছেন একটি কবিতায়—

Heaven it is to be at peace with things…

নির্দ্বন্দ্বতাই পরম শান্তি…

॥ ৬ ॥

সকাল বেলা চেষ্টা চরিত্র অনেক করা হল, কিন্তু গাড়ী অচল, অটল। বিশু অক্লান্তকর্মী, ধৈর্যও অসীম—গাড়ীর হাল সম্বন্ধে আমাকে ওয়াকিবহাল করবার অশেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এক আধবার হুঁ হাঁ হয়তো করে থাকবো, কিন্তু কিছুই বুঝিনি। মোটর গাড়ী সম্বন্ধে আমি নেহাৎ-ই আনাড়ী··· মনটাও গরুর গাড়ীর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি; কাজেই বিশু যখন বললো 'সাইকেলে যেতে হবে' তখন একটু হতাশ হয়েছিলুম; আবার সাইকেল! একটাতে দু-জনা চেপে! চালাবে অবশ্য বিশু, কিন্তু কেরিয়ারটায় বসে যাওয়া কি তেমন সুখের হবে! যাক গে। বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম···চমৎকার রাস্তা···কখনো সোজা, কখনো এঁকে বেঁকে··· মাঝে মাঝে ঈষৎ চড়াই-উৎরাই···দুপাশে বন···কেরিয়ারটায় বসে একটু জবুথবু, নইলে আরামেই যাচ্ছিলুম; উদয়গিরি-খণ্ডগিরির মাথা যখন দেখা যাচ্ছিল তখন ভাবছিলুম নেবে পড়ি···নেবেওছি—বিশু গলদ্‌ঘর্ম; তাগিদ দিয়ে জিরিয়ে নিতে বলি···এই ভাবে অনেকটা এসেছি, তারপর একটা চড়াই উঠতে গিয়ে টিউবটা গেল ফেটে। আপদঃ শান্তিঃ। বিশু চললো সাইকেল ঠেলে···আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম···হাত পা টান করে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজের খুশিমতো চলি···আকাশ আজ গভীর নীল···দুদিকের বন নিঝুম, নিস্তব্ধ···গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে, যেন জলে ডুব দিয়ে আনন্দে আত্মহারা···আলোতে পাতাগুলোর কী অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা···গাছের ফাঁকে ফাঁকে আঁধারের গভীর সুপ্তি—সুপ্তির সুখঘন কালিন্দী···গাছ, পাতা, আঁধার, আলো, সব যেন পাথরে খোদানো···প্রতি শিরা উপশিরা তৃপ্তিরসে পরিপূর্ণ··· ময়ূরের কেকা রবে বনানী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে···গভীর একটানা ঝিল্লিরব হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে ডুব দেয় গভীরতর বিজনতায়···দূরে একটা কুকুর ডেকে ওঠে— অদ্ভুত শূন্যগর্ভ কায়াহীন রব···টিপ্ করে কি একটা পড়লো বনের ভিতর···স্তব্ধ সমুদ্রের বুকে একটি বৃত্ত—দেশ ও কালে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে···মিলিয়ে গেলো স্তব্ধতার অসীমতায়···এক ঝাঁক সাদা ফুল—কতো যুগ ধরে তাকিয়ে আছে অন্তহীন আকাশের দিকে···ডাহুক! কী গম্ভীর নির্ঘোষ!···নিঝুমতার প্রাণের গভীর স্পন্দন···

*　　*　　*

উদয়গিরির পাদদেশে প্রণাম করি। সাইকেলটা মন্দিররক্ষকের জিম্মায় রেখে একটি বাচ্চা গাইড নিয়ে পাহাড়ে উঠি···ছেলেটি রাস্তা দেখিয়ে গুম্ফাগুলোর

নাম বলে যাচ্ছে…নামরূপের প্রান্তভূমি এই রাজ্য ; এখানে নাম ছায়া মাত্র, রূপ অরূপে লীন…ইতিহাস জন্মায় নি বা মরে গেছে…Reality has no historyর গোচরভূমি…প্রতিগুহায় তপস্যার শ্রী, ধ্যানের গাম্ভীর্য, অতীতের মৌনব্যাখ্যা… পর্বতগুহা পর্বতেরই মতো চিরন্তন প্রশান্তিতে বিরাজমান…সূর্যগুম্ফার কী অপূর্ব পরিকল্পনা! পূব গগনের দিগন্ত প্রসার, মাঠের শেষে দিক্‌চক্রবালের শাশ্বত আহ্বান ; পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ঝোপ ; ঝোপে ঝোপে যোগাসনের কালো পাথর…গুহাবাসীদের যোগনিদ্রা এখনো সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে… উদয়গিরির পাহাড়ই একটি মন্দির…পাহাড়ের শান্ত গাম্ভীর্যে ও পরিবেশের বিজন নিবিড়তায় শিল্পী পেয়েছিলেন মহাশূন্যের সংবেদন ; কাজেই সুরটুকু ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কতকগুলো গুহা কেটেই তিনি নিরস্ত হয়েছেন…শূন্যতার অপূর্ব দ্যোতনা…প্রজ্ঞাপারমিতের গূঢ় ভাব-সংক্রমণ…

ঃ উঠুন কাকা বাবু! বেলা আর বেশী নেই ; খণ্ডগিরি এখনো বাকী রয়েছে— ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

ঃ ধীরে আস্তে—

ঃ উহুঁ। সন্ধ্যার পর এদিকে ভয় আছে।

ঃ কিসের ভয় ?

ঃ বন্য জন্তুর। অন্ধকার হলেই জানোয়ার বেরোয়।

ঃ তবে চল…

…ঘুরে ঘুরে মন্দিরের দিকে উঠছি। উদয়গিরি বৌদ্ধদের আস্তানা ছিল। খণ্ডগিরি জৈনদের—নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন নাকি এখানে হতো…পরমার্থ লাভের জন্য ভারতে কী অক্লান্ত চেষ্টাই না হয়েছে…কতো প্রক্রিয়া, কৃচ্ছ্রসাধন, তপস্যা, ধ্যান-ধারণা, সমাধি, ব্রহ্ম-চর্যা…দিনের আলো নিবে আসছে…জনপ্রাণী কোথাও নেই…ঝিল্লির বিজনরাগিণী সুরু হয়েছে…পিছনের বনভূমিতে কি-একটা আওয়াজ হলো…অনুত্তর ভূমির স্পন্দন জাগে সর্বত্র…বনানীর নিবিড় আবেষ্টনে, বিজনতার ঘন আবরণ গায়ে টেনে, পাহাড়ের শীর্ষদেশে, আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে, খণ্ডগিরির মন্দির গভীর ধ্যানে মগ্ন…মন্দিরের পাদদেশে উপবেশন করে মনে হয় জগতের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি··লোকালয়ের ক্ষীণতম ঢেউটিও এখানে শোনা যায় না…উপরে অনন্ত আকাশ…আকাশে দিনান্তের ঘুমিয়ে পড়া আলো… পিছনে গভীর বন…চতুর্দিক প্রশান্তবাহিতায় আচ্ছন্ন…আকাশ থেকে কুয়াশা নেবে আসে, কুয়াশার প্রতি অণু-পরমাণু হতে ক্ষরিত হয় গভীর শান্তি…

Aeons of sleep

The unfathomable deep.

…শান্তির অপার সমুদ্র…কোটর পেঁচা ডেকে ওঠে…জাগরণের কী এক জ্যোতির্ময় দ্যোতনা…শান্তির নিঝুমতাও ডুবে যায় কোন্ অতলে…সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম…

* * *

…একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্…

* * *

…তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ…

॥ ৭ ॥

একটা ট্রাকের পিছনে বিকল গাড়ীটাকে বেঁধে বিশু পুরী চলে গেছে। আমি এসেছি চিল্কা। ক'দিন ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়েছি। চিল্কা দেখলুম ঘুমঘোরে… শূন্যগর্ভ হাওয়ায় তৈরী ভাসা-ভাসা একটা জগৎ হাওয়ার মতো স্পর্শ করে… হাওয়ার মতো উড়ে যায়…ছেড়ে-আসা, ভুলে-যাওয়া সেই কবেকার পান্থশালা… সেই কবে একদিন পরিচয় হয়েছিল। এখনো আছে নাকি! শুকনো পাতার ঘর, হাওয়া এলেই উড়ে যাবে হাওয়ার সঙ্গে…কালীঘাটে একজন সাধুর কাছে মাঝে মাঝে যেতুম; তিনি প্রায়ই বলতেন, "কিসেরই বা এতো, এতোই বা কিসের!…সব তো ফক্কিকার…ফুঁ…ঐতো উড়ে গেলো"…ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশনের এক কোণে একটা বেঞ্চিতে বসে সাধুজীর কথা ভাবছি—কিসেরই বা এতো, এতোই বা কিসের…বেলা তিনটে হবে, গাড়ী সেই সন্ধ্যায়…শ্রান্ত দেহ, ঝিমিয়ে পড়া মন…এবারে ঘুমিয়ে পড়লেই হয়…তীর্থ তো হলো অনেক… বৃন্দাবন? আর একবার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। অনেকদিন আগে গিয়েছিলুম মাকে নিয়ে…শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্ধন…কিন্তু বাঁশরি বাজে নি যমুনায়…সেবা কুঞ্জ, নিধুবন, কেশীঘাট, গোবিন্দজীর মন্দির, যমুনা তট—সর্বত্র বিরহের সুর…কাহাঁ মেরা বৃন্দাবন, কাহাঁ যশোদা মাঈ…কাহাঁ যমুনা তট, কাহাঁ বংশীবট,…কাহাঁ মোহন মুরলী, কাহাঁ বলাই…পটদীপ রাগিণীর চাপা কান্না— 'পিয়া পরদেশ'…প্রিয়ের জন্য 'নিসিদিন বরসত নৈন হমারে'…আকাশে বাতাসে মীরাবাঈর আকুল প্রার্থনা—

ৰারৰার মৈঁ অরজ করূঁ ছুঁ রৈণ গঈ দিন জায়।
মীরা কহৈ হরি তুম মিলিয়াঁ ৰিন তরস তরস তন জায়॥

যমুনার তীরে বুকফাটা কান্না এসেছিল·· গুন্‌গুন্ স্বরে ব্যথা জানিয়েছিলুম—

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার বিমলতটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি ॥

অন্ধের মতো খুঁজেছি, সুরদাসজীর মতো 'নিসিদিন বরসত নৈন হমারে'···মণিদার মার ছবিটি মনে হতো···কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন···মণিদার গানের জীবন্ত রূপ···

গোঠে হতে আওয়ল নন্দদুলাল ;
যশোমতী ধাওয়ল ;
(তাঁর) ঝরঝর দুটি আঁখি ;
বিরাম নাই, বিরাম নাই।

দেখা করতে গেলে কাকীমা দু-হাতে আমাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতেন, "তোমরা ছিলে মণির আপন জন ; তোমরা কাছে এলে মনে হয় আমার মণি এসেছে····" পাকিস্তান হওয়ার পর কিছুতেই ঘর ছেড়ে আসবেন না—"কি নিয়ে থাকবো আমি ? মণি নেই, তবুও মনে হয় ও এখানে আছে ; এজায়গা ছাড়লে আর আমি বাঁচবো না।"···কলকাতা এসেই মারা গেলেন···বৃন্দাবনে এই সুরই মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল—'পিব ঢুঁঢ়ত বন বন গঈ, কহুঁ মুরলী ধুনি পাই'···মুরলী বাজে নি···গোষ্ঠ হতে কানু ফেরে নি···ঝরঝর দুটি আঁখি··· বিরাম নাই বিরাম নাই···বৃন্দাবন ছেড়ে গাড়ীতে মুহ্যমান হয়ে বসেছিলুম— সাশ্রু, বিরহবিধুর···বরসৈ বদরিয়া সাবনকী, সাবনকী মনভাবনকী···বৃন্দাবনে কি যেন খুঁজেছি, পাই নি···কিন্তু ছেড়ে আসতেও পরান পোড়্‌নি ছিল···কি খুঁজছিলুম ?···স্মৃতিবিজড়িত এক অতীত যুগ, বিস্মরণের আঁধারে ঢাকা···কি যেন মনে পড়ে, আবার ভুলে যাই···আবার খুঁজি—বরসৈ বদরিয়া সাবনকী··· কিন্তু কল্পনার বৃন্দাবন ছিল অন্যরূপ—যেখানে সব কান্না থেমে গেছে, সব চাওয়া শেষ হয়ে গেছে, পরম প্রিয়ের নন্দনকানন, অমৃতের অমর পুরী···সুন্দর·· নিরঞ্জন······প্রেমঘন···যাত্রার শেষ এই বৃন্দাবনের খোঁজে আর একবার বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প ছিল—অনেক দিন থেকেই···স্টেশনে বসে আজকে মনে হচ্ছে—

ঃ Hallo ! Just fancy meeting you here !

আচমকা সাহেব দেখলে এখনো আঁৎকে উঠি···অনেক দিনের সংস্কার ! কোট, প্যাণ্ট, নেকটাই, ফেল্ট হ্যাট, সান্‌-গ্লাস, স্টীক, ও বর্মা চুরুট ; লাল টকটকে রং ;

ইংরেজী ভাষায় সম্ভাবণ। কিন্তু—চেনাচেনা, দিশি সাহেব! কে! হাঁ করে তাকিয়ে আছি।

: কিরে? চিনতে পারলি না?

: মাণিক?

: তবু যা হক। আমি ভাবলুম তোরও টাকা হলো নাকি!

: চেনা শক্ত। যা মোটা হয়েছিস। আর ভোলটার তো আমূল পরিবর্তন, মানে sea-change। চেনবার যে নিশানাটুকু ছিল সেই দাড়িকেও বেমালুম সাফ করে দিয়েছিস।

: হুঁ। তা বটে। এখানে বসে কি করছিস?

: অবসরের পর তীর্থভ্রমণ ও পুণ্যসঞ্চয়।

: আছিস ভালো। রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, গোবেচারা—যেমনটি ছিলি…সেই কবে তোর সঙ্গে দেখা!…দক্ষিণেশ্বরে—না?

: হুঁ। সেখান থেকে অনেকদূর এগিয়েছিস। তখন ছিল খদ্দর ও 'টাকা হি পরমং তপঃ'। এখন মনে হচ্ছে তপস্যা সার্থক হয়েছে…খদ্দর গেছে, টাকা এসেছে।

: খদ্দর যায় নি—ওর দৌলতেই তো টাকা; অঢেল টাকা; টাকা, বাড়ী, গাড়ী…

: সাধনার প্রক্রিয়াটি কি?

: Here's my card—পড়ে দেখ।

: Manik Varma...Govt. Builder & Contractor...

: বিল্ডার এ্যাণ্ড কনট্র্যাক্টর্—বুঝলি তো? Covereth a multitude of sins—বাইবেলের কথা।

: তা তো বুঝলুম, কিন্তু নামটা—

: আমরা আসলে দাসবর্মা; বাংলা দেশে আসবার পর 'বর্মা' টুকু ছেঁটে দেওয়া হয়েছে, আজাদির পর 'দাস'টুকু ছেঁটে বর্মায় ফিরে এসেছি; বড় ভালো উপাধি—হিন্দুর কাছে লাউ, মুসলমানের কাছে কদু; ধরা ছোঁয়াটি নেই।

: মদ ধরেছিস?

: মদ তো অতি তুচ্ছ জিনিস রে। আজাদির পর কতো কিছু ধরতে হয়েছে… তবে তপস্যার অঙ্গ হিসাবে; নইলে কি টাকা হয়? হরিবাসরের দিন আর নেই রে দেবু…আচ্ছা, ক্ষেপু কেমন আছে রে? অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

: ক্ষেপু···সুবিধেয় নয়। ওর শ্যালকচন্দ্র পাকিস্তান থেকে একবস্ত্রে পালিয়ে আসেন, সঙ্গে কাচ্চাবাচ্চা; কাকারা বেশ বড় লোক, কেউ জায়গা দেন নি; একদিন সন্ধ্যার সময় বাচ্চাগুলোকে বিড়ালছানার মতো ক্ষেপুর বাসায় পার করে পিট্টান। কর্তাদের কাছে ধন্না দিয়ে ক্ষেপু বাচ্চাগুলোর জন্য একটা সরকারী ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

: তবে তো লেঠা চুকেই গেছে।

: অদৃষ্টচক্র এক চাকায় চললে লেঠা চুকে হয়তো বা যেতো—there are wheels within wheels···শ্যালক মশায় ছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ী; কিছু-দিন পর তাঁরা বিদেয় করে দিলেন···হাওড়া স্টেশনে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ফেলে রেখে তিনি আবার উধাও। পুলিশের হেপাজতে ছিলেন শ্যালক-পত্নী। খবর পেয়ে ক্ষেপু গিয়ে নিয়ে এসেছে।···শ্যালকটিরও একটি চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিল—

: তারপর আবার পালালো ? Vanishing trick ?

: তাই বটে ; এবার জন্মের মতো।

: তবু ভালো।

: ভালো মানে ?

: পাচক ঠাকুরের খরচটা বেঁচে গেলো। ক্ষেপু তো কামায় বেশ ; ভালো উপুরি আছে ; দু-পয়সা করেছে নাকি শুনি।

: যা কিছু কামিয়েছিল গুরুসেবাতেই খতম করেছে।

: এখন গুছিয়ে নিক।

: সে গুড়ে বালি।

: কেন ? গুরুদেব তো এখন বৈকুণ্ঠে ? বদখেয়াল—

: তা নয়। চাকরিটি খুইয়েছে।

: খুইয়েছে মানে ?

: উপুরির খেসারত।

: তুই হাসালি ! ঘুষের দায়ে চাকরি গেলো ! সত্যিই হাসালি তুই। ঘুষের দায়ে আবার চাকরি যায় নাকি ? বোকা ! বোকা !·· গুরুর কাছে কিছুই শিখতে পারে নি—

: গুরু আর কি করতেন ?

: কি করতেন ! মুশকিল-আসানের মন্ত্র আছে, জানিস ? মন্ত্রটি শিখিয়ে দেওয়া

উচিত ছিল না? ক্ষেপুটা এক নম্বরের গাধা···যোগ করা চাই রে দাদা, যোগ করা চাই।

: তুই যোগ করিস নাকি?

: নইলে টাকা হয়?

: যোগ মানে—

: যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। কাজ তো যেদো মেধো সকলেই করে। কৌশলটি জানা চাই। কৌশল জানা হচ্ছে যোগ; আর না জানা হচ্ছে বিয়োগ—যেমন ক্ষেপুর হয়েছে।

: আপিসের কাজে তো ক্ষেপু কুশলই ছিল।

: দেবলচন্দ্রও দেখছি হাঁদারাম। ওটা কি কৌশল হলো? দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি—এই হচ্ছে সিক্রেট অব সাকসেস্ (secret of success)। টাকা ঢালো, টাকা আসবে; গুহ্য কথা বলো, গুহ্যাতিগুহ্য টিপ (tip) পেয়ে যাবে। ঘুষের দায়ে চাকরি যায়!···হাসালি তুই।

: কি বাজে বকছিস? ধরা পড়লে চাকরি যাবে না?

: ধরা পড়বে কেন রে, আহাম্মক? যার যা প্রাপ্য তা যদি না দিয়েছো, তবেই মরেছো। আমাকে কেউ ধরে না কেন? সবাইর মুখ বন্ধ করে রেখেছি বলে। আসল কথা কি জানিস?

: বলুন গুরুদেব।

: সমে সমে: Similia similibus—মহাত্মা হানেমান-এর অমোঘ মন্ত্র। যেমনি দেবতা, তেমনি নৈবিদ্যি। নৈবিদ্যির একটু এদিক-ওদিক করেছো কি ডুবেছো। ক্ষেপুটা ঠিক ও-ভাবে ডুবেছে—হয় নৈবিদ্যি দেয় নি, নয় তো সন্দেশের জায়গায় এলাচদানা দিয়ে কাজ গুছতে চেয়েছিল। যথাযোগ্য নৈবিদ্যি পেলে তুষ্ট হন না এমনি দেবতা ভূ-ভারতে আছে নাকি? আজ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। বোকা! বোকা!

: ক্ষেপু নিজেকে চালাক বলেই মনে করে।

: মারাত্মক ভুল। নিজেকে ঘুঘু মনে করতে দোষ নেই, কিন্তু যাকে বাগে আনতে চাও ধরে নিতে হবে সে ফাঁদ। নইলে তুমিই ফাঁদে পড়বে···ক্ষেপু খুব দমে গেছে বুঝি?

: দমবার ছেলে তো ও কোন কালেই নয়। আসলে ওর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ছিল। কুচক্রীদের 'হাইকোর্ট' দেখিয়ে পুনর্বহালের চিঠি নিয়ে আপিসে গিয়েছিল। কিন্তু চাকরি আর করে নি।

ঃ কেন ?

ঃ বাঙ্গালে গোঁ। নিয়োগপত্রটি টুকুরো-টুকরো করে বড় কত্তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে বলে এসেছে—রইল মশায় আপনার চাকরি—চললুম বদারিকাশ্রম।

ঃ সাধুবাবা হলো নাকি ?

ঃ ওর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয় ; তবে সম্প্রতি তীর্থদর্শন।

ঃ পরে ?

ঃ হয়তো সংসারধর্ম ; ভাল একটা 'অফার' পেয়েছে উইলিয়মসন (Williamson) থেকে।

ঃ তবু ভাল। তবে ওকে আর কি দোষ দেব ? আমিই কি কম 'বাঙ্গাল' ছিলুম, মানে কম বোকা ?

ঃ বোকা ?

ঃ মনে নেই তোর ? কমিশনারের মেমসাহেব টমটম হাঁকিয়ে যাচ্ছিল ; ঘোড়াটা ভয় খেয়ে ছুট দেয়, রাস্তার লোক ছুদিকে পালায় ; খপ করে ধরে ফেললুম ঘোড়াটাকে···কমিশনার সাহেব চাকরি দেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি। আমার এক উত্তর—গোলামি করবো না। খদ্দর পরি···দেশের কাজ করি, জেলে যাই··· ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো যাকে বলে···জেল থেকে বেরিয়ে বেকুব বনে গেলুম। প্রথমটা বুঝতে পারি নি। হাসি, গাই, ফুটবল খেলি···আর জেলে যাওয়ার জন্য সদাই প্রস্তুত···বাবা হুঃখ করতেন, আমি বেপরোয়া···হুঁশ হলো যখন বাবা মারা গেলেন···চালাক খদ্দরিস্ট্ যারা ইতিমধ্যে তারা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে···আমি যে হাঁদা সে হাঁদা···এক গুষ্টি খাইয়ে, সংস্থান কিছুই নেই···কি ভাবে যে দিন গেছে···মহাত্মাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম।

ঃ মানে !

ঃ One step enough for me, যা পাই তাই ধরি···সেই হুর্দিনের সময় তোর সঙ্গে দেখা দক্ষিণেশ্বরে···দাড়ি কামাবার পয়সা ছিল না বলে রাখলুম solemn beard...solemn beard-এর বাংলা কি রে ?

ঃ আর্ষ দাড়ি।

ঃ সেই আর্ষ দাড়ির পরিস্থিতি থেকে একটু একটু করে এগিয়ে এখন অনেককেই পিছনে ফেলে এসেছি···সাধনা চাই রে দেবু, সাধনা চাই। তবে তত্ত্বলাভ।

ঃ কি তত্ত্ব লাভ করলি ?

ঃ টাকা সত্য, টাকা সত্য, টাকা সত্য।

: হরিনাম ?

: টাকার ফিকিরে মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে হয়—means বলা চলে, end নয়। টাকা সাধ্য, হরিনাম আর পাঁচটার মতো সাধন মাত্র।

: মরলে ?

: দুটোই মিথ্যা। তখন আর কে শুনতে আসছে "রাম নাম সত্য হৈ" ?··· পিপাসা লেগেছে। গাড়ীতে বোতলটা খুলতে হবে···তুই আছিস ভালো···

: তাই নাকি ?

: যে গো-বেচারীটি ছিলি তেমনটিই আছিস। কোনো ঝামেলা নেই···না ঢালতে হয় টাকা, না ঢালতে হয় মদ···হাত কচলাবার বালাই নেই···আমড়া-গাছির হীনতা নেই···ভালো লাগে না আর···

: ভূতের মুখে রাম নাম ! না খোয়ারি ?

: Hangover হতে পারে, কিন্তু মনে শান্তি নেই···বিষাক্ত জীবন···ভুলে থাকবার চেষ্টা করি···পুরনো দিনগুলো—ইচ্ছে হয় ফিরে যাই···কি আনন্দেই ছিলুম···কিন্তু হেল্প্‌লেস (helpless)···একটা দৈত্য যেন কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে···ট্রেনটা আসছে বোধ হয়।

: কোথায় যাচ্ছিস এখন ?

: ভাইজাগ। একটা কনট্র্যাকটের ব্যাপারে। কাল চিল্কায় নেবেছিলুম··· ভাইজাগ থেকে মাদ্রাজ যেতে হবে···এই কুলি !···আচ্ছা ভাই, আসি···au revoir···

* * *

বিশাখাপত্তনম্‌···মনোরম স্থান। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় মনটা ছিল ভূতগ্রস্ত··· ভূতাপসরণ হয়ে ছিল একবার—বিশাখাপত্তনমে। লঞ্চ (Launch) যোগে বঙ্গোপসাগর দর্শন করবার সুযোগ ঘটেছিল···ভারতের মাটিতে তৈরী আমাদের দেহ-মন; মাতৃক্রোড়েই চিরদিন অবস্থিতি···কোল থেকে যখন নাবি তখন চিতাশয্যা···ব্যতিক্রম ঘটেছিল যখন বঙ্গোপসাগরে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমিকে প্রণাম করি···কোল ছেড়ে মাকে দর্শন করার এক অপূর্ব অনুভূতি; মাটির সঙ্গে মিশে আছি বলে আলাদা হয়ে মাটিকে দেখা সম্ভব হয় না; সেদিন মাটির সীমানা পেরিয়ে মাটিকে প্রণাম করে অভিভূত হয়েছিলুম বিস্ময় ও আনন্দে···এই সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ! রহস্যময় ভারত ! সমুদ্রমেখল ভারত ! মস্তকে গৌরীশঙ্কর···

বুকে অলকানন্দা·· দেহে গিরি, বন, নদী, প্রান্তর, জনসমুদ্র···পাদদেশে ভারত মহাসাগর···মুনিগণসেবিত ভারত!···বেদাগ্নিমন্থনের পুণ্যস্থলী···যেথায় মন্ত্রিত হয়েছিল

অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্

হোতারং রত্নধাতমম্

···যেথায় ঘোষিত হয়েছিল অমৃতের বাণী

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ

···অমৃতের পুত্র···কবির্ উশনা···বৃহস্পতি···যাজ্ঞবল্ক্য···শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভৃগু··· বুদ্ধ···শঙ্কর···রামানুজ···নানক···চৈতন্য···রত্নধাতম···অসংখ্য মণিরত্নখচিত ভারতের তপঃশুদ্ধ জ্যোতির্ময়, শাশ্বত রূপ···

* * * *

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অতিক্রম করে, দিক্‌চক্রবালের বিলীয়মান সীমা পেরিয়ে এসে, আজ তেমনি পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাই···এই সেই বসুন্ধরা! রহস্যময়ী গোচারণভূমি! মন্দ্রতম ক্রীড়ামঞ্চের অপার্থিব হিল্লোল! জগন্নাথের দেহকান্তির অপূর্ব দীপ্তি!···অদ্ভুত ভাস্বরতা···যজিষ্ঠ মহিমা···দিনান্তের আলোতে ভেসে ওঠে মাষ্টার মশায়ের আনন্দোচ্ছল আরক্ত মুখশ্রী, আনন্দরক্তিমা ছড়িয়ে পড়ে আকাশে···দিগন্তে···সর্বত্র;···সোনার কাঠির পরশে প্ল্যাটফরমটি সোনা হয়ে জেগে উঠেছে···লাঠি ভর করে একজন ভিখিরী দাঁড়িয়ে···অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন ভারতের চিরন্তন ফকীর, মুখে পরম তৃপ্তি, চোখ প্রেমে ছলছল···গাছটা ডুবে আছে নিজের প্রশান্ত সত্তায়···লাখোবছরের মাটির নীচে প্রোথিত ছিল ঐ চালাঘরটি, আজ মৃন্ময় আবরণ ফেলে দিয়ে চেয়ে আছে উদ্‌ভিন্ন আলোক মহিমায়···একটি কুকুর! আমার প্রিয় বন্ধু ডন···মহাপ্রস্থানের পথে চিরসাথী ধর্মরাজ···প্রসন্নগম্ভীর মুখে ডন এগিয়ে আসছে···বিশ্বজনের পায়ের ধুলো নিয়ে, ধর্মরাজ ডনের পায়ে মাথা লুটিয়ে অসংখ্য ঋণের দায় থেকে মুক্তি চাই···কোনো নালিশই আজ মনে স্থান পায় না—সকল দ্বন্দ্বের অবসান···সকল অভিযোগের উপশান্তি···Heaven it is to be at peace with things···মাণিক উল্কার মতো বৃন্দাবন খুঁজে বেড়াচ্ছে—হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি, অকুণ্ঠ গতি, উদ্বেলিত প্রাণ···

দয়ালদা যমুনাতটে প্রেমবিহ্বল···আনন্দে হরিগুণগান গেয়ে চলে ক্ষেপু

বদরিনারায়ণের দীপ্ত পথে···মাষ্টারমশায় ক্ষীরসমুদ্রে নিমজ্জিত···মহাত্মাজী সরযুর জলে শান্তি তর্পণ করেন···ছিন্নমস্তাকে আহুতি দেয় ক্ষুদিরাম উৎসারিত আলোর ঝলকে···সোক্রাতেস হেম্‌লকের মধুপানে আত্মহারা···যিশুর বুকে প্রেমের বিগলিত ধারা···ফাদার ডেমিয়ন কানামাছি খেলেন তাঁর কুঠেদের নিয়ে··· অশরীরী আত্মার ভিড়···Thy Kingdom come...Hallowed be Thy Name···সাগরকূলের ঢেউ, গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে···মুখ তুলে চায়, ডুব দিয়ে তলিয়ে যায়···রাধাচক্র ঘোরাচ্ছেন শ্যামরায়···round and round and round···একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা···Thy Kingdom come···মধুরং মধুরং মধুরং···বৃন্দাবন···

বৃন্দাবনচন্দ্র নাম রাখে বৃন্দা দূতী ;
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি ;

* * *

বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ;
রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী ;

* * *

নারদ রাখিল নাম ভক্ত প্রাণধন ;
গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন ;

* * *

চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহনবংশীধারী ;
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দমুরারি ;

* * *

বাসুকি রাখিল নাম দেব সৃষ্টিস্থিতি ;
নটনারায়ণ নাম রাখিল সম্পাতি ;
কৃষ্ণনাম রাখেন গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ;
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া

* * *

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

বৃন্দাবন···বৃন্দাবন···বৃন্দাবন···মধুরং···মধুরং···মধুরং···মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ···মধুমৎ পার্থিবং রজঃ···বৃন্দাবন···বৃন্দাবনপথযাত্রী···পরাণসখা হে বন্ধু আমার···

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে···

ওঁ···

··················ট্রেনটা আসছে···

·················ব্রজের খেলা সাঙ্গ হলো·· ······

······জগৎ ভেলা দিই ভাসিয়ে·········

ওঁ·················

··········প্রণবের একটানা সুরে বিশ্বজগৎ ডুবে যায়···

ওঁ···············

··········রাধাচক্র স্থির····· ···

··········নটনারায়ণ···নটনারায়ণ···নটনারায়ণ···

দশদিক থেকে এগিয়ে আসে প্রশান্ত মহাসাগর—

—যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—

···নারায়ণ···নারায়ণ···নারায়ণ···

দ্যৌঃ শান্তির্ অন্তরীক্ষ শান্তিঃ

পৃথিবী শান্তির্ আপঃ শান্তিঃ····· ···

শান্তিরেব শান্তিঃ········

·········ওতশ্চ প্রোতশ্চ······

············শান্তির পারাবার·········

·· ················নারায়ণ·········